মিশরের নবসূর্য

নাসের

প্রফুল্ল চন্দ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৪৭

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদ :
রবীন দত্ত

এক

১৯৪২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। রাত্রি ৯টা। এক ঝাঁক বৃটিশ ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ী আবদিন প্রাসাদ ঘেরাও করল। ট্যাঙ্কের এক ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল সদর ফটক। একটা গাড়ী থেকে নামলেন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার মাইলস ল্যাম্পসন। তাঁর সঙ্গে ছিল স্থানীয় বৃটিশবাহিনীর প্রধান জেনারেল স্টোন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনা কয় শ্বেতাঙ্গ সামরিক অফিসার। পিস্তল উঁচিয়ে তারা এগিয়ে চললেন। রাজপ্রাসাদের একজন পদস্থ কর্মচারী দৌড়ে এলেন। স্যার ল্যাম্পসন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—তফাৎ যাও। আমি রাস্তা চিনি। তাঁরা সোজা ঢুকলেন বাদশা ফারুকের চেম্বারে। আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলেন বাদশা। কোন ভণিতা না করে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত তাঁর সামনে ধরলেন একটি টাইপ-করা কাগজ। ওটা বৃটিশ সরকারের চরম পত্র—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে, নইলে গদী ছাড়তে হবে। ফারুক গদী রাখলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মিশরের প্রধানমন্ত্রী হলেন নাহাস পাশা।

ঘটনাটি নাটকীয়। কিন্তু তার পিছনে ছিল বড় একটি পটভূমি। প্রায় তিন বছর আগে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে। আলি মাহের তখন মিশরের প্রধানমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করলেন—মিশর নিরপেক্ষ থাকবে। এ ঘোষণার কোন বাস্তব মূল্য ছিল না। গোটা দেশ ইংরাজের দখলে। মিশরের সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র কাগজে কলমে। আলি মাহের নিজে তা জানতেন। তবু তাঁর ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছিল জাতির চেতনা। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

নেভিল চেম্বারলেনের ভাল লাগল না। তিনি রাষ্ট্রদূত স্যার ল্যাম্পসনের (পরে লর্ড কিলার্ণ) মাধ্যমে বাদশা ফারুককে জানিয়ে দিলেন—আলি মাহেরের পদচ্যুতি চাই। আলি মাহের ছিটকে পড়লেন। বৃটিশ স্তাবক হোসেন সিরি প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসলেন।

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসটা ইংরাজের পক্ষে ভাল ছিল না। রোমেল পশ্চিম মরুভূমিতে প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করেছেন। বেনঘাজী তাঁর দখলে চলে গিয়েছে। জলে, স্থলে এবং আকাশে বৃটিশ প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। ইরাকে জার্মানীর সমর্থনে রসিদ আলির বিদ্রোহ সারা মধ্যএশিয়ায় চাঞ্চল্য এনেছে। মিশরের তরুণেরা আনন্দে নাচছে। ইংরাজের দিন শেষ। পয়লা ফেব্রুয়ারী একদল ছাত্র শোভাযাত্রা নিয়ে রাস্তায় নামল। তাদের আওয়াজ—আলি মাহেরকে চাই। আলি মাহের জাতীয়তাবাদী। তিনি বৃটিশ বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী হোসেন সিরি ফ্যাসাদে পড়লেন। ইংরাজের কড়া হুকুম—ফ্রান্সের ভিসি সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক চ্ছেদ কর। প্রধানমন্ত্রীর পদ সিরির কাছে বড় প্রিয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল। কড়া লোক তিনি। তাঁর হুকুম তামিল না করলে গদীর দখল থাকবে না। ফারুকের কাছে তকৃত-তউসটা খুব আরামের। তাঁর ধারণা, যুদ্ধে ইংরাজ হারবে। বেশী বৃটিশ ঘেঁষা হলে হয়ত পরিণামে সিংহাসনটা বেহাত হয়ে যাবে। হোসেন সিরি তা জানতেন। তিনি বাদশাকে না জানিয়েই ভিসির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করলেন। ফারুক চটলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি গদী থেকে টেনে নামালেন। নূতন মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে বাদশা আলি মাহেরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। বৃটিশ প্রমাদ গনল। ওয়াফদ দলনেতা নাহাস পাশার যুবতী স্ত্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বিদেশী ব্যাঙ্কে জমছে তাঁর টাকা। দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে পাশা পরিবার। নাহাসকে হাতে রাখা সহজ।

সিরি পদচ্যুত। তাঁকে পুনর্নিয়োগের প্রশ্ন অবাস্তব। সুতরাং নাহাসই প্রধানমন্ত্রীর পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। ৩রা ফেব্রুয়ারী বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার ল্যাম্পসন এলেন আবদিন প্রাসাদে। ফারুককে তিনি বললেন—যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় নাহাস পাশাকেই প্রধানমন্ত্রী করা উচিত। তাঁর পিছনে রয়েছে ওয়াফদ দল। বৃটিশ সমর্থনে জনমত গঠন নাহাসের পক্ষেই সম্ভব। বাদশা সময় চাইলেন। স্যার ল্যাম্পসন তাঁকে বললেন—৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিকেল ছ'টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদে নাহাসের নিয়োগের সিদ্ধান্তের খবর যদি তিনি না পান তবে বাদশাকে তার ফলভোগ করতে হবে। ঠিক ছ'টার সময় ফারুকের দূত আমেদ হাসানিন বৃটিশ দূতাবাসে গেলেন! তিনি রাষ্ট্রদূতকে জানালেন—বাদশা বৃটিশ হুশিয়ারী আগ্রাহ্য করেছেন। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন স্যার ল্যাম্পসন। তিনি হাসানিনকে বললেন—তোমার বাদশাহকে গিয়ে বল, রাত্রি ৯ টার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। স্যার ল্যাম্পসন কথা রেখেছিলেন। তিনি ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া বহর নিয়ে আবদিন প্রাসাদে গিয়েছিলেন। বাদশার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের ফল—প্রধানমন্ত্রীর পদে নাহাস পাশার আবির্ভাব।

সৈন্য ব্যারাকগুলোতে পৌঁছল খবর। জ্বলে উঠল তরুণ অফিসাররা! ফারুক জাতির কলঙ্ক। তবু তিনি রাষ্ট্র প্রধান। রাষ্ট্রের মান মর্যাদা তাঁর পদাধিকারের সঙ্গে জড়িত। প্রাসাদ-রক্ষীরা বাধা দিল না কেন? সৈন্যবাহিনীকেই বা কেন নিষ্ক্রিয় রাখা হল? তাদের হাতের অস্ত্র শোভা বর্দ্ধনের জন্য নয়, জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্য। লড়াইএ তারা ইংরাজের সঙ্গে পারত না। মিশরীয় বাহিনীর গৌরব গাঁথা সৃষ্টির একটা সুযোগ তো তারা পেত। কৈফিয়ৎ চাইলেন সেনাপতিরা। প্রাসাদ থেকে জবাব এল—বাদশার হুকুম। রক্ষীরা তাই বাধা দেয়নি। ফারুকের কথার উপর কথা নেই। চুপ করে গেল সবাই। ভিতরে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকল তুষের আগুন।

দুই

মিশরের দুরবস্থা নূতন নয়! তার অধঃপতনের ইতিহাস অনেক দিনের পুরাণো। ১৯৩৬ সালে মারা গেলেন বাদশা আমেদ ফুয়াদ। গদীতে বসলেন ফারুক। পিতার বয়ে যাওয়া ছেলে তিনি। কৈশোরে তাঁকে পাঠান হয়েছিল বৃটেনে। আশ্রিত রাজাদের শিক্ষার স্কুল ছিল ওদেশ। কোন শিক্ষাই তিনি নেননি। ভৃত্যের দল ঘিরে থাকত তাঁকে। মদ, মেয়েমানুষ এবং জুয়ার নেশা ফারুককে ধরিয়েছিল তারাই। অবাধ ক্ষমতা মিশরের বাদশার। তরুণ ফারুক এ ক্ষমতার অধিকারী। তার ইঙ্গিতে মন্ত্রীসভার উত্থান-পতন ঘটে। প্রাসাদ ভৃত্যেরা সর্বেসর্বা। বাদশার নামে রাজ্য চালায় প্রাসাদের পাচক, খানসামা, কার-ড্রাইভার, মিস্ত্রী প্রভৃতি অর্দ্ধশিক্ষিতের দল। ফারুকের জন্য মেয়েমানুষ জোগান এদের প্রধান কাজ। প্রধানমন্ত্রীর পদ, রাজকীয় খেতাব, পদোন্নতি—সব নিয়েই চলে নীলামের কারবার। বাদশা টাকা পেলেই খুশী। বেশি কিছু দেখার সময় এবং প্রয়োজন তাঁর নেই। রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতিতে ভরা। নির্বাচনের নামে হয় প্রহসন। রাজ্যের অধিকাংশ জমি জমিদারদের হাতে। এরা সব পাশা। সামাজিক মর্যাদায় পাশাদের তুলনা নেই। এদের পরের শ্রেণীর লোকেরা বে। পাশা এবং বে'দের প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা। ভোটদাতারা ভূমিহীন কৃষক। জমিদারদের ভোট না দিলে চাষের জমি তারা পাবে না। না খেয়ে মরতে হবে তাদের। কিষাণ আন্দোলন বলতে কিছু নেই।

মিশরের প্রাশাসনিক কাঠামো গত চল্লিশ বছর ধরেই কাঁপছে।

মাঝে মাঝে ছোট খাট বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ফল কিছু হয় নি। সমাজের উপরতলার লোক সৈন্যবাহিনীতে বেশী ঢোকে নি। ঢুকবেই বা কেন? অনায়াসলব্ধ টাকায় তারা বিলাসিতা করে। গরমের দিনে ওরা যায় ইউরোপে প্রমোদভ্রমণে। শীতের সময়টা কাটায় আলেকজান্দ্রিয়ায়। এমন আরামের জীবন ছেড়ে সৈন্যদলে কেউ নাম লেখাতে চায় না। মধ্যবিত্ত কিম্বা স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা যায় সৈন্যবাহিনীতে। মাটির সঙ্গে রয়েছে তাদের নাড়ীর টান। সারা মিশরে শিল্প বলতে কিছু নেই। শিক্ষিত বেকারেরা আড্ডা দেয় কাফে রেঁস্তারায়। কথায় কথায় হাঙ্গামা বাধায়। সুযোগ পেলেই বাদশা ফারুকের বাপান্ত করে। প্রাসাদচক্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় শেখ হাসান বান্না। অদ্ভুত আকর্ষণ এ লোকটির। সুদর্শন চেহারা। চোখ দুটিতে গভীর ভাবালুতা। সবটাই যেন একটি রহস্য। তাঁর ধারণা, কোরানের শাসন নেই বলেই মিশরের এ দুরবস্থা। ফারুক ধর্মচ্যুত। ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যেই তিনি স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ মিশরের। শেখ হাসান বান্না মুসলিম ব্রাদারহুডের সুপ্রীম গাইড। মিশরীয় জনতা ধর্মভীরু। ফারুকের শাসনে অতিষ্ঠ। তারা চায় পরিবর্ত্তন। ধর্মের মধ্যে তারা দেখে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। বান্না ভবিষ্যতের অগ্রদূত। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রভাব। সৈন্যদলে লাগে তার ধাক্কা। সেখানে বান্নার ভক্তদলের সংখ্যা বাড়ে। ফারুক খুশী। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডকে প্রশ্রয় দেন। এদের মধ্যেই তিনি দেখেন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রতিষেধক। সৈন্যবাহিনী অসন্তুষ্ট। ১৯৩৬ সালের আগে তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিল বৃটিশ। সৈন্যদলের শিক্ষা এবং অস্ত্র সরবরাহের ভার তাদের হাতে। বৃটিশবাহিনীর পরিত্যক্ত সমর-সম্ভার মিশরীয় বাহিনীর সম্বল। চড়া দামে কিনতে হত তাদের এগুলো। ১৯৩৬

সালের চুক্তিতে মিশরের স্বাতন্ত্র্য কিছুটা এসেছিল। এ চুক্তির সর্ত অনুযায়ী বৃটিশবাহিনী শুধুমাত্র সুয়েজখাল এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে। মিশরের অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চল তারা ছেড়ে যাবে। বৃটিশ এবং বিদেশীরা মিশরে আইনগত বিশেষ সুবিধা পাবে না। যুদ্ধ, যুদ্ধের সম্ভাবনা কিম্বা আন্তর্জাতিক জরুরী অবস্থায় মিশরীয় সরকার ইংরাজকে মিশরের বন্দর, বিমান ঘাঁটি প্রভৃতি ব্যবহারের সুযোগ দেবেন। বৃটিশ হাইকমিশনের সরকারী পদবী হবে রাষ্ট্রদূত। মিশরীয় বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ সামরিক অফিসারদের জিম্মায় থাকবে না। একটি বৃটিশ সামরিক মিশন তাদের শিক্ষা এবং অস্ত্রের প্রয়োজনের দিকটা দেখবে। মোটামুটি আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে মিশর হবে স্বাধীন। এ চুক্তির মর্যাদা বৃটিশ সরকার দেন নি। নানা অজুহাতে তারা মিশর দখলের চেষ্টা করতেন। তাঁদের ইঙ্গিতে চলত মিশরের প্রশাসন। তরুণ অফিসারদের মতামতের দাম নেই। প্রবীণদের অধিকাংশই মেরুদণ্ডহীন বৃটিশ স্তাবক। স্থানীয় বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের বিরাগভাজন হলে কারও পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর নাম জেনারেল আজিজ এল মাশ্রি। মিশরীয় বাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ তিনি। তাঁর সামরিক অভিজ্ঞতা ব্যাপক। মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী। সৈন্যদলকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন এল মাশ্রি। বৃটিশ সামরিক মিশনের উপর তাঁর ছিল কড়া নজর। জার্মান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি পছন্দ করতেন তিনি। একটি মাত্র সৈন্য বিশেষ ধরণের বোমা নিয়ে ট্যাঙ্ক ঘায়েল করতে সক্ষম—একথা তিনি খোলাখুলি তরুণ অফিসারদের বলতেন। বৃটিশ সামরিক মিশনের মাতব্বরী তার সহ্য হত না। এ মিশন এক সময় অর্ডার দিলেন কতগুলো বৃটিশ ব্রেনগান। সস্তায় এধরনের চেক গান তখন পাওয়া যেত। এল মাশ্রি ক্ষেপে উঠলেন। তিনি বৃটিশ মিশনকে জানিয়ে দিলেন—তোমরা সামরিক মিশন নও। তোমরা

ব্যবসায়ী মিশন। মিশর তোমাদের চায় না। ইংরাজের দৃষ্টিতে প্রতিদিন তাঁর অপরাধের বোঝা বাড়ছিল। এল মাশ্রি সাঁজোয়া গাড়ী নির্মানের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এ কাজ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাংঘাতিক চটেছিল বৃটেন। তার ব্যবসায়িক স্বার্থে ঘা পড়েছে। জাতীয়তাবাদের মাশুল দিতে হয়েছিল এল মাশ্রিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতেই বৃটিশ রাষ্ট্রদূত অভিযোগ জানালেন —জেনারেল এল মাশ্রির পদচ্যুতি চাই। কারণ তিনি জার্মান সমর্থক। এল মাশ্রি যথারীতি পদচ্যুত হলেন।

তিন

১৯৩৮ সাল। সৈইদ প্রদেশের মোকাবাদ সামরিক শিবিরে একত্র হয়েছে একদল তরুণ অফিসার। আব্বাসিয়ের সামরিক কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে তারা। সারাদিন কুচকাওয়াজ করে। রাত্রে মাউন্ট এল চেরিফের পাদদেশে বসে তাদের আড্ডা। গল্পগুজব এবং তর্কের বিরাম নেই। সবার মুখে এক কথা— মিশরের অবস্থা অসহ্য। ইংরাজের ক্রীতদাসত্ব বেশীদিন বরদাস্ত করা চলে না। জনগণের দুরবস্থার প্রতিকার চাই। কিন্তু তারা সামরিক অফিসার। অসামরিক সরকারের হুকুম তামিল তাদের প্রধান কাজ। এ সরকার চালাচ্ছে কারা? ইংরাজ এবং তাদের হাতের পুতুল দুর্নীতিপরায়ণ বাদশা ফারুক। রাজনৈতিক নেতারা স্বার্থপর। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা মত্ত। বাদশার প্রসাদলাভে সবাই লালায়িত। জনসাধারণ মূক এবং অসহায়। বাদশার হাতে সৈন্যবাহিনী। বিদ্রোহ করলেই তিনি সৈন্যদল লেলিয়ে দেবেন। জনতা শুধু বাদশা ফারুকেই ঘৃণা করে না, সৈন্যবাহিনীকে বিদ্বেষের চোখে দেখে। তরুণ অফিসাররা এ অবস্থা মানতে পারে না। জাতির মর্যাদা এবং জনদরদী সরকারের পিছনে তারা দাঁড়াতে

বাধ্য। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী এবং আত্মসর্বস্ব সরকারের নষ্টামীর প্রশ্রয় [illegible] তারা রাজী নয়। কিন্তু প্রতিকারের উপায়? সম্ভব অসম্ভব পরিকল্পনা আঁটে মৌকাবাদ গ্যারিসনের তরুণ অফিসার দল। আলোচনা যখন রঙ্গরসের পথ ধরে তখন বাধা দেয় একটি তরুণ অফিসার। বয়স প্রায় কুড়ি বছর। গায়ের রং ঈষৎ ময়লা। ছ' ফুট লম্বা। ভারী চেহারা। নাকটা সুঁচালো। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। আত্মোন্নতির পরোয়া নেই। কথায় সৈইদ অঞ্চলের প্রাদেশিক টান। দৃঢ় শান্তকণ্ঠে সে বলে—আমরা রাজতন্ত্র, সামন্ত-তন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ব। অন্যায়, অত্যাচার এবং ক্রীতদাসত্ব বরদাস্ত করব না। শক্তিশালী এবং পরিচ্ছন্ন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। দরকার হলে অস্ত্রের জোরে লক্ষ্যে পৌঁছব। দেশে চলেছে অরাজকতা। বেশী দেরী করলে চলবে না। আমাদের পথ—বিপ্লব। কতবার বলেছে সে একথা। যখনই সে একথা বলত তখনই সবাই তাকিয়ে থাকত তার মুখের দিকে। অদ্ভুত সারল্য এবং আত্মবিশ্বাস নজরে পড়ত তরুণ অফিসারদের। আনোয়ার সাদাত মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত। তার মনে হত গামাল আবদুল নাসের বিধাতার তাজ্জব সৃষ্টি। হয়ত সে আনবে মিশরের মুক্তি। ১৯১৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী বেনিমুর তার জন্ম। পিতা ডাক বিভাগের কেরাণী। কৈশোরে মাতৃহারা। নাসেরের মনে রয়েছে এক গোপন ব্যথা। মায়ের অভাব সে ভুলতে পারেনি। সঙ্গীদের অনেকেই তার অনুরক্ত হয়ে উঠল। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকেই বাছা বাছা ক'জনকে নিয়ে নাসের গঠন করলেন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি।

যুদ্ধ সুরু হয়েছে। বৃটিশবাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে মিশরের সর্বত্র। প্রধান প্রধান সহরের বড় বড় বাড়ীগুলো তাদের দখলে। টমিরা রাস্তায় মাতলামী করে। যাকে তাকে ধরে মারে। অশালীন গান গায়। মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে প্রকাশ্যে চলে

টানহেঁচড়া। বাধা দেবার উপায় নেই। প্রায় বিশ লক্ষ ভূমিহীন কিষাণ (ফেলে হিন) অভাবের তাড়নায় চাষের যন্ত্রপাতি বেচে দিয়েছে। যখন কাজ পায় তখন তারা অন্যের কাছ থেকে কোদাল, লাঙ্গল, কাস্তে প্রভৃতি ভাড়া করে নিয়ে আসে। ধনীরা দু'হাতে যুদ্ধের টাকা লুটছে। চাষীরা দলে দলে ভীড় জমায় সহরে। মনে আশা, যুদ্ধের কাজ হয়ত পাওয়া যাবে। সহরগুলোতে তারা দেখে অদ্ভুত দৃশ্য। গোরাদের অত্যাচার। বিষিয়ে ওঠে মন। ওরা বোঝে, মিশর ইংরাজের দখলে। সৈন্য-দলের অবস্থা আরও শোচনীয়। বৃটিশ চায় তাদের পূর্ণ আনুগত্য। জাতীয় সরকারের নীতি—আংশিক সহযোগিতা। যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের মধ্যে চলছে ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন। মিশরীয় বাহিনীর কোন ভূমিকা নেই। ওদের সামনে একটি মাত্র প্রশ্ন—মিশর যুদ্ধ করবে কার স্বার্থে? ইংরাজ তার ঘাড়ে চেপে বসে রয়েছে। ইটালী সৈন্য সমাবেশ করছে। শত্রু কে? বৃটিশ, না ইটালী?

লেঃ নাসের সুদানে বদলি হয়েছেন। খার্ত্তুমে তিনি তৃতীয় গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়ানে যোগ দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ হয়ত তরুণ অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষের আঁচ পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা হয়ত তাদের ছত্রভঙ্গ করার মতলব আঁটছেন। গুপ্ত সমিতির কাজে ভাটা পড়েনি। যে যেখানে যাচ্ছে সেখানেই বিদ্রোহের বীজ পুঁতছে। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ভিত্তি তখনও দানা বেধে ওঠেনি। নাসের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তাঁর পদক্ষেপ সতর্ক। মিশরীয় সৈন্যদলে বৃটিশ গোয়েন্দার অভাব নেই। চাকুরীর উন্নতির জন্য দেশকে বিকিয়ে দিতেও তারা রাজী। খার্ত্তুমে তিনি পেয়েছেন লেঃ আবদুল হাকিম আমেরকে। দু'জনের প্রকৃতি আলাদা। নাসের ধীর, স্থির এবং গম্ভীর। আবেগ গোপন করতে তিনি জানেন। আমের চঞ্চল। ছোটখাট

ঘটনাতেও তিনি রাগে ফেটে পড়েন্। সামান্য বিপর্যয়ে তিনি ধৈর্য হারান। তবু তারা অভিন্ন বন্ধু। যোগসূত্র—মিশরের বৈপ্লবিক প্রেরণা। এদিকে ইংরাজের অবস্থা শোচনীয়। উত্তর আফ্রিকার ফরাসীবাহিনী মার্শাল পেঁতার আনুগত্য স্বীকার করেছে। বৃদ্ধ মার্শাল পরাজিত ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি জার্মানীর আশ্রিত। বৃটিশ নিঃসঙ্গ। মার্শাল গ্রাজিয়ানীর নেতৃত্বে ইটালীয় বাহিনী অভিযান সুরু করেছে। জেনারেল ওয়াভেল তাদের থামাতে পারছেন না। ১৯৪০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারা সিদি বারারানী দখল করেছে। ওখানেই ওরা থেমে গেছে। সামনে রয়েছে এল আলামেইন। পথের মাঝখানে মেরসা মাত্রুহ। মিশরীয় বাহিনীকে বৃটিশ সরকার বিশ্বাস করেন না। তাঁদের ধারণা, সুযোগ পেলে তারা শত্রুর সঙ্গে হাত মিলাবে। মেরসা মাত্রুহ তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। দুটি অঞ্চলের কর্ত্তৃত্ব মিশরীয় বাহিনীর হাতে অপরটি ইংরাজের দখলে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল হুকুম দিলেন—মাত্রুহের মিশরীয় বাহিনীকে নিরস্ত্র করে স্থানান্তরে পাঠাতে হবে। মিশরের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যথারীতি নির্দ্দেশ পাঠালেন—মিশরীয় সৈন্যদলকে ইংরাজের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় মূল শিবিরে ফিরে আসতে হবে। তরুণ অফিসাররা চঞ্চল হয়ে উঠল। বিনা যুদ্ধে বিদেশী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে অস্ত্র সমর্পণ সৈনিক বৃত্তির অপমান। ওরা বিদ্রোহের মতলব আঁটল। মাত্রুহের বাহিনী কায়রো ফেরার পথে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো দখল করবে। তারপর আলি মাহেরকে সামনে রেখে মিশরে নূতন সরকার গড়ে তুলবে। উপরওয়ালার হুকুম মত সৈন্যদল কায়রোর পথে মার্চ করল। বন্দুকগুলো তাদের হাতেই ছিল, এগিয়ে চলল। একটির পর একটি করে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো তারা পার হয়ে গেল। এগুলো দখলের হুকুম কেউ দিল না। দিলেও কেউই মানত কিনা সন্দেহ। কায়রোতে পৌঁছে তরুণ

অফিসাররা দেখল—সব শান্ত। সৈন্যবাহিনীর অপমানে একটা বুদ্‌বুদ্‌ও উঠছে না। বুঝতে পারল তারা—দেশ প্রস্তুত নয়। আর জোরাল সংগঠন ছাড়া বিপ্লব আনা যায় না।

নাসেরের বয়স তখন তেইশ চব্বিশ বছরের বেশী নয়। মাক্রুহের তরুণ অফিসারদের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ওদের আবেগ বেশী এবং বাস্তববুদ্ধি কম। বিপ্লবের উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল। ওটা আত্মহত্যার মিছিল নয়। মাক্রুহের অফিসারের যা করতে চেয়েছিল তা নিছক বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাস। প্রথম আঘাতেই উচ্ছ্বাস উবে যেত। নাসের সংগঠনে মন দিলেন। কড়া শৃঙ্খলা এবং গোপনীয়তার মধ্যে কাজ এগুতে লাগল। বারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হল কেন্দ্রীয় কমিটি। গোটা সংগঠন কতগুলো সেক্‌সনে ভাগ হয়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতগুলো সেল নিয়ে গঠিত হল এক একটি সেক্‌সন। প্রত্যেকটি সেলের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ। এ পাঁচজনের প্রত্যেককে আবার এক একটি করে সেল তৈরী করতে হত। এক সেলের সঙ্গে অপর সেলের এবং এক সেকসনের সঙ্গে অপর সেকসনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এক সেলের সদস্যদের নাম ঠিকানা অপর সেল জানত না। সেকসনগুলো সম্পর্কেও একই নিয়ম। কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ন্ত্রণ করত গোটা সংগঠন। তারাই শুধু জানত শক্তির পরিমাণ। নাসের ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

আবেগের পর্যায় ছেড়ে গুপ্তসমিতি যখন সাংগঠনিক প্রসারের পরিকল্পনা নিল তখনই তরুণ অফিসারেরা কতগুলো অসুবিধায় পড়ল। কারও বয়স তেইশ-চব্বিশ বছরের বেশী নয়। তাদের কথার দাম সবাই দিতে চায় না। বিপ্লবের ঝুঁকি নিতে হতে হলে জান-প্রাণ কবুল করা দরকার। নবীনদের উৎসাহে তারা প্রেরণা পায়, কিন্তু সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে অনেকে পিছু হটে। একজন প্রবীন জেনারেল যদি সামনে থাকেন তবে সৈনিকদের আস্থা বাড়ে।

তাছাড়া অসামরিক জনতার সাহায্য অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতিপরায়ণ। তারা হয়ত নিজেদের স্বার্থে সৈন্যদলকে কাজে লাগাবে। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। বেশী দেরী করা চলে না। এ অবস্থায় বিপ্লবী কমিটির বৈঠক বসল কায়রোতে। তারা মুসলিম ব্রাদারহুডের সুপ্রীম গাইড শেখ হাসান এল বান্না এবং মিশরীয় বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ জেনারেল আজিজ এল মাশ্রির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের নির্দ্দেশ দিলেন আনোয়ার সাদাতকে।

চার

আনোয়ার সাদাতের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর। জেনারেল আজিজ এল মাশ্রি এবং শেখ হাসান এল বান্না—কারও সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থকদের মধ্যে অনেককেই তিনি জানতেন। সৈন্যবাহিনীতেও বান্নার অসীম প্রভাব। সাদাতের বন্ধু আবদুল মোনেইম আবদুল রউফ মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য। তার মাধ্যমে সাদাত দেখা করলেন শেখ হাসান এল বান্নার সঙ্গে। রহস্যে ঘেরা এই লোকটি। তাঁর মনে কি আছে তা জানার উপায় নেই কারও। কথা-বার্ত্তা মাপাজোকা। মনে হল, মিশরে শরিয়তী শাসন কায়েম করার জন্য যতটুকু আন্দোলন করা দরকার তার বেশী কিছু করতে তিনি রাজী নন। সাদাত পরে আরও ক'বার বান্নার কাছে গিয়েছেন। দেখেছেন, তাঁর সদরঘাঁটিতে গোপন তৎপরতা। মাঝে মাঝে আসত ছদ্মবেশে সামরিক অফিসারেরা। বান্না তাদের নিয়ে যেতেন আলাদা ঘরে বাক্সভর্ত্তি অস্ত্রশস্ত্র জমা হত তাঁর গোপন অস্ত্রাগারে। মুখে বান্না বলতেন—রাজনীতি তাঁর পেশা নয়। ধর্মীয় আন্দোলনই মুসলিম ব্রাদারহুডের লক্ষ্য। লোকটির কোন

কূল-কিনারা পেতেন না আনোয়ার সাদাত। তবু আশায় আশায় ঘুরতেন। যোগাযোগ ছাড়তেন না। বান্না কিছুটা বিশ্বাসও করতেন তাঁকে। তরুণ অফিসারদের গোপন কার্যকলাপের খবরও তিনি রাখতেন।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। নাসের কিছুটা মুষড়ে পড়লেন। চীফ অফ ষ্টাফ জেনারেল আজিজ এল মাশ্রি পদচ্যুত হয়েছেন। এই প্রবীণ জেনারেলকে তরুণ অফিসাররা শ্রদ্ধা করত। ১৯৩৮ সালে তিনি মিলিটারী কলেজে বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, একজন সৈনিক বিশেষ ধরনের একটি বোমা দিয়ে ট্যাঙ্ক অকেজো করে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি মিশরে সাঁজোয়া গাড়ী নির্মানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বৃটিশ অস্ত্র ব্যবসায়ে জেনারেল মাশ্রি ছিলেন বড় প্রতিবন্ধক। বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের অভিযোগ—তিনি জার্মান সমর্থক। তারই পরিণতি জেনারেল মাশ্রির পদচ্যুতি। উচ্চপদে বহাল একজন সমরনায়কের সমর্থন এবং সাহায্যের দাম বিপ্লবীদের কাছে অনেক বেশী। জেনারেল মাশ্রির উপর গুপ্তসমিতির আস্থার অভাব ছিল না। তারা জানত এই প্রবীণ জেনারেল জাতীয়তাবাদী। তার আশীর্বাদ তরুণ অফিসাররা পাবে। নাসের এবং সহকর্মীরা একেবারে নিরাশ হলেন না। যেভাবেই হোক জেনারেল মাশ্রির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য গুপ্তসমিতি আনোয়ার সাদাতকে নির্দ্দেশ দিলেন।

জেনারেল মাশ্রির দেখা পাওয়া মুস্কিল। বৃটিশ তাঁর পিছনে লেগেছে। সর্বদাই গ্রেপ্তারের ভয়। আত্মগোপন করে থাকেন তিনি। সাদাত শেষ পর্যন্ত বান্নার সাহায্য চাইলেন। স্বল্পভাষী ধর্মগুরু একটি চিঠি লিখে তার হাতে দিলেন। খামের উপরে লেখা ঠিকানায় গিয়ে তিনি দেখলেন—ওটা ডাঃ ইব্রাইমের চেম্বার। চিঠিটি এ ডাক্তারকেই লেখা। ভদ্রলোককে দেখেই সাদাত

চিনতে পারলেন। বান্নার সদর দপ্তরে তার যাতায়াত ছিল। তিনি ছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডের ভাইস প্রেসিডেন্ট। চিঠি পড়েই সাদাতকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার ইব্রাহিম গেলেন জেনারেল মাশ্রির কাছে। মন দিয়ে সব কিছু শুনলেন জেনারেল মাশ্রি। তাঁর বাদামী চক্ষু জ্বলে উঠল। তিনি যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলেন। আপন মনে বললেন—মিশর জেগেছে। বিপ্লবী অফিসাররা একেবারেই তরুণ। উৎসাহ এবং আন্তরিকতা ছাড়া সম্বল বিশেষ কিছু নেই। মনে নিদারুণ সংশয়। জেনারেল মাশ্রি অভয় দিলেন। তিরিশ বছর বয়সে নেপোলিয়ান ফ্রান্স পুর্নগঠন করে সাম্রাজ্য শাসন সুরু করেছিলেন। প্রত্যেক তরুণ অফিসারদের একথা স্মরণ রাখা উচিত।

উৎসাহিত হয়ে উঠল বিপ্লবীরা। হু হু করে সংগঠন বাড়ছে। ফ্রী অফিসার কথাটি ক্রমেই সৈন্যবাহিনীতে চালু হচ্ছে। বিপ্লবী-কমিটি যুদ্ধের গতির উপর কড়া নজর রেখেছে। মার্শাল গ্রাজিয়ানী সুযোগ হারিয়েছেন। তিনি সিদি বাররানী দখল করে চুপ করে বসেছিলেন। মেরসা মাত্রুহ এবং এল আলামেইনের পথ তাঁর সামনে খোলা ছিল। বৃটিশবাহিনী ছত্রভঙ্গ। বাধা দেবার কেউ নেই। ইটালীয় বাহিনীকে তিনি যদি বসিয়ে না রেখে এগিয়ে যাবার হুকুম দিতেন তবে হয়ত মরুভূমির যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেত। অজ্ঞাত কারণে তিনি ঘাঁটি গেড়ে বসে রইলেন। ইংরাজ তার সৈন্যবাহিনী পুর্নগঠনের সুযোগ পেল। মাত্র ২৫ হাজার বৃটিশসৈন্য সাইরেনাইকা পুর্নদখল করল। ইটালীয় বাহিনীর অর্দ্ধেক তাদের হাতে নিহত এবং বন্দী হল। বিপ্লবীরা কি করবে ভেবে পেল না। তারা দিশাহারা হয়ে পড়ল। যুদ্ধের সুযোগে ইংরাজকে আঘাত হানতে না পারলে হয়ত মিশরের মুক্তি আনা যাবে না। ইরাকে বিদ্রোহ করলেন রসিদ আলি। বিপ্লবী কমিটি ভাবল—রসিদ আলির পথই তাদের পথ।

তারা মিশরে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবে। তারপর অক্ষশক্তির সঙ্গে চুক্তি করবে। জেনারেল মাশ্রির পরামর্শ নেওয়া হল। তিনি বারণ করলেন। ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থান যত সহজ মিশরে তত সহজ নয়। সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়ে বৃটিশ এখানে উপস্থিত। ওরা বাধা দেবে। ইরাকের রাজনৈতিক নেতারা অস্থিরমতি এবং সুযোগ সন্ধানী যারা রসিদ আলিকে এগিয়ে দিয়েছে প্রতিকূল অবস্থায় তারাই পিছন থেকে তাঁকে ছুরি মারবে। জেনারেল মাশ্রি খাঁটি কথা বলেছিলেন। রসিদ আলি দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রবীণ জেনারেলের মত না পাওয়ায় বিপ্লবী কমিটি সামরিক অভ্যুত্থানের আশা ছেড়ে দিল। তারা অন্য পথের সন্ধানে লাগল। শীঘ্রই সুযোগ পাওয়া গেল।

পাঁচ

বিখ্যাত আফ্রিকা-বাহিনী নিয়ে রোমেল আফ্রিকার রনাঙ্গণে হাজির হয়েছেন। ইরাকে রসিদ আলি বিদ্রোহ করেছেন। রোমেল এগিয়ে আসছেন। আকাশে জার্মান বিমানের একছত্র আধিপত্য। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। জাপনীরা হংকং, সিঙ্গাপুর, ডাচ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং মালয় দখল করেছে। জার্মানী ইউক্রেন জয় করে ককেশাসের দিকে এগুচ্ছে। বৃটিশ আলেকজান্দ্রিয়া এবং কায়রো ছেড়ে যাবার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। দূতাবাসের কর্মীরা কাগজ পত্র পোড়াচ্ছে। অসামরিক ইংরাজ ইতিমধ্যেই মিশর ছেড়ে পালিয়েছে। বিপ্লবী কমিটি সিদ্ধান্ত নিল, জার্মান সহযোগিতায় মিশরের মুক্তি আনতে হবে। মহাসুযোগ তাদের হাতের মুঠোয়। সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা নাহাস পাশা সরকারের উচ্ছেদ। আলি মাহেরের সরকার প্রতিষ্ঠা। বৃটিশ বাহিনীর উপর অবিরাম হামলা। সহযোগী জার্মানী। নাসের

ফ্যাসিস্ত ছিলেন না। তিনি জাতীয়তাবাদী। স্বদেশের মুক্তির জন্য শয়তানের সঙ্গে হাত মিলাতেও তিনি প্রস্তুত। মিশরের সাধারণ মানুষ তখন মনে-প্রাণে বৃটিশ বিরোধী। তাদের মধ্যে নিদারুণ নৈরাশ্য। ইংরাজের প্রত্যেকটি পরাজয়ে তারা উল্লসিত। লিবিয়ায় সদর দপ্তর খুলেছে বিজয়ী জার্মানবাহিনী। প্রায় চল্লিশ হাজার বৃটিশসৈন্য তাদের বন্দী। ইতিমধ্যেই জার্মান এজেন্ট দেখা করেছে জেনারেল মাশ্রির সঙ্গে। বিপ্লবী কমিটিও নিষ্ক্রিয় ছিল না। তারাও লিবিয়ার জার্মান সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগযোগ করার চেষ্টা করতে লাগল। সাদাত আবার মুসলিম ব্রাদারহুডের সুপ্রিম গাইডের সঙ্গে দেখা করলেন। বান্না ভীত এবং সতর্ক। ফারুক তাঁর উপর চটেছেন! ইংরাজ অসন্তুষ্ট। বান্নার আশঙ্কা, শীঘ্রই তাঁর উপর হামলা সুরু হবে। তিনি বাদশার সঙ্গে আপোষের জন্য লালায়িত। তাঁব উদ্দেশ্য ফারুকের উচ্ছেদ নয়, তাকে সংশোধন। বিপ্লবী কমিটি বুঝল, দেশের মধ্যে অন্য কোন দলের সাহায্য পাওয়া যাবে না। একক তাদের লড়তে হবে।

লিবিয়ার জার্মান সদর দপ্তর থেকে খবর পেয়েছিলেন জেনারেল মাশ্রি। ওরা বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে সহযোগীতায় রাজী। ফ্রী অফিসাররা গোপন বৈঠকে বসলেন। নাসের প্রস্তাব দিলেন, জার্মান সহযোগীতা গ্রহণের আগে দরকার—মিশরের সার্বভৌম মর্যাদা রক্ষায় জার্মানীর প্রতিশ্রুতি। রোমেলের এজেন্টদের সঙ্গে যোগযোগ রাখার ভার পেলেন আনোয়ার সাদাত। এদিকে বার্লিন থেকে খবর এল, মিশরীয় বাহিনীর বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে জার্মান সহযোগিতার সর্তাবলী নিয়ে আলোচনার জন্য একটি মিশরীয় প্রতিনিধিদল জার্মানীতে আসা প্রয়োজন। জেনারেল মাশ্রি উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁকে পাঠানই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল সবার। জেনারেল নিজেও রাজী। মিশর ইংরাজের দখলে। দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার সব পথ বন্ধ। জেনারেল মাশ্রিকে সীমান্ত পার

করে দেবার উপায় খুঁজতে লাগল বিপ্লবী কমিটি। জার্মানদের সঙ্গে ঘন ঘন কথাবার্তা চলল। উপায় বাতলে দিল বার্লিন। মিশরের মরুভূমির একটি নির্জন বিমানঘাঁটিতে আসবে একটি জার্মান বিমান। তার গায়ে থাকবে ‑বৃটিশ বিমান বহরের চিহ্ন। একজন সঙ্গীসহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিমানঘাঁটিতে হাজির থাকবেন জেনারেল মাশ্রি। কোন্ বিমানঘাঁটি সুবিধাজনক—জানতে চাইল বার্লিন। জেনারেল মাশ্রি, সাদাত এবং একজন মিশরীয় পাইলট সহ বেরিয়ে পড়লেন পর্যবেক্ষণে। ওরা পছন্দ করলেন এল খাটাবা বিমানঘাঁটি। জার্মানদের জানিয়ে দেওয়া হল। আপত্তি জানাল তারা। বিমানঘাঁটির চারদিকে রয়েছে বৃটিশ সৈন্যদলের ছাউনি। তাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এল খাটাবায় বিমান অবতরণ নিরাপদ নয়। গাবেল রোজা বিমানঘাঁটি সুবিধাজনক। জেনারেল মাশ্রি গেলেন গাবেল রোজা দেখতে। জার্মানদের কথা সত্য। মরুভূমির মধ্যে পড়ে রয়েছে ছোট একটি রানওয়ে। স্থানটি নির্জন। মাটি বেশ শক্ত। আশে পাশে বৃটিশ ছাউনিও নেই। অবাক হলেন সবাই। জার্মানরা এত খবর জানল কি করে? যুদ্ধ সুরু হবার কিছুদিন আগে মিশরে এসেছিল একটি জার্মান বৈজ্ঞানিক দল। মরুভূমির আবহাওয়া, কীট-পতঙ্গ নিয়ে গবেষণা এবং অনুসন্ধান ছিল তাদের কাজ। সবাই বুঝতে পারলেন, তারাই সংগ্রহ করেছে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্যাদি।

নির্দ্দিষ্ট দিনে একজন সঙ্গী নিয়ে রওনা হলেন জেনারেল মাশ্রি। পথে বিকল হয়ে পড়ল তাদের জীপ গাড়ী। মেরামতে সময় নিল আড়াই ঘণ্টা। নির্দ্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে। তবু ছুটলেন তারা গাবেল রোজায়। পৌছে দেখলেন—জার্মান বিমানের চিহ্ন নেই। ওটা এসেছিল সময় মত। কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে গেছে। বৃদ্ধ জেনারেল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। এতদিনের উদ্যম

ব্যর্থ হয়ে গেল। পরে তিনি বহু চেষ্টা করেছেন জার্মানীতে পাড়ি জমাতে। কিন্তু পারেন নি।

রোমেল অনন্য সাধারণ। তার গতিবেগ দুর্বার। আলেক-জান্দ্রিয়ার প্রবেশ পথে তিনি আঘাত হানতে চলেছেন। বৃটিশ ঝাঁপরে পড়েছে। জার্মান গোয়েন্দারা বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। চার্চিল চান ইংরাজের প্রতি মিশরের পূর্ণ আনুগত্য। তার চোখে বৃটিশ উপনিবেশ এবং মিশরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কোন স্বতন্ত্র মতামত স্থানীয় সরকারের থাকবে না। বৃটিশ স্বার্থই মিশরের স্বার্থ। নাহাস পাশা এ নীতি রূপায়নের উপযুক্ত ব্যক্তি। ওয়াফদ দল তাঁর মুঠোর মধ্যে। পাশাঁরা সঙ্গে থাকলে জনমত কেনাবেচা খুবই সহজ। বাদশা-ফারুকের কাছে দাবী জানালেন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত—প্রধানমন্ত্রীর পদে নাহাসকে চাই। বাদশা ~~ইংস্তত~~ ইতস্তত করলেন। ১৯৪২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৃটিশ ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া-বহর আবদিন প্রাসাদ ঘেরাও করল। রাষ্ট্রদূত ল্যাম্পসন প্রধানমন্ত্রীর পদে নাহাস পাশাকে বসাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে ফিরে এলেন। মিশরীয় সৈন্যবাহিনীতে এ ঘটনা নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। বিপ্লবী কমিটি শপথ নিল—কোন অবস্থাতেই ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা নয়। জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। তাত্ত্বিক আন্দোলন জঙ্গী আন্দোলনের রূপ নিল।

ছয়

নাসের মিলিটারী কলেজের ইন্সট্রাক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। অনেক সময় শিক্ষার্থী তার সংস্পর্শে আসছে। বাছাই করা ছেলেদের তিনি দলে টানছেন। গুপ্তসমিতির প্রসার বাড়ছে। সাদাত আগের মতই বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এক রাত্রে

এক কর্মীর দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হল। বাইরে এলেন মেজর হাসান ইজ্জত। সামনে দাঁড়িয়ে রোমেলের এজেন্ট হের্ এপলার এবং এবং হের স্যাণ্ডি। সাদাতের ঘরে এল তারা। এপলার মিশরকে ভালভাবে জানত। তার জার্মান মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল একজন মিশরীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে। মার সঙ্গে মিশরে থাকত সে। সৎ বাবার পদবী ব্যবহার করত। তার নূতন নাম ছিল হুসেন গফ্ফর। ছেলেবেলা থেকেই কুসংসর্গে সে মিশত। লেখাপড়া বিশেষ কিছু করত না। অনর্গল আরবীতে কথাবার্ত্তা বলতে পারত। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের আগে ফিরে গিয়েছিল সে জার্মানীতে। আবার নিয়েছিল পুরানো নাম—হ্যানস্ এপলার। বৃটিশ অফিসারের ছদ্মবেশে স্যাণ্ডিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিল সে মিশরে। ছুজনেই বেপরোয়া। যুদ্ধের সময় গোয়েন্দাবৃত্তি নিয়ে জার্মানী থেকে মিশরে আসা সহজ সাধ্য নয়। প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল তারা। নীল নদের উপর একটি হাউস বোটে থাকত ছু'জন। আগের থেকে খবরাখবর নিয়েই তারা এসেছিল সাদাতের সঙ্গে দেখা করতে। ওরা যে সত্যিকারের জার্মান এজেন্ট—একথা প্রমাণে দেরী হয় নি। ক'মিনিটের মধ্যে তারা যোগাযোগ করেছিল জার্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে। সাদাত তাদের হাউস বোটে গিয়েছিলেন কয়েকবার। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা তাদের। মদ এবং মেয়েমানুষ নিত্যসঙ্গী। ধরা পড়ার ঝুঁকি তারা গ্রাহ্য করত না। মিশরীয় গোয়েন্দাদপ্তরের প্রধান কর্ণেল মুসালুভফি সতর্ক হতে বললেন সাদাতকে। এই কর্ণেলটি ছিলেন ফ্রী অফিসারদের সমর্থক। বড় দেরী হয়েগিয়েছিল। বৃটিশ গোয়েন্দাদপ্তর একটি বারবণিতাকে পাঠাত এপলার এবং স্যাণ্ডির হাউস বোটে। তার মাধ্যমেই জানতে পারল তারা এ ছুজনের কার্যকলাপ। গ্রেপ্তার হল এপলার এবং স্যাণ্ডি। জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে প্রথমে মুখ খোলে নি তারা। এসময় ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী

চার্চিল যাচ্ছিলেন মস্কো কনফারেন্সে যোগ দিতে। নামলেন তিনি কায়রোতে। শুনলেন জার্মান গোয়েন্দা দুজনের কাহিনী। ডেকে পাঠালেন তাদের। প্রতিশ্রুতি দিলেন—তারা যদি সব কথা খুলে বলে তবে তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সামনে মুখ খুলল তারা। বেরিয়ে পড়ল মেজর হাসান ইজ্জত এবং সাদাতের নাম। গ্রেপ্তার হলেন তারা দুজনে। দুজন বৃটিশ গোয়েন্দা অফিসার এবং একজন মিশরীয় পুলিশকর্তা বিচার করলেন। আনোয়ার সাদাত প্রেরিত হলেন মিন্নিয়ার বন্দী-নিবাসে।

বিপ্লবীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সবার মনে ভয়, গুপ্ত তথ্য হয়ত ফাঁস হয়ে যাবে। সৈন্যবাহিনীতে নিদারুণ অসন্তোষ। ফারুক আত্মমর্যাদাহীন এবং অপদার্থ। মস্কো যাবার পথে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যখন কায়রোতে থেমেছিলেন তখন তিনি দৌড়ে বৃটিশ দূতাবাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর অপমান বাদশার মনে ছিল না। একজন রাষ্ট্রপ্রধান যে নিজের দেশে উপযাচক হয়ে বিদেশী দূতাবাসে বিদেশী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন না—এ কূটনৈতিক নিয়ম পর্যন্ত তিনি জানতেন না। তাঁর বেহায়াপনা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। মার্কিন সামরিক অফিসারদের সঙ্গে বাদশা ফারুক দহরম-মহরম করতেন। পদ-মর্যাদার কথা তাঁর মনে থাকত না। তিনি হয়ত ভাবতেন, বৃটিশ ছাড়লে আমেরিকা তাঁকে আশ্রয় দেবে।

নাসের উদ্বিগ্ন। সৈন্যবাহিনীর সব শাখাতেই গুপ্ত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। নিজেকে তিনি যথাসম্ভব অন্তরালে রেখেছেন। সাদাত বন্দীশিবিরে। চাকুরীর বেতন ছাড়া তাঁর কোন আয় নেই। তাও এখন বন্ধ। সাদাতের পরিবারবর্গ অনশনের সম্মুখীন। বিপ্লবী কমিটির বৈঠক ডাকলেন নাসের। নিজেদের মধ্যে টাকা তুলে সাদাতপরিবারকে মাসে দশ পাউণ্ড সাহায্য

দেবার ব্যবস্থা করলেন তারা। খবরটা যখন মিন্নিয়ার বন্দীশিবিরে পৌছল তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন সাদাত। ধনীর ছেলে নন তিনি। গরীবের সংসার মাসে দশ পাউণ্ডেই চলে যাবে। আদাব জানালেন বিপ্লবী কমিটিকে। বিপদের দিনে তারা তাঁকে ভুলে যায় নি। বিপ্লবীদের মধ্যে এতদিন ছিল বৈপ্লবিক বন্ধন। এখন পরল তারা ভ্রাতৃত্বের রাখী। সুখে দুঃখে সমব্যথী। বিপদের দিনে একে অন্যের সহায়।

যুদ্ধের মোড় ঘুরল। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে এল আলা মেইনে জার্মান-বাহিনী প্রচণ্ড ঘা খেল। সোভিয়েট রাশিয়া পাল্টা আক্রমণ সুরু করল। জার্মান সহযোগিতার আশা শূন্যে উড়ে গেল। নাসের বুঝলেন যে তাদের একা দাঁড়াতে হবে। অন্য কোন সাহায্য জুটবে না। সামরিক বাহিনীতে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। তিনি এখন ক্যাপ্টেন। আমের তাঁর বিশ্বস্ত সহচর। সাদাত মিন্নিয়ার বন্দীশিবিরে। সার্থক বিপ্লব এবং মিশরের ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য দরকার কঠোর অধ্যবসায়। তিনি মন দিয়ে পড়তে লাগলেন বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস, সামরিক ষ্ট্রাটেজী এবং বিপ্লবী নায়কদের জীবনী। সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হল তার বিপ্লবী সংগঠনের কাঠামো। সাংগঠনিক প্রশাসন পাঁচটি কমিটিতে ভাগ হয়ে গেল—অর্থনৈতিক, সামরিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাস এবং প্রচার।

অর্থনৈতিক কমিটি—দুঃস্থ সদস্যদের আর্থিক সাহায্য দান, অস্ত্র ক্রয় প্রভৃতির জন্য টাকা সংগ্রহ ছিল এ কমিটির প্রধান কাজ। তারা মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনও ছিল তাদের কর্ম্মসূচীর অঙ্গ। বিপ্লবী কমিটির সদস্যরা তাদের দু মাসের বেতন ঋণ হিসাবে দিয়ে গড়ে তুলেছিল একটি তহবিল। প্রয়োজন হলে ধনী সদস্য এবং সমর্থকদের কাছ থেকে তারা বেশী অর্থ নিত। জেনারেল আজিজ

এল মাগ্রি তাঁর বাগানের আম বেচার সব টাকাই একবার দিয়েছিলেন এ তহবিলে।

সামরিক কমিটি—সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন শাখা থেকে সদস্য সংগ্রহ করত তারা। কড়া পরীক্ষার পর ভর্ত্তি করা হত নবাগতদের বিভিন্ন সেলে। বিশটি সেল নিয়ে নাসের গঠন করতেন এক একটি সেকসন।

নিরাপত্তা কমিটি—সেলগুলো থেকে বাছাই করা সদস্যদের পাঠান হত নিরাপত্তা কমিটির কাছে। তাঁরা ওদের গড়ে পিটে মানুষ করত। প্রত্যেকের উপর কড়া নজর রাখত। সমিতির নিয়ম-কানুন প্রয়োগ এবং শৃঙ্খলা রক্ষা ছিল এদের কাজ। তাছাড়া বৈঠকের স্থান এবং সময় নির্বাচন করত নিরাপত্তা কমিটি।

সন্ত্রাস কমিটি—নাসের নিজে সন্ত্রাসবাদ এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড পছন্দ করতেন না। তিনি জানতেন যে, একটি অসতর্ক হত্যাকাণ্ডে বিপ্লবের পরিকল্পনা হয়ত বানচাল হয়ে যাবে। মুসলিম ব্রাদারহুডের ছিল একটি সন্ত্রাসবাদী শাখা। হয়ত তার অনুকরনেই গঠিত হয়েছিল এ কমিটি। এ কমিটি বিশেষ সক্রিয় ছিল না, একটি মাত্র হত্যার চেষ্টা করেছিল তারা। পরে এ নিয়ে নাসেরের অনুতাপের অন্ত ছিল না।

প্রচার কমিটি—বিপ্লবী কমিটি জানত, সৈন্যবাহিনীর প্রতি জনসাধারণের ধারনা খুবই খারাপ। তারা মনে করত, মিশরীয় বাহিনী স্বেচ্ছাচারী বাদশা ফারুকের পীড়নক যন্ত্র। এদের সাহায্যেই তাঁর স্বৈরতন্ত্র টিকে রয়েছে। এ ধারনা পাল্টান দরকার। সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেও বৈপ্লবিক চেতনা বাড়াবার প্রয়োজন ছিল। এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য নিয়েই প্রচার-কমিটি মাঝে মাঝে ইস্তাহার ছড়াত। কে বা কারা একাণ্ড করছে তা কেউ জানত না। সবাই ভাবত, গোপনে একটা কিছু চলছে।

ছাত্র এবং যুব সমাজে জাতীয়তাবাদের বন্যা এসেছে। তারা

উত্তাল হয়ে উঠেছে। আন্দোলনের নেতা ছিল আবদুল আজিজ আলি। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এই তরুণকে ভালবাসত তরুণ অফিসারেরা। বিপ্লবী কমিটি তার সঙ্গে যোগাযোগ করল। আজিজ আশ্বাস দিল—ডাক এলেই ছাত্র এবং যুবসম্প্রদায় নিয়ে সে ঝাপিয়ে পড়বে।

সাত

১৯৪৪ সাল। মিশরের ভিতরে বারুদের স্তূপ জমা হচ্ছে। রাজনৈতিক অবস্থা অস্থির। ফারুক আমোদ প্রমোদে মত্ত। যুদ্ধের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিষপত্রের দাম চড়ছে। জনাকয় ধনী তুহাতে টাকা লুঠছে। ছোট এবং মাঝারীশ্রেণীর চাষীরা জমি-জমা বিক্রী করে জমিদারদের খামারে কাজ নিচ্ছে। মিশরের আবাদী জমির শতকরা ষাটভাগ মাত্র শতকরা ছ'জন লোকের হাতে চলে গেছে। বিদেশী লগ্নীতে গড়ে ওঠা শিল্পগুলো একচেটিয়া মালিকদের হাতে। এরা আবার জোট বেঁধেছে জমিদাদের সঙ্গে। কায়েমী স্বার্থের তুর্ভেদ্য আঁতাত। ওয়াফদ দল জাতীয়তাবাদী। ভূমিসংস্কারে নেতারা নারাজ। কারণ তারাই জমির মালিক। দেশ থেকে তারা ইংরাজকে তাড়াতে চান। তাড়ানো সম্পূর্ণ হলে বৃটিশ ভাগটুকুও তারা নিজেদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন। বৃটিশ বিরোধীতাই তাদের জনপ্রিয়তার উৎস। ইংরাজের ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া বহরের সাহায্যে ১৯৪২ সালে নাহাসের প্রধানমন্ত্রীর পদ দখলে এ দলের জনপ্রিয়তায় কিছুটা ভাটা পড়েছিল। আবার জোয়ারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের সন্ত্রাসবাদী শাখা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সুরু করেছে। নাহাস তাদের থামাতে পারছেন না। ফারুক ভিতরে ভিতরে জ্বলছেন। তিনি মুসলিম

ব্রাদারহুডের গোপন সমর্থক। নাহাসের বে-ইজ্জতে তিনি খুশী। ইংরাজ তাঁকে বাদশার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। ওয়াফদ দল ফ্যাসাদে পড়েছে। নাহাস পাশা গদী ছাড়লেন। তাঁর ছাড়া-গদী দখল করলেন আমেদ মাহের (আলি মাহের নয়)।

নাসেরের ব্যক্তিগত জীবনে দেখা দিল এক নূতন সমস্যা। তিনি বিয়ে করলেন তাহিয়া খাজেমকে। শ্বশুর ব্যবসায়ী। পূর্বপুরুষ ইরাণী। আর্থিক সঙ্গতি মন্দ নয়। নব-বধূ ঘর করতে এলেন স্বামীগৃহে। নাসের চিন্তিত। মনে সংশয়। কাজটা ভাল হল কি? বিপ্লবী জীবনের নিরাপত্তা নেই। তাহিয়া খাজেম সুখী হবেন তো? স্ত্রীর কাছে মনের কপাট খুলে দিলেন তিনি। বন্ধ রাখলেন শুধু একটি জানালা। এই জানালা দিয়েই পরে বেরিয়ে এসেছিল মিশরের বিপ্লব—আরব জাতীয়তাবাদের অনির্বাণ মশাল।

নাসের শুনালেন তাঁর জীবন-কাহিনী। উত্তর মিশরে আসিস্উটের কাছে ছোট একটি গ্রাম। নাম তার বেনী মোর। এখানে থাকতেন তাঁর মা বাবা। ঠাকুরদা ছিলেন ভূমিহীন কৃষক। পিতা আবদুল নাসের হুসেন ডাক বিভাগের কেরানী। বদলীর চাকরি। ১৯১৭ সালে বিয়ে করেছিলেন তিনি ফাহিমাকে। দাদু মহম্মদ হামাদ কয়লার ব্যবসায়ী। ১৯১৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী তার জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষার পর সাত বছরের শিশু গামেলকে পাঠান হয়েছিল কায়রোতে। কাকা খলিল হুসেন নিঃসন্তান। তার কাছেই থাকত সে। পড়াশুনায় ক'টি বছর কাটল। বাবা বদলী হয়ে এলেন কায়রোতে। সময়টা খুবই খারাপ। চারদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনা। সংবিধান বাতিল হয়ে গেছে। বাদশার হুকুমে শাসন চলছে। কিশোর গামেল এল নাহদা স্কুলের ছাত্র। ক্লাশের পড়াশুনা ভাল লাগে না। সময় পেলেই পড়ে রুশো, ভল্টেয়ার, হুগো, ডিকেন্স, মুস্তফা কামাল, জুলিয়াস সীজার, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন এবং গান্ধীর জীবনী। বুঝবার চেষ্টা করে তাঁদের

লেখাগুলো। ওয়াফদ দল তার ভাল লাগত। গামেল ওদের কর্মীদের সঙ্গে মিশত। আন্দোলনে যোগ দিত। শীঘ্রই এল নৈরাশ্য। নেতারা কেউ খাঁটি নয়। আত্মসর্বস্ব। আমেদ হুসেনের মিসরেল ফাতাত সমাজতন্ত্রী দল। সবুজ সার্ট পরে জঙ্গী কায়দায় কুচকাওয়াজ করত স্বেচ্ছাসেবকরা। কিশোর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। নাসের হামেশাই যেত নেতার কাছে। বুঝতে তার দেরী হল না, আমেদ হুসেন উপযুক্ত নেতা নন। মিশরকে টেনে তুলতে হলে যেসব গুণের দরকার তা তার নেই। বিভ্রান্ত নাসের জড়িয়ে পড়ল ছাত্র আন্দোলনে। রাস্তায় ছাত্রদের সঙ্গে বৃটিশ-পুলিশের প্রচণ্ড লড়াই। নাসের উদ্দাম। রিভলবারের একটি বুলেট তার কপাল ছুঁয়ে চলে গেল। হামেশাই ঘটত এ ধরণের খণ্ডযুদ্ধ। তারপর এল ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ মিশরীয় চুক্তি। মিশর আংশিক স্বাধীনতা পেল। মিশরীয় বাহিনী কাগজে পত্রে বৃটিশের মিত্রপক্ষ, তাবেদার নয়। প্রতিরক্ষাদপ্তরে ঘটল পরিবর্তন। মিশরীয় যুবকদের জন্য খোলা হল মিলিটারী কলেজ। নাসের ১৯৩৬ সালে ঢুকতে চাইল এ কলেজে। কিন্তু পারল না। ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল সে। তার পুলিশ রিপোর্ট প্রতিকূল। আইন পড়তে লাগল নাসের। মন বসে না। ১৯৩৭ সালে মার্চ মাসে আবার চেষ্টা করল সে। এবার তার কপাল ভাল। মিলিটারী কলেজে ভর্তি হল নাসের। মন খুশীতে ভরা। সামরিক জীবন তার অভিপ্রেত নয়। রাজনৈতিক আন্দোলন অসার। সামরিক বিপ্লবের পথই সেরা পথ। এপথেই মিশরের মুক্তি। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সুরু করল সে সময় শিক্ষার্থীর জীবন। অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা সৈনিক বৃত্তি নিতে রাজী নয়। অঢেল টাকা তাদের। বিলাসিতা ছেড়ে কঠোর জীবন তারা নেবে কেন? মধ্যবিত্ত এবং স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরাই জড় হয়েছিল মিলিটারী কলেজে। নাসের তাদের মধ্যেই একজন। ১৯৩৮ সালে গ্রাজুয়েট হল। অন্যান্য সতীর্থের সঙ্গে

গিয়েছিল সে মানকাবাদে। এখানেই ঘটেছিল বিপ্লবের উন্মেষ। পারিবারিক এবং ফৌজী-জীবন তার কাছে গৌণ। মুখ্য মিশরের মুক্তি।

মন দিয়ে শুনছিলেন তাহিয়া খাজেম। কি বুঝেছিলেন তিনিই জানেন। হয়ত কিছুটা বুঝেছেন—কিছুটা বুঝেন নি। হঠাৎ থামল নাসের। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন খাজেম। স্বামীর চোখে জল। নাসের বলল, আট বছর বয়সে তার মা মারা গেছেন। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। ঘরে বৌ এসেছে। কিন্তু মা নেই।

অভিভূত হয়ে পড়লেন খাজেম। স্বামীর কোন কাজে তিনি বাধা দেবেন না। প্রশ্ন করবেন না। তাকে ঘিরে থাকবেন আজীবন। আশ্বস্ত হল নাসের। মনের কপাট খুলেছে সে। বন্ধ জানালায় আঘাত করেন নি খাজেম।

সংগঠনে মন দিলেন নাসের। কাজ এগিয়ে চলেছে। খাজেম বোঝেন, তাঁর স্বামী চাকুরী ছাড়াও অন্য কিছু করেন। তাঁকে কাছে পাওয়া মুস্কিল। সব সময়ই ব্যস্ত। প্রশান্ত চেহারা। মুখে হাসি লেগেই আছে। খাজেমেব সন্দেহ হত, এ প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে এক আগ্নেয়গিরি। প্রশ্ন করতেন না তিনি। সংসার নিয়েই খুশী। বোরখা তিনি কোন দিনই পরেন নি। নাসের বোরখাবিরোধী। বড় লাজুক খাজেম। রাজনীতির ধার ধারতেন না। স্বামীর বন্ধুরা এলে আপ্যায়ণের কোন ত্রুটি থাকত না। কথা বলতেন কম। নাসের নিজকে ভাগ্যবান মনে করতেন। ঘরের বাধা নেই। মনে হত, খাজেম যেন তাঁর নীরব প্রেরণা।

সাদাতের অভাব বোধ করত সবাই। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা এ অফিসারটি বিপ্লবী কমিটির সম্পদ। অনেক সময় বেপরোয়া, কিন্তু আন্তরিকতায় অনন্যসাধারণ। ওয়াফদ দলের প্রাধান্য সর্বত্রই।

তারপরই মুসলিম ব্রাদারহুড। আমেদ হুসেনের সামাজতান্ত্রিকদল যুবমনে খানিকটা দাগ কেটেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলন দানা বেধে উঠছে। ফ্রী অফিসারদের গুপ্তসমিতি সৈন্যবাহিনীতে নিজেদের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দশ বার জন ছাড়া আর কেউ জানে না—সমিতির আসল নেতা কে? অসামরিক ফ্রন্ট একটা দরকার। ছাত্র এবং যুবনেতা আবদুল আজিজ আলি গুপ্তসমিতির নিজস্ব লোক নয়। চরম মুহূর্তে তার সাহায্য কতটুকু মিলবে তাও জানা নেই। ফ্রী অফিসারদের স্বপক্ষে প্রচারের সহযোগিতা আজিজের কাছ থেকে পাওয়া যাবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বাইরের যোগাযোগ সাদাতের ব্যাপক। প্রচার পরিচালনা এবং অসামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলার উপযুক্ত ব্যক্তি তিনি। প্রধানমন্ত্রী আমেদ মাহের নরম পথ নিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সাদাতের ভাগ্যে মুক্তি জুটল না। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের এক সকালে তিনি বন্দীশিবির থেকে পালালেন। নিশ্চিন্ত হল বিপ্লবী কমিটি। অসামরিক একটি ফ্রন্ট এবং স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তোলার ভার দিল তারা সাদাতের উপর।

যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জার্মানী এবং জাপানের পরাজয়ের বেশী দেরী নেই। ইটালী আগেই খসে পড়েছে। ১৯৪৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মানী এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আমেদ মাহের। সেই দিনই পার্লামেন্টে তাঁকে হত্যা করল মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন সন্ত্রাসবাদী। নোক্র্যাচী পাশা প্রধানমন্ত্রী হলেন।. মিশরের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। বৃটিশের ঔদ্ধত্য তখন চরমে। সহরের ভাল ভাল বাড়ীতে তারা থাকে। রাস্তায় মাতলামী করে। ফারুকের রাস-এল-টিন প্রাসাদ বৃটিশ সামরিক অফিসারদের হাসপাতাল। মিশরীয় অফিসারদের প্রবেশ অধিকার সেখানে নেই। ইংরাজের প্রতি জনসাধারণের আক্রোশ

বাড়ছে। সাদাত সৈন্যবাহিনীর বাইরে একটি অসামরিক সন্ত্রাস দল তৈরী করে ফেলেছেন। মুসলিম-ব্রাদারহুড বেপরোয়া। কোন নেতা বৃটিশ সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করলেই নির্ঘাত তার মৃত্যু। নোক্র্যাচী পাশা বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ল্যাম্পসনের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ১৯৩৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী ইংরাজকে সুয়েজ এলাকায় ফিরিয়ে দিতে এবং সুদানের সমস্যায় একটা ফয়সালা করতে পারলেই জনতা শান্ত হবে। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মিশরের প্রধানমন্ত্রীকে বললেন—মিশর ছেড়ে যাওয়া এবং সুদানের প্রশ্ন আলোচনার সময় এখনও আসে নি। সময় যখন আসবে তখন তিনি কথা বলবেন। অপমানিত নোক্র্যাচী ফিরে এলেন। খবর শুনে ফ্রী অফিসাররা গর্জে উঠল। সাদাত উত্তেজিত ভাবে নাসেরর কাছে গেলেন। তাঁর প্রস্তবে—বৃটিশ দূতাবাস উড়িয়ে দেওয়া হোক। তাঁর অসামরিক সন্ত্রাসদল এ কাজটা অনায়াসেই হাসিল করতে পারবে। নাসের বাধা দিলেন। অসময়ে উত্তেজনার রক্তাক্ত প্রকাশ, বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছবার অনুকূল নয়, প্রতিকূল।

আট

১৯৪৫ সালের মে মাসে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নোক্র্যাচী পাশা লণ্ডন যাবার সঙ্কল্প করলেন। সেখানে তিনি মিশর থেকে বৃটিশবাহিনীর অপসারণ এবং সুদানের মিশর অন্তর্ভুক্তির দাবী নিয়ে কথা বলবেন। বৃটিশ সরকার কোন সাড়া দিলেন না। জনতা ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়া এবং মেরসা মাত্রুহের মাঝামাঝি অঞ্চলে রাস এল হেকমায় ফারুক একটি প্রাসাদ তৈরী করছেন। জায়গাটা তাঁর ভাল লেগেছে। গরমের

সময় তিনি সেখানে থাকবেন। জমিটা কেনা হয়েছিল সরকারী টাকায়। জিনিষপত্র আসছে পূর্তবিভাগ থেকে। দক্ষ শ্রমিকেরা সরকারী কর্মী। জোগানদাররা সৈন্যবাহিনীর লোক। প্রাসাদটা ফারুকের নিজস্ব সম্পত্তি। প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপরতলায় নিদারুণ বিশৃঙ্খলা। দুর্নীতিতে সব ছেয়ে গেছে। ঘুষ না দিলে কোন কাজ হয় না। বাদশাকে খুশী রাখলে মেলে খেতাব, পদোন্নতি এবং অন্যান্য সুবিধা। সৈন্যবাহিনীর উপরওয়ালাদের ঘুষ দিলে রাতারাতি পদমর্য্যাদা বাড়ে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিরাম নেই। একটি হত্যাকাণ্ডের সন্দেহে গ্রেপ্তার হলেন সাদাত। বেকসুর খালাস পেতে সময় লাগল আড়াই বছর।

নোক্র্যাচী পাশা টিকে থাকতে পারলেন না। বৃটিশ সরকার অনড়। টাল-বাহনা করে সময় কাটাচ্ছেন। মিশর এবং সুদান থেকে বৃটিশসৈন্যের অপসারণের প্রশ্ন অমীমাংসিত। জনতা উত্তেজিত। নোক্র্যাচী প্রধানমন্ত্রীর গদী ছাড়লেন। ইসমাইল সিদকী সরকার গঠন করলেন। বৃটেনে শ্রমিকদল ক্ষমতায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী এটলি। রাষ্ট্রদূত ল্যাম্পসনকে তিনি মিশর থেকে সরিয়ে নিলেন। বৃটিশবাহিনী সুয়েজ খাল এলাকায় ফিরে গেল। বাকী রইল মিশর এবং সুদান থেকে ইংরাজের পাততাড়ি গুটানোর প্রশ্ন। সিদকী লণ্ডন গেলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিনের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা চলল। একটা চুক্তির খসড়া নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। সুদানের গভর্নর এবং উচ্চপদস্থ বৃটিশকর্মচারীরা বিরূপ। তাঁদের রক্তমাংসে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা মিশান। ওরা ব্যর্থ করে দিলেন সব চেষ্টা। জনসাধারণের দৃষ্টিতে ইজ্জত হারালেন সিদকী। পদত্যাগ করলেন তিনি। আবার প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসলেন নোক্র্যাচী পাশা। তিনি বৃটেনের সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। রাষ্ট্রসংঘের উপর তাঁর অগাধ আস্থা। সংখ্যালঘুদলের প্রধান তিনি। ফারুকের এবং প্রাসাদ ভৃত্যদের কৃপালাভ করলেই

প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়। আইনসভায় সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরুর দরকার পড়ে না। নোক্র্যাচী বিশ্বসভায় নালিশ জানালেন। তাঁর দাবী--মিশর থেকে বৃটিশবাহিনীর অপসারণ এবং সুদানের মুক্তি। নাহাস পাশা তক্ষুনিই নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরে তার করলেন—নোক্র্যাচী মিশরের প্রতিনিধি নয়।

ঘন ঘন বৈঠক বসছে বিপ্লবী কমিটির। সদস্যের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ফ্রী অফিসাররা অধীর হয়ে উঠছে। প্রভাব তাদের বাড়ছে। প্রকাশ্য আন্দোলনের ঝুঁকি এখন তারা নিতে পারে। খোলাখুলিই তারা কর্তৃপক্ষের সমালোচনা সুরু করল। ফ্রী অফিসার কথাটি সৈনিকদের মুখে মুখে ঘুরত। কেউ জানত না, ফ্রী অফিসার কারা এবং কে তাদের নেতা?

১৯৪৮ সালের ১৫ই মে প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হয়েছে। ইহুদীরা নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করেছে। আরবের বুকের উপর ইস্রাইলকে সহ্য করতে আরব রাষ্ট্রগুলো রাজী নয়। তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে প্যালেস্টাইন দখলের হুকুম দিল। নাসের এখন মেজর। তিনি জাকারিয়া মহীউদ্দিন এবং আবদুল হাকিম আমেরের সঙ্গে ট্রেনে গাজায় রওনা হলেন। ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ নাগিব অভিযানকারী মিশরীয় বাহিনীর সেকেণ্ড ইন-কম্যাণ্ড। জি.ও.সি মেজর জেনারেল আমেদ আলী এল মাঝাবী। এ যুদ্ধটা ছিল ফ্রী অফিসারদের কঠিন পরীক্ষায় স্থল। তারা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে জানতে পারল দুর্নীতি এর অকর্মন্যতা সমাজের কত গভীরে ঢুকে গেছে। পরস্পর বিরোধী হুকুম দিতে লাগলেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ। হাতের বোমা হাতেই ফাটে। রাইফেল থেকে গুলি বেরোয় না। ট্যাঙ্কগুলো অকেজো। সাঁজোয়া গাড়ীর অভাব। জীপগুলোর চাকা ঘোরে না। আমেরিকা এবং বৃটেন অস্ত্র, যন্ত্রাংশ প্রভৃতি সরবরাহ বন্ধ করে দিল। আহতেরা বিনা ওষুধে মরছে। খাদ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিদারুণ অভাব। সব রণাঙ্গনেই বিশৃঙ্খলা।

যুদ্ধ আরম্ভের তিন মাসের মধ্যে আততায়ীর গুলিতে নোক্র্যাচী পাশা প্রাণ হারালেন। বুঝতে কারও বাকী রইল না যে, মুসলিম ব্রাদারহুড হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। ঘটনার তিন দিন আগে নোক্র্যাচী এ সংস্থা বে আইনী ঘোষণা করেছিলেন। তাঁকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিল মুসলিম ব্রাদারহুড। প্রধানমন্ত্রী হলেন ইব্রাহিম আবদুল হাদী। প্রায় ন'মাস যুদ্ধ চলল। প্রচণ্ড মার খেল মিশরীয় বাহিনী। বিপর্যয়ের মধ্যেও ব্যক্তিগত বীরত্বের অভাব ছিল না। গাজার বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে ফালুগা ঘাঁটি রক্ষা করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন মেজর নাসের। ফ্রী অফিসারদের মধ্যে অনেকেই মরল। যারা বেঁচে রইল তারা ভুলতে পারল না কর্নেল আমেদ আবদুল আজিজের অন্তিম কথাগুলো। কায়রোর দুর্নীতিপরায়ণ শাসকগোষ্ঠী এবং অপদার্থ সমর নায়কদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন তিনি। রণক্ষেত্রে জাতির অপমান সহ্য করতে পারেন নি। শত্রুর উপর আক্রমণ চালাবার সময় তিনি বুলেট বিদ্ধ হয়ে পড়ে যান। মৃত্যুর আগে সৈনিকদের লক্ষ্য করে কর্নেল আজিজ বলেন—আসল যুদ্ধক্ষেত্র এখানে নয়, খাস মিশরে। চারদিকে বিশ্বাসঘাতকতা এবং চরম কাপুরুষতার মধ্যে একটি মাত্র সেনাপতিকে অফিসাররা শ্রদ্ধা করত। তিনি ব্রিগেডিয়ার নাগিব। সাহসের সঙ্গে তিনি লড়েছিলেন। বিপদের মুখে তিনি নিজে যেতেন। পরপর ক'বার আহত হয়েছিলেন। একবার তাঁর জীবনের আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল।

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে এল মিশরীয় বাহিনী। ফ্রী অফিসারদের মধ্যে যারা বেঁচেছিল তারা জমায়েত হতে লাগল কায়রোতে। রাজনৈতিক হাওয়া গরম। মুসলিম ব্রাদারহুড দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য। তারা ব্যাপকভাবে হত্যা কাণ্ড চালাল। বাদশা ফারুক নির্মম প্রতিশোধ নিলেন। তাঁর ইঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রী হাদী তৈরী করলেন গুপ্তপুলিশবাহিনী। ফ্রী অফিসাররা এ

সংস্থাকে বলত—ঘাতকবাহিনী। বেছে বেছে বাদশার সমালোচকদের গোপনে হত্যা করতে লাগল এরা। মুসলিম ব্রাদারহুডের সুপ্রীম গাইড বান্না গুপ্তপুলিশের হাতে নিহত হলেন। হত্যা এবং পাল্টা হত্যা অবাধে চলল। ফ্রী অফিসার কথাটি বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল। কাঁফে, রেস্তোরায়, হোটেলে এবং সৈন্যবাহিনীতে এ নিয়ে আলোচনা হত। কারা ফ্রী অফিসার, আর কে তাদের নেতা ডজন খানেক অফিসার ছাড়া কেউ জানত না। গুপ্তসমিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বহু অফিসার নিজেদের ফ্রী অফিসার বলতে গর্ববোধ করত। বাদশার কানে পৌছেছিল খবরটা। প্রধানমন্ত্রী হাদীকে তিনি কড়া নির্দেশ দিলেন। হাদী আসল ফ্রী অফিসারদের খুঁজে বার করার জন্য ওঠে পড়ে লাগলেন। নাসেরকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন তিনি। পুলিশ ওয়ারেণ্ট বেরুল। তাঁর বাড়ীতে তল্লাসী চলল। হাদী ডেকে পাঠালেন তাঁকে। কথাবার্তা হল। কিছুই বার করা গেলনা নাসেরের মুখ থেকে। তাঁর উগ্রমূর্ত্তি দেখে ভয় পেলেন হাদী। তিনি ভেবেছিলেন যে, মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে হয়ত নাসেরেব যোগাযোগ রয়েছে। প্রমাণ মিলল না। গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেলেন নাসের। হাদী বুঝলেন, অফিসারটি সরল এবং নির্ভীক। প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে সৈনিকদের হিরো। গোপন ষড়যন্ত্র এর ধাতে নেই। বেশী ঘাটাঘাটি করলে হয়ত সৈন্যবাহিনীর অসন্তুষ্টি বাড়বে। বিপ্লবী কমিটি ঢেলে সাজান দরকার। প্যালেস্টাইন যুদ্ধের পর নূতন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে মিশরে। বেশী দেরী করা চলে না। বৈঠক বসল। দশ জন সদস্য নিয়ে তৈরী হল বিপ্লবী কমিটি। গামাল আবদুল নাসের, কামাল এদ্দিন হুসেন, আবদুল হাকিম আমের, হাসান ইব্রাহিম, আবদুল মোনেইম, আবদুল রওফ, সালাহ সালেম, গামাল সালেম, আবদুল লতিফ বোগদাদী, খালেদ মোহিউদ্দিন এবং আনোয়ার সাদাত হলেন কমিটির সদস্য। মেজর নাসের প্রেসিডেণ্ট।

প্যালেস্টাইন যুদ্ধের পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ করতে লাগল বিপ্লবী কমিটি। ১৯৩৬ সালে। ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির আগে মিশরীয় বাহিনীর শিক্ষা এবং পরিচালনার ভার ছিল বৃটিশের উপর। তারা কোনদিনই এ বাহিনীকে শক্তিশালী হতে দেয়নি। ভয় ছিল, দেশী সৈন্যদলের লড়াইয়ের ক্ষমতা বাড়লে একদিন হয়ত তারা ইংরাজের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াবে। ১৯৩৬ সালের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর উপর বৃটিশ তদারকী তখনও কমেনি। একটি বৃটিশ সামরিক মিশন মিশরে কাজ করত। সৈন্যবাহিনীর কি দরকার সেদিকে তারা নজর রাখত। সামনে ছিল সম্ভাব্য ইস্রাইলী রাষ্ট্র। এমন কোন অস্ত্র ইংরাজ মিশরীয় বাহিনীর হাতে দেয়নি যাতে ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত ইস্রাইলী রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে। তাছাড়া মিশরীয় সেনাপতিরা ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। যারা যত বেশী তোষামোদকারী, বাদশা ফারুক তাদের ততবেশী প্রশ্রয় দিতেন। এমন কোন কাজ নেই টাকার লোভে মিশরীয় সেনাপতিরা করতে পারতেন না।

বৃটেন এবং আমেরিকার অমতে মিশর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধে নেমেছিল। আপৎকালে এ দুটি দেশ মিশরে অস্ত্র এবং যন্ত্রাংশ পাঠান বন্ধ করে দিয়েছিল। অনেক বৃটিশ গান এবং ~~মর্টারস~~ গোলাগুলির অভাবে ব্যবহার করা যায় নি। যন্ত্রাংশের অভাবে বেশ কিছুসংখ্যক মার্কিন ট্যাঙ্ক অকেজো হয়ে পড়েছিল। ইটালী থেকে আনা হাতবোমাগুলো সৈনিকদের হাতেই ফাটত। স্প্যানীশ রাইফেলগুলো ১৯১২ সালের তৈরী। এগুলো দেওয়া হয়েছিল মিশরীয় বাহিনীকে। ইস্রাইলীরা পেয়েছিল চেক, মার্কিন এবং সোভিয়েট স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র। ওদের শিক্ষা এবং সমরপদ্ধতি উন্নত ধরণের। আধুনিক যুদ্ধে ইস্রাইলীরা অভ্যস্থ। সেনাপতিরা বিচক্ষণ এবং যুদ্ধের ষ্ট্রাটেজী সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তুলনায় মিশরীয় সমর পরিচালকরা ছিলেন অপদার্থ। আধুনিক যুদ্ধ বলতে কি

বোঝায় তা তারা জানতেন না। যুদ্ধে নামার আগে প্রতিপক্ষীয় শক্তির পরিমাপ নেওয়ার দরকারও তারা বোধ করেন নি। সবার উপরে কর্তৃপক্ষ ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কায়রোর উপকণ্ঠে মোকাত্তম পাহাড়ে পর পর ক'টি বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ওখানে মজুত ছিল মিশরীয় বাহিনীর গোলাগুলি। বাদশার জ্ঞাতসারে বিদেশী বাতিল সমরসম্ভার কিনেছিলেন কর্তৃপক্ষ। খাতা-পত্রে পুরো দামটাই দিয়েছিলেন সরকার। আসলে দাম ছিল কম। বাড়তি টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার এবং বাদশার পেয়ারের লোকেরা। কেলেঙ্কারীর প্রমাণ গোপনের জন্যই এসব বিস্ফোরণের আয়োজন। প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সময় চক্রীদের কারসাজী মর্মে মর্মে বুঝেছিল ফ্রী অফিসাররা। তাদের কাছে ফারুক এখন এক নম্বর শত্রু।

সৈন্যবাহিনীতে গুপ্তদলকে আড়াল করে রাখার জন্য প্রয়োজন একজন প্রবীণ সেনাপতির। ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ নাগিবের নাম ডাক আছে। দুর্নীতির রাজত্বে তিনি একক সদাচারী। তাঁর স্বদেশপ্রেম প্রশ্নাতীত। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। প্রাসাদচক্রের বিরূপ মনোভাবের ফলে উপযুক্ত পদোন্নতি তাঁর হয় নি। বাদশার উপর হাড়ে হাড়ে তিনি চটা। এঁর সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নিল বিপ্লবী কমিটি।

ব্রিগেডিয়ার নাগিবের সঙ্গে মেজর আবদুল হাকিম আমেরের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে আহত হয়ে ব্রিগেডিয়ার যখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন তখন আমের তাঁকে দেখতে যেতেন। পরিচয়ের পুরানো সূত্র ছেঁড়েনি। আমেরকে ভালবাসতেন নাগিব। এই তরুণ মেজরটি বিনা দ্বিধায় ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে খোলা মনে কথা বলতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমের তাঁকে বললেন—প্যালেস্টাইন যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলা দরকার। কি করে তা সম্ভব? নাসেরের পরামর্শ

চাইলেন আমের। ব্রিগেডিয়ার নাগিব রক্ষণশীল সামরিক অফিসার। বিপ্লবের কথা সহজে তাঁর মনে আসে না। সৈন্যবাহিনীর সংস্কারে ফারুককে বাধ্য করাই তাঁর কাম্য। তারপর আমের বহুদিন গেছেন নাগিবের বাড়ীতে। অনেক কথাবার্তা হয়েছে তাঁদের মধ্যে। ফ্রী অফিসারদের প্রসঙ্গ নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন। এদের আসল মতলব নাগিব জানতে পারেন নি। আমের তাঁকে কিছু বলেন নি। ব্রিগেডিয়ার বুঝেছিলেন যে, আমের ফ্রী অফিসারদের মধ্যে একজন।

একদিন একটি কালো অষ্টিন গাড়ী তাঁর বাড়ীর কাছে থামল। নাগিব জানালা দিয়ে দেখলেন। গাড়ী থেকে নেমে এলেন আমের এবং তাঁর একজন সঙ্গী অফিসার। অফিসারটির জবরদস্ত চেহারা। গায়ের রং ঈষৎ ময়লা। নাক সূঁচালো। তাঁরা ঢুকলেন নাগিবের বাড়ীতে। পরিচয় হল। নাগিব জানলেন, এ অফিসারটি মেজর গামেল আবদুল নাসের। মনে পড়ল, প্যালেস্টাইন লড়াই-এ জীবন বিপন্ন করে ফালুগা ঘাঁটি আগলে রেখেছিলেন এই তরুণ মেজর। কথাবার্তা চলল। নাগিব জানলেন, নাসের নিজে ফ্রী অফিসার। দুজন জুনিয়র একজন সিনিয়রের সততা পরীক্ষা করার জন্য এসেছেন ভেবে তিনি মনে মনে বিরক্ত হলেন। প্রকাশ করলেন না কিছু। তাঁর প্রতি তরুণদের সৌজন্যের অভাব ছিল না। তবু নাগিবের আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল। সামরিক নিয়ম অনুযায়ী জুনিয়রদের কাজ বিনা প্রশ্নে সিনিয়রদের হুকুম তামিল করা, তাদের পরীক্ষা করা নয়! প্রথম সাক্ষাতে নাসেরকে ভাল লাগে নি নাগিবের। তারপর আরও দেখাশুনা তাদের মধ্যে হয়েছে। নাগিব জানতেও পারেন নি যে, নাসের ফ্রী অফিসারদের নেতা। আবার খুশীও হলেন তিনি। একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে মিশরে। তরুণেরা কাজে নেমেছে। তাদের উদ্যমে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলেন নাগিব।

নয়

মিশরের ক্রমবর্দ্ধমান বিশৃঙ্খলার টাল সামলাতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিম আবদুল হাদী। তিনি সাধারণ নির্বাচনের হুকুম দিলেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে নির্বাচন হল। ওয়াফদ দল আইন সভায় বিপুল সংখ্যাধিক্য পেলেন। নাহাস পাশা মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। ফ্রী অফিসারদের প্রচারের বিরাম নেই। একটির পর একটি ইস্তাহার বার করছে তারা। প্রশাসনের উচ্চতম মহলে দুর্নীতির তদন্তের দাবীতে সবাই সোচ্চার। নাহাস পাশা তদন্তের হুকুম দিলেন। বাদাশা ফারুকের আত্মীয় প্রিন্স আব্বাস হালিমের বিরুদ্ধে চার লক্ষ্য ডলার আত্মসাতের অভিযোগ এল। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অমান্য করে গোপনে মিশরে অস্ত্র আমদানীর ভার ছিল তাঁর উপর। গুপ্তভাণ্ডার থেকে প্রচুর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তিনি অস্ত্র কেনার টাকা থেকে চার লক্ষ পাউণ্ড নিজের পকেটে পুরেছেন। ফারুকের বিশ্বস্ত অনুচর এডমণ্ড গাহ্‌লান। মার্কিন ফাউণ্টেন পেনের ব্যবসার ভান করতেন তিনি। আসলে তার ছিল অস্ত্রের কারবার। অস্ত্র সরবরাহকারীদের কাছ থেকে তিনি ঘুষ নিতেন। বকেয়া এবং ক্রটিপূর্ণ অস্ত্র তারা দিত মিশরীয় বাহিনীকে। যখন তদন্ত চলছিল তখন গাহ্‌লান ফ্রান্সে বাদশার সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণ করছিলেন। সন্দেহভাজন এবং তাদের স্ত্রীদের হিসাব পরীক্ষা শুরু হল। তদন্তকারীরা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে হানা দিতে লাগল। গাহ্‌লানের চেক বই পরীক্ষা করে দেখা গেল, তিনি ফারুককে ব্যাঙ্ক বেলজেএট ইণ্টারন্যাশনেলের মাধ্যমে বহু টাকা দিয়েছেন। বাদশার একান্ত পরামর্শদাতা এণ্টোনিও পুল্লিও জড়িয়ে পড়লেন। সরকারী উকিল মহম্মদ আজমিকে ফারুক শাসালেন—বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে রাজমর্যাদা

অবমাননার দায়ে তাঁকে জেলে পাঠান হবে। এখানেই তদন্ত শেষ। গোটা মিশর স্তম্ভিত। ফারুক তাদের উপহাসের পাত্র।

ওয়াফদ দল দক্ষিণপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী। ইংরাজের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ দীর্ঘদিনের। নেতা হিসাবে নাহাস পাশা জনপ্রিয়। তাঁর জনপ্রিয়তা বাদশা ফারুকের ঈর্ষার ইন্ধন জোগাচ্ছিল। বাদশা এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে খটাখটি লেগেই ছিল। একে অন্যকে জব্দ করার সুযোগ পেলে ছাড়তেন না। বৃদ্ধ নাহাসের যুবতী স্ত্রী জয়নাব এল বকিল লোভী। আলেকজান্দ্রিয়ার তুলোর ব্যবসায়ে জালিয়াতি চালিয়ে তিনি অনেক টাকা কামিয়েছিলেন। স্বামীর পদ মর্যাদা ব্যবহারে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। জয়নাবের বে-আইনী অর্থ রোজগারের দোসর নাহাস মন্ত্রীসভার জনাকয় মন্ত্রী। জনসাধারণের বৈপ্লবিক তাগিদে মিশর থেকে বৃটিশ বিতাড়নের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এলেন নাহাস। দলীয় দুর্নীতি চাপা পড়ল। জাতি প্রধানমন্ত্রীর পিছনে এসে দাঁড়াল। সুয়েজ এলাকায় তাঁরা সুরু করলেন মুক্তি আন্দোলন। আরম্ভ হল গেরিলা তৎপরতা। ফ্রী অফিসাররা গেরিলার সামরিক শিক্ষা দিতে লাগল। বিশেষ পুলিশবাহিনী হামেশাই সাহায্য করত সন্ত্রাসবাদীদের। বৃটিশ বাহিনী চরম প্রতিশোধ নিল। সুয়েজের আশেপাশে গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দিল। বৃটিশ সরকার নূতন প্রস্তাব করলেন— তাঁরা সুয়েজ এলাকা ছাড়বেন। বৃটিশ পরিত্যক্ত অঞ্চলে মোতায়েন হবে বৃটিশ, ফরাসী, তুর্কী এবং মিশরীয় যৌথ বাহিনী। নাহাস পাশা সম্মতি দিলেন না। তিনি ১৯৫১ সালের ৬ই অক্টোবর আইন সভার বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন। একতরফা বাতিল হল ১৯৩৬ সালের ২৬শে আগস্টের চুক্তি। আইনসভা নাকচ করলেন ১৮৯৯ সালের সুদানী চুক্তি। ফারুক হলেন মিশর এবং সুদানের বাদশা।

বিপ্লবী কমিটির পক্ষ থেকে ওয়াফদ দলের সেক্রেটারী সেরাগ

এদ দীনের সঙ্গে দেখা করলেন সাদাত। ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনায় মদত চাইলেন তাঁর। বিপ্লবী কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজখবর করতে লাগলেন সেরাগ এদ দীন। নেতাদের নাম জানার চেষ্টা করলেন তিনি। সাদাত সতর্ক হলেন। সেরাগ এদ দীন শুধু ওয়াফদ দলের সেক্রেটারীই নন, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হুঁশিয়ার হবার দরকার ছিল। বাদশার গদীচ্যুতি তাঁর পছন্দ নয়। সেরেগ এদ দীন আঁচ করেছিলেন, ফ্রী অফিসাররা রাজতন্ত্র বিরোধী। তাদের লক্ষ্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ। মুসলিম ব্রাদারহুড সুয়েজখাল অঞ্চলে গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছিল। তাদের নূতন সুপ্রীম গাইডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তিনি চান, মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে বিপ্লবী কমিটির নিঃসর্ত মিলন। সব আলোচনা ফেঁসে গেল। এদিকে বৃটিশবাহিনী সুয়েজ অঞ্চলের মিশরীয় পুলিশ দলকে আত্মসমর্পনের জন্য চরম পত্র দিল। তারা আত্মসমর্পন করল। সেরাগ এদ দীন চটলেন। তিনি বেতার মারফৎ হুকুম দিলেন, এখন থেকে বিশেষ পুলিশবাহিনী শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত লড়াই করবে। ইংরাজ এই চ্যালেঞ্জের সামরিক জবাব দিতে এগিয়ে এল। ১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারা ট্যাঙ্ক এবং হালকা কামান নিয়ে ইসলামিয়ার মিশরীয় বিশেষ পুলিশ দলের ব্যারাক ঘেরাও করল। পনের মিনিটের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দিলেন বৃটিশ কম্যাণ্ডার। ক্যাপ্টেন মুস্তাফা ইব্রাহিম রিফায়াত তার দলবল নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। সুরু হল অসমান লড়াই। বৃটিশবাহিনীর হাতে ট্যাঙ্ক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ী, এবং স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। আর মিশরীয় পুলিশ দলের হাতিয়ার সাবেক কালের বন্দুক এবং হাতবোমা। নয় ঘণ্টা লড়াই-এর পর রিফায়েতের গোলাগুলি নিঃশেষ হয়ে গেল। মরল ৭০ জন এবং আহত এল ৭২ জন। রিফায়েত আত্মসমর্পণ করলেন। মিশরীয় পুলিশ ব্যারাকে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ল।

২৬শে জানুয়ারী সকালে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এ সংবাদ। কায়রোর জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সুরু হল হাঙ্গামা। বাড়ী ঘর জ্বলল। একটি বৃটিশ ক্লাব, একটি ইহুদী স্কুল, মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি অফিস, চারটি হোটেল, সতেরটি নাইট ক্লাব, সাতটি বড় দোকান, আঠারটি সিনেমা এবং সত্তরটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হল। ছোটখাট অগ্নিকাণ্ড চলল সর্বত্র। পঞ্চাশ জন মিশরীয়, এবং নয়জন বৃটিশ সহ সতেরজন বিদেশী প্রাণ হারালেন।

কায়রো যখন জ্বলছিল তখন আবদিন প্রাসাদে চলছিল উৎসব। দশ দিন আগে ফারুক একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি করেছিলেন উৎসবের আয়োজন। বাইরে কি ঘটছে নিমন্ত্রিতেরা জানতেন না। মাঝে মাঝে দূত এসে কি যেন বলে যাচ্ছিল বাদশাকে। বাদশা ফারুক হামেশাই গোপনে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছিলেন প্রধান সেনাপতি হায়দারের সঙ্গে। বেলা ৪টার সময় সামরিকআইন জারী করা হল। দু'ঘণ্টার মধ্যেই সৈন্যবাহিনী অবস্থা আয়ত্তে আনল। দিনটা ছিল শনিবার। মিশরের ইতিহাসে এ দিনটা কালো শনিবার বলে চিহ্নিত হয়ে রইল।

কায়রোর হাঙ্গামার জন্য কে দায়ী তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। অনেকের ধারণা, এটি ফারুক-বৃটিশ চক্রান্ত। নাহাস পাশাকে গদীচ্যুত করার জন্যই এ বীভৎসতার আয়োজন হয়েছিল। কারও কারও মতে, ওটা বামপন্থীদের কাজ। বাদশা এবং সেরাগ এদ দীন পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে লাগলেন। তাদের কাণ্ডকারখানায় সবাই অতীষ্ট হয়ে উঠল। নাহাস পদচ্যুত হলেন। মন্ত্রীসভা গঠন করলেন আলি মাহের। ওয়াফদ দলের কুক্ষিগত আইনসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নির্দ্দেশ দিলেন ফারুক। আলি মাহের ইতস্তত করলেন। একমাস যেতে না যেতেই তিনি গদী হারালেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন আমেদ নাগিব হিলালী।

১৯৫১ সালে হিলালী ওয়াফদ দল ছেড়েছিলেন। দলীয় নেতাদের দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়েই তিনি ওয়াফদ দলের পরিচালকদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসেই হিলালী আইনসভা ভেঙ্গে দিলেন। চরমপন্থীদের পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করতে লাগলেন। ওয়াফদ দল নেতাদের দুর্নীতির তদন্ত সুরু হল। বাদশা ফারুক প্রাসাদচক্রীদের কারও গায়ে হাত দিতে দিলেন না। হিলালীর এক তরফা তদন্তে কারও আস্থা ছিল না। তিনি ব্যর্থ হলেন।

এই ঘটনার দু'মাস আগে ফ্রী অফিসারদের সঙ্গে বাদশা ফারুকের বিবাদ চরমে পৌঁছেছিল। সামরিক অফিসারদের একটি ক্লাব ছিল। তার নাম অফিসার্স ক্লাব। প্রতিবছর এ ক্লাবের কর্মকর্ত্তাদের নির্বাচন হত। সাধারণতঃ বাদশার মনোনীত প্রার্থীরাই নির্বাচিত হয়ে আসতেন। ফ্রী অফিসাররা এবার নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করতে চাইল। বাদশার মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে নামল। তাদের প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য দাঁড়ালেন নাগিব! কার্যকরী কমিটির সদস্যপদের জন্য নির্বাচনী লড়াইএ নামল অন্যান্য ফ্রী অফিসার। ভোটাভুটিতে হেরে গেল ফারুকের সব ক'টি প্রার্থী। বাদশা ক্লাবের অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। দিনের পর দিন চলল বাদশা-ফ্রী অফিসার রেষারেষি।

এ অবস্থায় ঘটল ইসলামিয়ার পুলিশ ব্যারাকের শোচনীয় ঘটনা এবং কায়রোর হাঙ্গামা। বিপ্লবী কমিটি সামরিক অভ্যুত্থানের কথা ভাবতে লাগল। গামাল আবদুল নাসের, আবদুল হাকিম আমের, সালাহ সালেম, আবদুল লতিফ বোঘদাদী, কামাল এদ্দিন হুসেন, জাকোরিয়া মহীউদ্দিন, খালেদ মহীউদ্দিন, আনোয়ার সাদাত, আবদুল মেনেইম, আবদুল রওয়া এবং হাসান ইব্রাহিমকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল নূতন কমিটি। নাসের ছিলেন প্রেসিডেন্ট।

ফারুক এবং তাঁর প্রাসাদচক্রীদের চিন্তার ঢং আলাদা। তাঁরা মনে করতেন, সামরিক বাহিনীর উপরতলায় নিজেদের পেয়ারের লোক বসাতে পারলে তাঁরা নিরাপদ। কাকে প্রধান সেনাপতি, কাকে চীফ অফ স্টাফ, কাকে সাঁজোয়া বাহিনী এবং কাকে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক করা যায় তা আগে ভাগেই ঠিক হয়ে থাকত। বাদশা বেছে বেছে তাঁদের প্রমোশন দিতেন। প্রধান সেনাপতি হায়দার আগে ছিলেন জেল ডাইরেক্টর। সৈন্য-বাহিনীতে তাঁর পদমর্যাদা ছিল দ্বিতীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট। বাদশা বিশেষ ক্ষমতা বলে তাঁকে করে দিলেন লেঃ জেনারেল। ওটা ছিল তাঁকে প্রধান সেনাপতি করার প্রস্তুতি। যথাসময়ে হায়দার হলেন সেনাপতি। সিরি আমের ছিলেন ফারুকের কু-কর্মের সঙ্গী। বাদশা তাঁকে বানালেন মেজর জেনারেল। যতই দিন যেতে লাগল প্রাসাদ-চক্রীরা ততই বেপরোয়া হয়ে উঠল। হায়দার তাঁদের মনের মত কাজ করতে পারছিলেন না। বাদশা তাঁকে সরিয়ে নেবার মতলব আঁটছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিলালী অন্যান্যদের তুলনায় স্বাধীনচেতা নেতা। সিরি আমেরকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পদে নিয়োগের জন্য তাঁর উপর চাপ দিতে লাগলেন ফারুক।

প্রতিরক্ষা দপ্তর নিজের হাতে নিয়ে হিলালী বানচাল করলেন বাদশার উদ্যোগ। জেনারেল সিরি আমের এসময় জড়িয়ে পরেছিলেন এক নক্কারজনক ষড়যন্ত্রে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম মরুভূমিতে মিত্রপক্ষের পরিত্যক্ত ডিজেল তেল, লোহা লক্কড়, গোলাগুলি প্রভৃতি কিনেছিলেন মিশরীয় সরকার। জেনারেল সিরি এবং তাঁর সঙ্গীরা সেগুলো বেচে দিয়েছিলেন একদল ইহুদী চোরাই কারবারীর কাছে। গুপ্তপথে এসব জিনিষপত্র ওরা পাঠিয়েছিল ইস্রাইলে। ঘটনাটি জানাজানি হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবী কমিটি ছড়াতে লাগল ইস্তাহার। তারা সিরির পদত্যাগ দাবী করল। তার উত্তরে ফারুক সিরিকে করতে চাইলেন প্রতিরক্ষা

মন্ত্রী। ক্ষেপে উঠল ফ্রী অফিসাররা। সিরিকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল তারা। এক রাত্রে জেনারেল সিরির গাড়ী লক্ষ্য করে বারবার গুলি ছোড়া হল। একটি বুলেট লাগল ড্রাইভারের গায়। অক্ষত অবস্থায় সিরি পালালেন। অন্ধকারে আততায়ীরাও চম্পট দিল। পরে নাসের অনুতাপ করেছিলেন। গুপ্তহত্যা তাঁর ধাতে সইত না। আর ঝোঁকের মাথায় এমন একটি কাজ তারা করতে গিয়েছিল যার পরিণামে হয়ত বিপ্লবটাই বানচাল হয়ে যেত! আসল লক্ষ্য সিরি হত্যা নয়, বিপ্লব।

প্রধানমন্ত্রী হিলালীকে নিয়ে বিপদে পড়লেন বাদশা ফারুক। প্রাসাদচক্রীরা প্রমাদ গণলেন। প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে দুর্নীতি দমন এবং সংস্কারের কথা বলতেন। ফারুক দুর্নীতি দমন চান, কিন্তু প্রাসাদচক্রীদের গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। ফারুক সংস্কার চান, কিন্তু প্রাসাদ নিয়ে যে কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠছে তার নড়চড় হবার জো নেই। এই অসাধ্য সাধন হিলালীর পক্ষে অসম্ভব। প্রধান সেনাপতি হায়দারের উপর ফারুক চটা। কারণ অফিসার ক্লাবকে তিনি বাতিল করছেন না। হায়দারও বুঝতে পারছেন, তাঁর পদচ্যুতি আসন্ন। ফ্রী অফিসাররা রাজনৈতিক আসর গরম করে তুলছে। তাদের নেতাদের কোন পাত্তা পাচ্ছেন না বাদশা। জেনারেল সিরি আমেরীকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে বসানোর পথ আটকে রেখেছেন হিলালী। প্রাসাদচক্রীরা হিলালী অপসারণের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। এদের নেতা তাবেত। তিনি নাকি প্রাক্তন সাংবাদিক এবং পুস্তক প্রকাশক। টাকা দিয়ে তাঁকে কেনা যেত। ফারুকের বুদ্ধির গোড়ায় সুরসুরি দেওয়া ছিল তাবেতের কাজ। এই বকেয়া তথাকথিত সাংবাদিক বাদশাকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যদি নিজেকে পয়গম্বর মহম্মদের বংশধর বলে জাহির করেন তবে ধর্মভীরু মুসলমানরা তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়বে। এ চাল টিকল না। কারণ সবাই জানত, ফারুকের পূর্বপুরুষ

আলবেনীয়। বেশ্যা, জুয়ারী এবং তোষামোদকারীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন বাদশা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বড় দেখা-সাক্ষাৎ হত না। প্রসাদ ভৃত্য হাসান এল সুলেমানী রাজার নামে ফরমান জারী করত। পাচক আবদুল আজিজ, ড্রাইভার মহম্মদ হিলামি হুসেন, তাবেত, গাহলান, ইলিয়াস এণ্ড্রোজ প্রভৃতি ছিল কুচক্রীদলের সদস্য। বাদশা নেশার ঝোঁকে মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতেন। যাকে সামনে পেতেন তাঁর হাত দিয়েই তিনি পাঠাতেন আদেশপত্র। তিনি যা বলতেন তা অনেকেই শুদ্ধ ভাষায় লিখতে পারত না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠোদ্ধার ছিল কষ্টসাধ্য কসরত। বাদশার মোটন চেহারা, মাথার টাক এবং যৌনবিকার নিয়ে আলোচনা চলত সর্বত্র। ইলিয়াস এণ্ড্রোজের মনে ছিল নিদারুণ ভয়। যুদ্ধের সময় রেয়নের ব্যবসায়ে অসদুপায়ে প্রচুর টাকা কামিয়েছিল সে। তার আগের পেশা জমা-খরচের খাতা লেখা। এখন সে ফারুকের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা। কায়রোতে গুজব রটেছিল, হিলালীকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে হুসেন সিরিকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী প্রাসাদচক্রীদের প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়েছে। হিলালী সরকারের বিরুদ্ধে এ ব্যবসায়ীর আক্রোশ ছিল। তার উপর অনাদায়ী ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার আয়করের মামলা ঝুলছিল। জনসাধারণ প্রাসাদচক্র সম্পর্কে সব গুজবই বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করত। নিরেট এণ্ড্রোজ হিলালীকে অপসারণের উপায় খুঁজতে লাগল। উপায় বাৎলে দিল তাবেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বৃটিশ ছিল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি। তাদের ইঙ্গিতেই মিশরের প্রধানমন্ত্রীদের গদী প্রাপ্তি এবং পদচ্যুতি ঘটত। যুদ্ধের পর শ্রেষ্ঠ শক্তি আমেরিকা। সুতরাং মার্কিন রাষ্ট্রদূতই পারেন হিলালীকে সরাতে। এণ্ড্রোজ ছুটে গেল কায়রোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত কাফেরীর কাছে। তার আবেদন—হিলালীকে পদচ্যুত

করতে হবে। কৌতুকের হাসি হেসে তিনি বিদায় দিয়েছিলেন এণ্ড্রোজকে।

হিলালী বৃটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কোন মীমাংসা হল না। ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়লেন। মন্ত্রীসভা গঠনেব দায়িত্ব নিলেন হুসেন সিরি। মুস্কিলে পড়লেন তিনি। মন্ত্রী হবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নেতা এগিয়ে আসতে চান না। সুযোগ সন্ধানীরা আশে পাশে ঘুরাফেরা করছে। তাবেত প্রচারমন্ত্রী হবার জন্য বায়না ধরেছে। সিরি বিব্রত। জোড়াতালি দিয়ে একটি মন্ত্রীসভা তিনি দাঁড় করালেন। প্রধান সেনাপতি হায়দারের উপর বাদশার আস্থা নেই। ফ্রী অফিসারদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তিনি নিতে পারেন নি। এ ধৃষ্টতা বাদশা সহ্য করতে রাজী নন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন—পাঁচ দিনের মধ্যে অফিসারস্ ক্লাবের কার্যকরী কমিটিকে বাতিল না করলে হায়দারকে পদচ্যুত করতে হবে। এই সঙ্গে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বারজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করা দরকার। হায়দারকে ডেকে পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী সিরি। জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে—এ বার জন সামরিক অফিসার কে? হায়দার বলতে পারলেন না কিছু। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বললেন, তার সঙ্গে পরামর্শ না করে যেন অফিসারস্ ক্লাব সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। হায়দার বুঝলেন, তাঁর প্রধান সেনাপতির পদ বিপন্ন। তর সইল না। তিনি ১৫ই জুলাই অফিসারস্ ক্লাবের কার্যকরী কমিটি বাতিল করে দিলেন। কৈফিয়েৎ চাইলেন সিরি। হায়দারের সোজা উত্তর—তিনি বাদশার আদেশ পালন করেছেন।

দশ

১৯৫২ সালের ১৬ই জুলাই। বিপ্লবী কমিটির জরুরী বৈঠক বসল। উপস্থিত ছিলেন নাসের, হাসান ইব্রাহিম, কামাল এদ্দিন হোসেন, আবদুল হাকিম আমের, খালেদ মহীউদ্দিন, আবদুল লতিফ বোঘদাদী এবং সাদাত। তারা খবর পেয়েছিল, ফারুকের পুলিশ বিপ্লবী কমিটির ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য ওঠে পড়ে লেগেছে। নেতাদের নাম হয়ত তারা জেনে ফেলেছে। ফারুক রাশি রাশি টাকা সুইটজারল্যাণ্ডে পাঠাচ্ছেন। একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য তিনি তৈরী হচ্ছেন। বিপ্লব আর পিছিয়ে দেওয়া চলে না। একবার অবস্থার বিপাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন পিছানো হয়েছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৫২) বৈঠকে বিপ্লবী কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মার্চ মাসেই তারা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবে। নাসের যোগাযোগ করেছিলেন কর্ণেল মহম্মদ রসিদ মেহান্নার সঙ্গে। আসন্ন অভ্যুত্থানে তার সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। মেহান্না রাজী হলেন। কথা ছিল, সঙ্কেত পেলেই তিনি তার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবেন। মেহান্না ফ্রী অফিসার না হলেও তাদের সমর্থক। অফিসারস্ ক্লাবের নির্বাচনে তিনি ফ্রী অফিসারদের সাহায্যেই কার্যকরী কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেহান্নার সাহায্যের দরকার ছিল। কারণ তার বাহিনী তখন কায়রোতে অবস্থান করছিল। দিন যত এগিয়ে এল মেহান্নার মতিগতি ততই এলোমেলো হতে লাগল। একদিন তিনি এসে বললেন যে, তিনি গাজায় বদলী হয়েছেন। মেহান্না চলে গেলেন। নাসেরের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগই তিনি রাখলেন না। গোপনে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, তলে তলে চেষ্টা করে নিজের উদ্যোগেই মেহান্না বদলীর হুকুম বার করে নিয়েছেন। ফলে

অভ্যুত্থানের দিন স্থগিত রাখা হয়েছিল। বিপ্লবী কমিটি ৫ই আগস্ট তারিখটি ভেবে রেখেছিল।

ঘটনার গতি দ্রুত বদলাচ্ছিল। বেশী দেরী করলে বিপদ। দু'তিন দিনের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। চরম মুহূর্তে একজন প্রবীণ জেনারেলকে সামনে রাখা দরকার। নাগিব সামনে রয়েছেন। তিনি ফ্রী অফিসারদের অনেকের পছন্দসই নন। প্রধানমন্ত্রী সিরি মনে করেছিলেন যে, নাগিবকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীপদে বসালেই ফ্রী অফিসারদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। তিনি তাঁকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। নাগিবেরও বিশেষ আপত্তি ছিল না। ফারুকের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয় নি। সিরির আগে হিলালীর অনুরূপ চেষ্টা বাদশার প্রতিবন্ধকতায় বানচাল হয়ে গিয়েছিল। নাগিব রক্ষণশীল। বিপ্লবের চেয়ে সামরিক শৃঙ্খলতা বেশী বোঝেন। ফ্রী অফিসারদের মধ্যে কারও কারও মনে এধারণা বদ্ধমূল ছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকলেও নাগিবের চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে সবাই একমত। সৈন্যবাহিনীর উপর তলাব দুর্নীতি থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মূলতঃ তিনি বিপ্লবী নন, সংস্কারপন্থী।

মনে পড়ল জেনারেল আজিজ এল মাশ্রির কথা। যুদ্ধের সময় এই প্রবীণ জেনারেল ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে পদচ্যুত হয়েছিলেন। জার্মানীর সহযোগিতায় মিশরের মুক্তির চেষ্টায় তিনি গোপনে বার্লিন যাবার পথে চেষ্টা করেছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি বন্দীশিবিরে কাটিয়েছেন। তাঁকে পুরোভাগে পাবার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। সিদ্ধান্ত হল—জেনারেল মাশ্রি। সম্মত হলে মাশ্রি, তাঁর অসুবিধা থাকলে নাগিব হবেন অভ্যুত্থানের সামনের সারির লোক দেখানো প্রধান নেতা। পিছন থেকে সব কাজ করবে ফ্রী অফিসাররা। পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার নিলেন নাসের। তার সহযোগী হলেন আমের, কামাল এদ্দিন হুসেন এবং জাকারিয়া মহীউদ্দিন।

নাসের দেখা করলেন জেনারেল আজিজ এল মাশ্রির সঙ্গে। সব শুনে খুশীতে ভরে উঠলেন জরাজীর্ণ মাশ্রি। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ এবং ভয়ানক অসুস্থ। সামরিক অভ্যুত্থানের দায়িত্ব নেবার মত শারিরীক সামর্থ তাঁর নেই। তিনি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন আসন্ন বিপ্লবকে।

ফারুক নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি মনে করলেন, হায়দারের স্থলে চীফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল হুসেন ফরিদকে প্রধান সেনাপতির পদে এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে সিরি আমেরকে বসাতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। তারা অনায়াসেই বিপ্লবী অফিসারদের ধরে জেলে পুরাতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী সিরি হুসেনের উপর প্রচণ্ড চাপ এল। কায়রোতে গুজব রটল, সিরি আমের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হতে চলেছেন। ক' ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রী অফিসারদের উপর হামলা সুরু হবে।

১৯ শে জুলাই রাত্রে প্রধানমন্ত্রী সিরি পদত্যাগ করলেন। পরের দিন সকালে বিপ্লবী কমিটির বৈঠক বসল। একে একে হাজির হলেন নাসের, আমের, আনোয়ার সাদাত, সালাহ সালেম, আবদুল লতিফ বোঘদাদী, কামাল এদ্দিন হুসেন, জাকারিয়া মোহী-উদ্দিন, খালেদ মহীউদ্দিন, হাসান ইব্রাহিম, এবং আবদুল মোনেইম, আবদুল রওফ। বিপ্লবী কমিটির প্রেসিডেণ্ট গামাল আবদুল নাসের সবার সামনে তাঁর পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করলেন—ক্ষমতা দখলের তিনটি পর্যায় থাকবে। প্রথম পর্যায়—ক্ষমতা দখল এবং নিজেদের মনোনীত কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসানো। দ্বিতীয় পর্যায়—মার্কিন এবং বৃটিশ নাগরিকদের নিরাপত্তার অভয় দান। তৃতীয় পর্যায়—বাদশা ফারুকের অপসারণ। নাসের অফিসারদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিলেন। উইং কম্যাণ্ডার আবদুল এল লতিফ বোঘদাদী কায়রোর উপকণ্ঠে আলমাজা বিমান ঘাঁটি দখল করবেন। পাইলটদের পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে তা বুঝিয়ে দেবেন তিনি এবং স্কোয়াড্রন লীডার হাসান ইব্রাহিম।

লেঃ কর্ণেল হুসেন এল শোফী এবং মেজর খালেদ মহীউদ্দিন অশ্বারোহী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ভার নেবেন।

লেঃ কর্ণেল আবহুল মোনেইম আমিন সাঁজোয়া বাহিনী পরিচালনা করবেন। পদাতিক নিয়ন্ত্রণে থাকবেন লেঃ কর্ণেল ইউসুফ সাদিক মনসুর এবং মেজর কামাল এদ্দিন হুসেন। সালাহ সালেম রাফার সামরিক ঘাঁটি দখল করবেন।

লেঃ কর্ণেল গামাল আবহুল নাসের এল আরিশের সামরিক ঘাঁটি নিজের দখলে আনবেন। তের নম্বর পদাতিক ব্যাটেলিয়ান ঘেরাও করবে কায়রোর সামরিক সদরদপ্তর। এখানে নাসেরের সহযোগী হবেন লেঃ কর্ণেল আবহুল হাকিম আমের এবং লেঃ কর্ণেল আনোয়ার সাদাত।

ইতিমধ্যে আল-মিশ্রির সম্পাদক আমেদ আবুল ফাত খবর পাঠালেন, ফারুক মন ঠিক করে ফেলেছেন—তিনি সিরি আমেরকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য বাদশা নিজের মনের মত লোক খুঁজছেন। হু'এক দিনের মধ্যেই হয়ত নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। ১৪ জন নেতৃস্থানীয় ফ্রী অফিসারের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। নূতন সরকারের প্রথম কাজ—এদের গ্রেপ্তার করা। বিপ্লবী কমিটি সিদ্ধান্ত নিল, নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হবার আগেই আঘাত হানতে হবে। তা না হলে কর্তৃপক্ষ হয়ত সব জেনে ফেলবেন। পরিকল্পনার অঙ্কুরে বিনাশ ঘটবে। নাসের ঘোষণা করলেন—ক্ষমতার দখলের দিন—২২শে জুলাই। অভিযান আরম্ভের সময়—রাত্রি একটা। যাদের উপর সৈন্য পরিচালনার ভার রয়েছে তারা প্রত্যেক দিন বাড়ীতে থাকবে। রাত্রি একটার আগে ঘুমাতে যাবে না। যে কোন সময় জরুরী টেলিফোন বেজে উঠতে পারে। ফ্রী অফিসারদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হল। বাকী রইলেন মেজর জেনারেল নাগিব। তাঁকেও জানিয়ে রাখা দরকার।

২০শে জুলাই বিকেল। বাদশা ফারুক রয়েছেন আলেক-জান্দ্রিয়ার মোনতাজহ প্রাসাদে। গরমের সময় সাধারণতঃ তিনি সেখানেই থাকেন। প্রাসাদচক্রীরা সেখানে ভীড় জমিয়েছে। সুযোগসন্ধানীরা বাদশার সঙ্গে সঙ্গে গেছে আলেকজান্দ্রিয়ায়। বড় বড় হোটেলে তারা ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী পদের উমেদাররা ছুটাছুটি করছে। রাজভৃত্যেরা সবাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বাতাসে বাতাসে টাকার নোট উড়ছে। ফারুক কিছুটা আস্বস্থ। তাঁর ধারনা, জনাকয় ফ্রী অফিসার বিদ্রোহের চেষ্টা করলেও সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ রাজ-আনুগত্যে অটুট থাকবে। মিশরের কেউকেটার দল ইউরোপে প্রমোদ ভ্রমণে ব্যস্ত। গরমের অবকাশ যাপনের এই তাদের রেওয়াজ।

ছোট কালো রঙের অষ্টিন গাড়ীতে উঠলেন নাসের। সঙ্গে আমের। গাড়ী ছুটল। অষ্টিন থামল এসে নাগিবের বাড়ীর দরজায়। নামলেন নাসের এবং আমের। সোজা ঢুকলেন তাঁরা বৈঠকখানায়। নাগিব দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পগুজবে ব্যস্ত। তিনি অফিসারের দু'জনকে বসতে বললেন। উসখুস করতে লাগলেন তাঁরা। অপর দু'জন আগন্তুক ওঠার নাম করছেন না। সন্দেহ এড়াবার জন্য নাসের অফিসার্স ক্লাবের কথা পাড়লেন। তারপর আমেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নেমে এলেন। আবার অষ্টিন গাড়ী ছুটল। আসল কথা নাগিবকে বলা হল না। নাগিব এবং তাঁর আলাপরত দু'জন বন্ধু—কর্ণেল গালাল লাদা এবং সাংবাদিক মহম্মদ হুসেন হেকল শুধু বোঝালেন, অফিসার্স ক্লাব নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য নাসের এবং আমের এসেছিলেন। ভিতরে ভিতরে কি ঘটছিল তাঁরা তখন জানতেও পারলেন না।

রাত্রে কায়রো বেতার ঘোষণা করল—আমেদ নাগিব এল হিলালী প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসমাইনোরিন। অবাক হল ফ্রী অফিসাররা। এই হিলালীর

সঙ্গে ফারুকের মন কষাকষির অন্ত ছিল না। বাদশার ইচ্ছা পূরণে গড়িমসি করার জন্য তিনি বারবার অপমানিত হয়েছেন। মিশরীয় নেতাদের প্রধান গুণ—কোন অপমানই তাঁরা বেশীদিন মনে রাখেন না। জনসাধারণ নির্বিকার। বহু মন্ত্রীসভার উত্থান-পতন তারা দেখেছে। গত ছ'মাসে পাঁচটি মন্ত্রীসভার রদবদল তাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। ক্ষমতায় কে এল এবং ক্ষমতা থেকে কে ছিটকে পড়ল—এ নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। মিশর ডুবছে। তাকে টেনে তোলার সাধ্য রাজনৈতিক নেতাদের নেই।

২১শে জুলাই। নূতন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভয়ানক ব্যস্ত। প্রধান সেনাপতি হায়দার এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার নিয়ে তিনি বৈঠক করছেন। বাদশার হুকুম—অবিলম্বে ফ্রী অফিসারদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তাদের নামের তালিকাও তৈরী হয়ে আছে। কিন্তু গ্রেপ্তার করবে কে? চারদিকে ষড়যন্ত্র। কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। তবু ওদের গ্রেপ্তার করা চাই।

বিপ্লবী কমিটির তৎপরতা বেড়ে গেল। সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটি শাখার মধ্যে রয়েছে ফ্রী অফিসার। অনেকের হাতে আবার নিজস্ব বাহিনী পরিচালনার ভার। নাসের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। শেষ নির্দ্দেশ দেবেন তিনি। অনেকে উপযাজক হয়ে সরকারী গুপ্তথ্য ফ্রী অফিসারদের কাছে ফাঁস করে দিয়ে যাচ্ছে। গোয়েন্দা বিভাগেও বিপ্লবীদের সমর্থকের সংখ্যা বাড়ছে। সবাই বুঝতে পারছে—একটা কিছু ঘটতে চলেছে কে যে "একটা কিছু ঘটাবার" নায়ক তা বাছাবাছা ক'জন ছাড়া কেউ জানে না। মিশরীয় নৌবহর ছোট। প্রতিরক্ষায় তাদের ভূমিকা গৌণ। সেখানে ফ্রী অফিসারদের উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটেনি। সামরিক অভ্যুত্থান হলে নৌবহরের বাধা দেবার সামর্থ নেই। ইতিমধ্যে নাগিবকেও চরম মুহূর্তের আঁচ দিয়ে রাখা হয়েছে। প্রস্তুতি তখনও অসম্পূর্ণ। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সাদাত গেছেন রাফায়।

সেখানকার উদ্যোগ আয়োজনে সালাহকে সাহায্য করার কথা তাঁর।

২২শে জুলাই। দিনটা বেশ গরম। প্রতিদিনের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই চলছে। সৈন্যব্যারাকের আবহাওয়া থমথমে। ফ্রী অফিসারদের অনেকে গম্ভীর। অনেকে আবার উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। কালো ছোট অষ্টিন গাড়ীটির একদণ্ড বিশ্রাম নেই। ওর ম্যালিক নাসের ওখানেই বাসা বেঁধেছেন। গাড়ী কেবল ছুটাছুটি করছে। আসন্ন অভ্যুত্থান প্রত্যেকটি নায়কের সঙ্গে দেখা করে নাসের প্রস্তুতির পরিমাপ নিচ্ছেন। সাদাতকে ডেকে পাঠালেন তিনি। নাসেরের জরুরী আহ্বান পেয়েই তিনি ছুটলেন কায়রোতে। বিকেল সাড়ে চারটায় এসে পৌঁছলেন বাড়ীতে। কোন খবর নেই। বাড়ীর কাছেই একটি পার্ক। এখানে খোলা জায়গায় চলছিল সিনেমা। ছেলেমেয়ে নিয়ে সিনেমা দেখতে লাগলেন সাদাত।

নাসেরের বিশ্রাম নেই। তিনি উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছেন। বিপ্লবীদের শ্লোগান—স্বৈরতন্ত্র খতম কর। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। শত্রু-মিত্র চেনার সাংকেতিক মন্ত্র—নাস্‌র (বিজয়)। বেলা পড়ে আসছে। কায়রোর রেঁস্তরা এবং কাফেগুলোতে লোকজন গিজগিজ করছে। কারও মনে কোন উদ্বেগ নেই। মিশরীয়দের জীবনযাত্রা ঢিমেতালে চলে। ২২শে জুলাইয়ের সন্ধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নেই। রাত্রি বারটার মধ্যে রাস্তাগুলো ফাঁকা হয়ে যাবে। একটায় বিপ্লবের সূচনা। সংঘর্ষ বাধলে অসামরিক জনতা গোলাগুলির মধ্যে পড়বে না। তাদের নিরাপত্তার জন্যই রাত্রি একটায় আঘাত হানার ব্যবস্থা।

সৈন্যাবাসগুলোতে সারাদিন অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতা এবং কানাঘুষা দেখে একজন অফিসার সন্দেহ করল—ফ্রী অফিসাররা দু' একদিনের মধ্যেই বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবে। সে তাড়াতাড়ি

সদর দপ্তরে খবর পাঠাল। নূতন প্রধানমন্ত্রী হিলালী প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেরিনকে ডেকে পাঠালেন। খানিকক্ষণ দু'জনের মধ্যে পরামর্শ চলল। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান সেনাপতি হায়দারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হল। হায়দার ফ্রী অফিসারদের গ্রেপ্তারের জন্য চীফ অফ স্টাফ জেনারেল হুসেন ফরিদকে হুকুম দিলেন। কুবরী এল কুব্বায় সামরিক সদর দপ্তরে সৈন্য এবং পুলিশবাহিনীর বিভিন্ন শাখার প্রধানদের বৈঠক ডাকলেন জেনারেল ফরিদ। আরম্ভ হল তাদের বৈঠক। রাত্রি বেড়ে চলছে। পরামর্শ শেষ হচ্ছে না। অবিলম্বে ফ্রী অফিসারদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। সৈন্যবাহিনীতে ফ্রী অফিসারদের জনপ্রিয়তার সংবাদ তারা রাখেন। তাদের স্পর্শ করা সহজসাধ্য নয়। হাতের কাছে যে সৈন্যদল পাওয়া যায় তাদেরই পাঠাতে হবে ফ্রী অফিসারদের ধরে নিয়ে আসার জন্য। গোয়েন্দা অফিসার ক্যাপ্টেন সাদ তেবফিক বিপ্লবীদের সমর্থক। তিনি ছুটলেন যে কোন একজন ফ্রী অফিসারের সন্ধানে। তার কাছ থেকে জানা গেল, সদর দপ্তরে জেনারেল ফরিদের বৈঠক বসেছে। ফ্রী অফিসারদের গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে। নাসেরের কাছে সংবাদ পাঠান হল। তিনি সব শুনে বললেন—ভালই খবর। সবাইকে এক সঙ্গে পাওয়া যাবে। ছোট কালো রংএর অষ্টিন গাড়ীটা আবার রাস্তায় বেরুল।

বিপ্লবী কমিটির কাউকে তিনি খুঁজে পেলেন না। সবার মনে ছিল নিদারুণ উদ্বেগ। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ শেষ করতে হবে। তারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই বেরিয়ে পড়েছে। বিপ্লব সুরু হয়ে গেছে।

এগার

রাত্রি তখন প্রায় ১২টা। কালো রঙের ছোট অষ্টিন গাড়ী ছুটছে। কায়রোর রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন। দু'চারজন পথচারী হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ণ শোনা যাচ্ছে। এক ঝলক আলোকে চোখ ধাঁধিয়ে এক একটি মোটর বিদ্যুৎবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হচ্ছে। নাসেরের অষ্টিন গাড়ী ছুটছে। দূর থেকে ভেসে আসছে একদল সৈন্যের তালে তালে চলা বুটের আওয়াজ। ওরা মার্চ করছে। শত্রু না মিত্র? এ দল যাচ্ছে কোথায়? নাসের এগিয়ে চলেছেন। মুখোমুখি হতেই তিনি গাড়ী থেকে নামলেন। চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন—থামো! দাঁড়িয়ে থেমে গেল সৈন্যদল। এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন মহম্মদ চেদিদ। ফ্রী অফিসারদের গ্রেপ্তার করার জন্য ওঁকে পাঠিয়েছেন চীফ অফ স্টাফ জেনারেল ফরিদ। আত্মপরিচয় দিয়ে নাসের ~~জিজ্ঞাসা করলেন~~ বললেন—গ্রেপ্তার কর। মাটিতে বুট ঠুকে চেদিদ তাঁকে স্যালুট করল। বলল—আমি আপনার জিম্মায়। নাসের হুকুম দিলেন—সদর দপ্তর দখল কর। ক্যাপ্টেন চেদিদ হাঁকল—পিছনে ঘুর। সৈন্যেরা এক পাঁকে পিছন ঘুরল। তারপর দ্রুত মার্চ। নাসের গাড়ী নিয়ে পাশে পাশে চললেন। সদর দপ্তরের কাছে যেতেই তিনি দেখলেন দাঁড়িয়ে আছেন আমের। তাঁর উপর হুকুম হল, চেদিদের বাহিনী নিয়ে সদর দপ্তর ঘেরাও করার। মুহূর্তের মধ্যে বিরাট বাড়ীটার প্রত্যেকটি কামরার আলো জ্বলে উঠল। বাইরে আলোর ঝলকানি পড়তে লাগল। আমের বুঝলেন সবাই পজিশন নিচ্ছে। তিনি আক্রমণের হুকুম দিলেন। দু'জন প্রহরী বাধা দিতে গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর কোন সাড়াশব্দ

নেই। রিভলবার হাতে সঙ্গীদের নিয়ে সদর দপ্তরে ঢুকে পড়লেন আমের। দরবার কক্ষে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে বসে আছেন চীফ অফ স্টাফ জেনারেল ফরিদ এবং উপরতলার অন্যান্য অফিসার। আমের রিভলবার উঁচিয়ে বললেন—আপনারা আমার বন্দী। শূন্যে দু'হাত তুলুন। কেউ কোন বাধা দিলেন না। নীরবে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

সাদাত পার্কের খোলা অঙ্গনে সিনেমা দেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। মনটা তাঁর হালকা। রাত্রি একটায় চরম লগ্ন। বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়ে তিনি বেরিয়ে যাবেন। ফিরবেন কিনা জানা নেই। মাত্র দু' ঘণ্টার জন্য ছেলে-মেয়েদের কাছে পেয়েছেন। তাতেই তিনি খুশী। বাড়ীতে ঢুকেই তিনি শুনলেন, নাসের দু'বার এসে তাঁর খোঁজ করে গেছেন। বৈঠকখানায় মিনিট দুই তিনি বসেছিলেন। সাদাতের জন্য একটি জরুরী চিঠি লিখে রেখেছেন। সাদাত দেখলেন, টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে একটা খাম। উপরে নাসেরের হস্তাক্ষর। তিনি চিঠি পড়লেন—আজ রাত্রে সম্ভাব্য ঘটনা ঘটবে। আবদুল হাকিমের বাড়ীতে জমায়েত হও। সময় ১১টা। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন সাদাত। ইউনিফরম পরলেন। ছুটলেন আবদুল হাকিম আমেরের বাড়ীর দিকে। সব ফাঁকা। কেউ ওখানে নেই। তবে কি নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ সুরু হয়ে গেছে? সাদাত ছুটে চললেন সামরিক সদর দপ্তরের দিকে। পৌঁছে দেখলেন, সৈন্যেরা ঘেরাও করে আছে সদর দপ্তর। তিনি ঢুকতে চাইলেন। প্রহরীরা বাধা দিল। সাংকেতিক কথা,—"নাসর" তাঁর জানা নেই। সদর দপ্তরের বিপরীত দিকে সামরিক হাসপাতাল। অসহায় সাদাত দাঁড়িয়ে রইলেন হাসপাতাল ভবনের সামনের ফুটপাথে। দূরে আবদুল হাকিম আমেরকে দেখা গেল। চীৎকার করে ডাকলেন—আমের! আমের! চারদিকে হট্টগোল। দূর থেকে মেসিনগানের আওয়াজ

আসছে। আমের শুনতে পাচ্ছেন না তাঁর কথা। প্রাণপণে ডাকলেন সাদাত—আমের। এবার শুনতে পেয়েছেন আমের। তিনি দৌড়ে এসে সাদাতের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁকে সদর দপ্তরে।

রাত্রি তখন দেড়টা। যে যার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চুকিয়ে দিয়েছেন। কায়রোর প্রবেশ পথে বিপ্লবী সৈন্যদলগুলোর সমাবেশ ঘটেছে। সামরিক সদর দপ্তর বিপ্লবীদের হাতে। জাকারিয়া মহীউদ্দিন তাঁর নিরাপত্তা দল নিয়ে সম্ভাব্য প্রতি-বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারে ব্যস্ত। নাসের ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিখুঁত পরিকল্পনা এবং সুন্দর তার রূপায়ন। এদিকে কায়রোর উপকণ্ঠে ভীড় বাড়ছে। কাতারে কাতারে সৈন্য আসছে। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি হরেক রকমের সামরিক যান জড় হচ্ছে। সৈন্যরা অধীর। নাসের হুকুম দিলেন—সহর দখল কর। রাত্রি আড়াইটার মধ্যেই সব শেষ। সরকারী ভবন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বেতার কেন্দ্র—সব কিছুই বিপ্লবীদের হাতে। কায়রোর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে সৈন্যদল টহল সুরু করল। পার্কে পার্কে এবং রাস্তার চৌমাথাগুলোতে ট্যাঙ্ক সাজান হল। কায়রো এবং আলোকজান্দ্রিয়ার আকাশে উড়তে লাগল পিষ্টন বোমারু এবং জেট জঙ্গী বিমান।

সামরিক সদর দপ্তরে বিপ্লবী কমিটির বৈঠক বসল। সবার মুখে এক প্রশ্ন—বৃটিশ কি হস্তক্ষেপ করবে? কিছুই বলা যায় না। মিশরের আভ্যন্তরীণ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করা ইংরাজের বহুদিনের অভ্যাস। নজিরের অভাব নেই। সুয়েজ খাল বরাবর বৃটিশ অবস্থান থেকে পাঁচ মাইল দূরে সাঁজোয়া, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ এবং ট্যাঙ্কবিধ্বংসী বাহিনী মোতায়েনের হুকুম দিলেন তারা। বৃটিশবাহিনী এগিয়ে এলে হয়ত তারা রুখতে পারবে না। কিন্তু তাদের অগ্রগতি কয়েক ঘণ্টার জন্য অবশ্যই থেমে যাবে। তখন

একসঙ্গে চলবে কূটনৈতিক তৎপরতা এবং সর্বাত্মক প্রতিরোধের প্রস্তুতি। বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সাব্রি রওনা হলেন বৃটিশ এবং মার্কিন দূতাবাসের উদ্দেশ্যে। আলি সাব্রি তখন বিমান বহরের গোয়েন্দা দপ্তরের কর্ত্তা। তিনি মার্কিন দূতাবাসের বিমান-দপ্তরের অফিসার লেঃ কর্ণেল এল ইভানসকে ঘুম থেকে জাগালেন। তাঁকে বললেন—সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান এবং ক্ষমতা দখল মিশরের আভ্যন্তরীণ ঘটনা। বিদেশীদের ধন-প্রাণ এবং মান-মর্যাদা বিপন্ন হবার কোন আশঙ্কা নেই। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার রালফ্ ষ্টিভেনসন লণ্ডনে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। বৃটিশ চার্জ জি এ্যাফেরার্সকে সব কথা খুলে বলার জন্য ইভানস্‌কে অনুরোধ করলেন সাব্রি।

জাকারিয়া মহীউদ্দিন সৈন্যদের ক'টি দল পাঠিয়েছিলেন প্রধান প্রধান সামরিক অফিসারদের বাড়ীতে। তারা পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করছিল তাদের। সদর দপ্তরে বন্দী হয়েছিলেন চীফ অফ স্টাফ জেনারেল ফরিদ, পুলিশের বড় কর্ত্তা জেনারেল আমেদ তালাত, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডারসেক্রেটারী জেনারেল মোনসেফ মামুদ, পুলিশের রাজনৈতিক দপ্তরের অধিকর্ত্তা মেজর জেনারেল মহম্মদ ইমাম, সাঁজোয়া বাহিনীর নায়ক ব্রিগেডিয়ার হাসান হিশমত এবং আরও অনেকে। বাইরের থেকে দলে দলে বন্দীরা আসতে লাগল সদরদপ্তরে। তাদের পাঠান হল আব্বাসিয়ার সামরিক ব্যারাকে।

রাত্রি সাড়ে তিনটে। নাগিবের টেলিফোন বেজে উঠল। একজন ফ্রী অফিসার তাকে বলল—ক্ষমতা দখল সম্পূর্ণ। তাঁকে (নাগিবকে) সামরিক সদর দপ্তরে নিয়ে আসার জন্য একটি সাঁজোয়া গাড়ী পাঠান হয়েছে। সামরিক গাড়ীতে নাগিব আসবেন না। তিনি নিজের গাড়ীতে আসার জন্য জিদ ধরলেন। ফ্রী অফিসারদের ভাল লাগল না। বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। এখন এত সতর্কতার কি

দরকার? আত্মপ্রকাশের আগে নাগিব হয়ত নিজের চোখে কায়রোর অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন। অথবা টেলিফোনটা শত্রু পক্ষের ফাঁদ কিনা তাও হয়ত একবার পরখ করার প্রয়োজনবোধ করেছিলেন।

নাগিব তাঁর নিজের গাড়ীতে রওনা হলেন। সঙ্গে ড্রাইভার ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। কিছুদূর গিয়েই দেখলেন এক ঝাঁক সাঁজোয়া গাড়ী এগিয়ে আসছে। একজন ফ্রী অফিসার তাঁকে একটি জীপে তুললেন। তারপর তাঁরা সদর দপ্তরের দিকে ছুটলেন! সদর দপ্তরে পৌঁছেই তিনি দেখলেন—নাসেরকে ঘিরে বসে রয়েছেন বিপ্লবী কমিটির সদস্যরা। নাগিবকে তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি খুশী। সবার সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। নাসের বললেন—বিপ্লবী কমিটির সিদ্ধান্ত, মিশরীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল মহম্মদ নাগিব বে। নাগিব সেই মুহূর্তেই দায়িত্ব বুঝে নিলেন।

২৩শে জুলাই সকাল ৬টা। সাদাত ভয়ানক ব্যস্ত! তিনি একটি ইস্তাহার রচনা করছিলেন। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকলেন গামাল নাজিমকে। তাকে পাঠালেন সংবাদপত্রগুলোর দপ্তরে বিপ্লবীদের ইস্তাহার প্রকাশের জন্য। আবদুল হাকিম আমের তৈরী করছিলেন আর একটি ঘোষণা। এমন সময় সংবাদ এল, সালেম এবং তাঁর ভাই রাফা এবং সিনাইর সৈন্যাবাস দখল করেছেন।

সকাল ৭টা। আনোয়ার সাদাত চললেন বেতারকেন্দ্রে। হাতে তাঁর আমেরের তৈরী ঘোষণা পত্র। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে পড়লেন সাদাত—ভাই সব! আপনারা জানেন, আমাদের দেশ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বিশ্বাসঘাতকের দল মাথা তুলেছে। এরা ভেবেছিল, সৈন্যবাহিনীতে দেশপ্রেমিক নেই। তাই তারা সৈন্যবাহিনীকে দলে টানার দুঃসাহস করেছিল।

আমরা আত্মশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিশ্বাসঘাতক এবং দুর্বলচিত্তদের সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। মিশরের ইতিহাসে একটি নূতন এবং গৌরবজনক অধ্যায় আমরা সংযোজন করতে যাচ্ছি।

যারা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত তারা কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। শৃঙ্খলা রক্ষায় সৈন্যবাহিনী পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

যেসব বিদেশী ভাই আমাদের মধ্যে বসবাস করছেন তাদের স্বার্থ বিপন্ন হবে না। সৈন্যবাহিনী তাদের ধনপ্রাণ রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন।

আনোয়ার সাদাত সদর দপ্তরে ফিরে এলেন। একজন বিঘোষক আধঘণ্টা পরপর মিশরীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতির নামে বারবার পড়তে লাগলেন এই ঘোষণা-পত্র।

মিশরের নরনারী চমকে উঠল। তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। বেতার সেটের আওয়াজ তারা চড়িয়ে দিল। বাজছে সামরিক সঙ্গীত এবং মার্চের বাজনা। মাঝে মাঝে নাগিবের ঘোষণা। বুঝতে বাকী রইল না—প্রভাতের সূর্য জাতীয় জাগরণের শুভ ইঙ্গিত নিয়ে আজ আকাশে উঠেছে। অধীর আনন্দে জনতা বাইরে ছুটে এল। দেখল, আকাশে জঙ্গী বিমানগুলো ডিগবাজী খাচ্ছে। বাড়ীগুলোর ছাদ ছুঁয়ে তারা আবার শূন্যে উড়ে যাচ্ছে। বাইরে কোলাহল। রাস্তায় উৎসাহীদের উদ্দাম নৃত্য। বাতাসে ভেসে আসছে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজ—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। এতদিন তারা যা চেয়েছিল সৈন্যবাহিনী তাই করেছে। জনতার বিপ্লব তারা নিজেদের হাতে নিয়েছে। মিশরীয় বাহিনী জনমানসের প্রতিনিধি।

আলেকজান্দ্রিয়ায় মোনতাজহ প্রাসাদে বাদশা ফারুকের তন্দ্রা টুটেছে। তিনি তাঁর প্রধান সেনাপতি হায়দারকে ডেকে পাঠালেন।

হায়দার ছুটে এলেন। কিছুই তাঁর বলার নেই। প্রাসাদচক্রীরা আত্মগোপনের পথ খুঁজছে। অভিজাত ঘরের মহিলারা গালে হাত দিয়ে ভাবছেন। ব্রেকফাস্টে তাদের রুচি নেই। মনে তখনও আশা—সব ঠিক হয়ে যাবে। ছোটলোকদের শাসন কায়েম হলে বেঁচে থাকা অর্থহীন।

সকাল ৯টা। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ফোন এল। হায়দার কথা বলতে চান নাগিবের সঙ্গে। নাগিব রিসিভার ধরলেন। হায়দার জানতে চাইলেন—কি ঘটছে ? গোপনতার প্রয়োজন নেই। বিপ্লবের দুটি পর্যায় শেষ। নাগিব তাকে খোলাখুলি বললেন—ফ্রী অফিসাররা ক্ষমতা দখল করেছে। প্রশাসনের প্রত্যেকটি শাখায় চালাবে তারা শোধনের কাজ। দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। হঠাৎ লাইন কেটে গেল। হায়দার টেলিফোনের রিসিভার ছেড়ে দিয়েছেন।

দশ মিনিট পর আবার হায়দারারের টেলিফোন। এবার তাঁর কণ্ঠ পরিষ্কার। সৈন্যেরা ব্যারাকে ফিরে গেলে বাদশা তাদের ক্ষমা করবেন। আর নাগিব হবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। নাগিব হেসে উত্তর দিলেন—প্রস্তাবটি তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। এখন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাচ্ছে না।

সকাল সাড়ে ন'টা। বিপ্লবী কমিটির বৈঠক বসেছে। অবিলম্বে একটি সরকার গঠন দরকার। বাদশা ফারুক আইনত রাষ্ট্রপ্রধান এবং হিলালী তাঁর প্রধানমন্ত্রী। বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা বিপ্লবের কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রয়োজন। তা না হলে জটিলতা বাড়বে। বৃটিশবাহিনী হয়ত হস্তক্ষেপ করবে। আলি মাহের উপযুক্ত ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হবে। তিনি রাজী না হলে অন্যত্র সন্ধান চলবে। সাদাত চিনতেন আলি মাহেরকে। কিন্তু তাঁর বাড়ীর ঠিকানা কারও জানা নেই। আবদুল কুদ্দুস নামে একজন সাংবাদিক সামরিক সদর দপ্তরে এসেছিলেন।

তিনি আলি মাহেরের ঠিকানা জানতেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাদাত। বিপ্লবী কমিটি পরিণত হল "**বিপ্লবী পরিষদে।**" এই পরিষদ হবে মিশরের সর্বময় কর্তা। তাদের নির্দ্দেশে কাজ চালাবেন মন্ত্রীসভা।

ফারুকের হাতে ছিল তেরটি বিমান। যুদ্ধের সময় মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁকে এগুলো উপহার দিয়েছিলেন। বাদশার প্রধান পাইলট হাসান্ আকেফ গোপনে এলেন আলমাজা বিমানঘাঁটিতে। ফারুক্ সপরিবারে পালাবেন। তার প্রস্তুতির জন্যই হাসান আকেফকে 'পাঠান হয়েছিল। প্রহরীরা তাকে ঢুকতে দিল না। তিনি ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সদর দপ্তরে হাজির হলেন রানী নরীম্যানের কাকা মুস্তাফা সাদেক। বাদশা এবং রানীর জন্য তিনি নাগিবের কাছে চাইলেন একখানি বিমান। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হল না।

আলি মাহেরের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলেন সাদাত। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে রাজী। কিন্তু একটি সর্তে বাদশা ফারুককে দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তাঁকে আহ্বান জানাতে হবে। আলি মাহের ঝানু রাজনৈতিক নেতা। সাংবিধানিক রীতিনীতি তিনি জানেন। বিপ্লবী কাউন্সিল ফারুককে গদীচ্যুত করেন নি। তিনি তখন পর্যন্ত আইনত রাষ্ট্রপ্রধান। হিলালীর মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় নি। এ অবস্থায় পুরানো মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের নির্দ্দেশ দিতে পারেন শুধু বাদশা ফারুক। ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই ফারুককে গ্রেপ্তার করে প্রথম ঘোষণাতেই যদি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটানো হত তবে এসব খুঁটিনাটি প্রশ্ন আসত না। বর্ত্তমান অবস্থায় এই পদ্ধতির মধ্য দিয়া না গেলে বিপ্লবী সরকারের বৈধতা সম্পর্কেই হয়ত প্রশ্ন উঠবে। বিপ্লবী পরিষদ শুনলেন সব কথা। তারা আলি মাহেরের সর্ত মেনে নিলেন।

বাদশা ফারুক নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তবে আসল কথাটি তাঁর

মাথায় তখনও ঢোকে নি। তিনি মনে করলেন, ফ্রী অফিসাররা ক্ষমতা লিপ্সু। গদী পেলেই তারা খুশী হবে। তাঁর তক্‌ত-তউস নিয়ে টানাটানি করবে না। তিনি খবর পাঠালেন, ফ্রী অফিসাররা যদি নিজেরাই মন্ত্রীসভা গঠন করতে চায় তবে তারা বাদশার অনুমোদন পাবে। কোন ফল হল না। ফারুক বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তিনি বৃটিশের সাহায্য চাইলেন। দলবল সহ তাঁকে মিশরের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য স্থানীয় বৃটিশ কম্যাণ্ডার জেনারেল উইলিয়ম শ্লিমের কাছে তিনি আবেদন জানালেন। মার্কিন দূতাবাসও ফারুকের আর্তির চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। রাষ্ট্রদূত কাফেরী তাঁকে জানিয়ে দিলেন, মার্কিন সরকার মিশরের আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলে হস্তক্ষেপে নারাজ। তবে বাদশা এবং তাঁর পরিবারবর্গের নিরাপত্তার ভার তাঁরা নেবেন। মোনতাজহ প্রাসাদ থেকে বেতারে বৃটিশ এবং মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন ফারুক। সেগুলো যথারীতি ধরা পড়ছিল কায়রোর সামরিক সদর দপ্তরের বেতার প্রাপকযন্ত্রে। ফারুক দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তিনি বৃটিশ-বাহিনীকে কায়রো দখল করতে আহ্বান জানালেন। আলেকজান্দ্রিয়ার উপর গোলা বর্ষণের জন্য বৃটিশ নৌবহরের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এন্থনী ইডেন কায়রোর বৃটিশ দূতাবাস থেকে সব কিছু জানলেন। তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মিশরের আভ্যন্তরীণ সমস্যায় হস্তক্ষেপে রাজী নন। ফারুকের আবেদন ব্যর্থ হল। বাদশা নিয়তির হাতে নিজকে ছেড়ে দিলেন।

বেলা ১১টা। সাদাত বেতার কেন্দ্রে গেলেন। পড়লেন নাগিবের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র। এটা ছিল প্রথম ঘোষণা পত্রের প্রায় অনুরূপ। বিপ্লবী পরিষদের জনাকয় সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে নাগিব বেরুলেন সহর পরিক্রমায়। তাদের রক্ষী হিসাবে চলল তিনটি সাঁজোয়া গাড়ী। গোটা সহর আনন্দ উচ্ছল। কোথাও বিশৃঙ্খলা

নেই। সৈন্যেরা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। দোকানপাট সব খোলা। জনতা বুঝেছে—বিপ্লবের নেতা নাগিব। তাঁরা নামেই চলছে বেতার ঘোষণা। যেখানেই তিনি যাচ্ছেন সেখানেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাকে অভিনন্দ জানাচ্ছে। জনতার বিশ্বাস —নাগিব মিশরের মুক্তিদাতা। সদর দপ্তরে ফিরে এসেই তারা শুনলেন। ফারুক হিলালী মন্ত্রীসভা বতিল করেছেন। নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আলি মাহেরকে আহ্বান জানাতে তিনি রাজী হয়েছেন।

বেলা ৩টা। নাগিব এবং বিপ্লবী পরিষদের জনা পাঁচেক সদস্য গেলেন আলি মাহেরের বাড়ীতে। তাঁকে বললেন—প্রধান সেনাপতি হায়দারকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থানে নাগিবকে নিযুক্ত করতে হবে। বিপ্লবী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসনিক কাজ চলবে। প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র দপ্তর আলি মাহেরর হাতে থাকবে। বিপ্লবী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি অন্যান্য মন্ত্রী মনোনয়ন করতে পারবেন। সবক্ষেত্রে দ্রুত সংস্কারের পরিকল্পনা নিতে হবে। এসব সর্তে যদি আলি মাহের রাজী থাকেন তবে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য বিপ্লবী পরিষদ তাঁর নাম সুপারিশ করবেন। আলি মাহের গররাজী ছিলেন না। ঠিক হল, পরদিন সকালে তিনি কায়রো যাবেন। ফারুক বিপ্লবী পরিষদের সর্তাবলীতে সম্মতি দিলেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবেন।

বার

২৪-শে জুলাই। সকালে আলি মাহের আলেকজান্দ্রিয়ায় রওনা হলেন। প্রাসাদচক্রীদের উপর সবাই চটা। তাদের সায়েস্তা করার জন্য বিপ্লবী পরিষদ উদ্‌গ্রীব। যারা স্টেশনে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন তারা খোলাখুলি কথাটা বললেন।

আলি মাহের তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রধানমন্ত্রী হবার পরই তাঁর প্রথম কাজ হবে প্রাসাদচক্রীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলা এবং দুর্নীতির মূল উচ্ছেদ করা।

স্বার্থান্বেষীরা প্রচার চালাতে লাগল—সেনানায়করা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ধর্মনিরপেক্ষ রিপাব্লিকান মিশর তৈরী করতে যাচ্ছেন। তারা ইসলাম বিপন্নের জিগির তুলল। মসজিদে-মসজিদে সভা চলল। আবার একদল ফারুকের মাথা চাই বলে আওয়াজ উঠল। ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা রাতারাতি ফ্রী অফিসার ব্যাজ বাজারে ছাড়ল। দু'হাতে পয়সা কামাতে লাগল তারা। তরুণদের বুকে ফ্রী অফিসার ব্যাজ মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। সৈন্যবাহিনীতে সুযোগ সন্ধানীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফ্রী অফিসার সাজার ধুম পড়ে গেল। সার্থক বিপ্লবের জন্য তাদের আত্মত্যাগের চমকপ্রদ কাহিনী সবাই জেনে ফেলল। যারা ছিল ফারুকের একান্ত অনুগত, হাওয়া-বদলের সঙ্গে সঙ্গে তারাই বাদশার মাথার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করল। আনন্দের আতিশয্যে চোরাই কারবারীরা তাদের বাড়ীতে দানছত্র খুলে দিল। বিপ্লবী পরিষদ জানতেন—মিশরে মোল্লাদের অসীম প্রভাব। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তাদের পক্ষে সহজ। বিকেলে নাগিব বেতার কেন্দ্রে গেলেন। আবার পড়লেন বিপ্লবী ঘোষণা-পত্র।

আলেকজান্দ্রিয়ায় মোনতাজহ প্রাসাদ শোকমগ্ন। মার্কিন দূতাবাস বাদশার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু ফারুক ভরসা পাচ্ছেন না। বৃটিশ হস্তক্ষেপে অসম্মত। রাস্তায় সৈন্য এবং পুলিশবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রাসাদের উপর বিপ্লবীরা কড়া নজর রেখেছে। উপকূল দরিয়ায় নৌবহর ঘোরাফেরা করছে। আকাশে জঙ্গী বিমান উড়ছে। প্রাসাদ থেকে বেরুবার সব পথ বন্ধ। ফারুক ঝিমুচ্ছেন। একটির পর একটি মদের গ্লাস নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। শিশু রাজকুমার ফুয়াদকে বুকে চেপে ধরে

বসে আছেন রানী নরীম্যান। দু'চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। প্রাসাদচক্রীরা ভীত। পালাবার পথ নেই। আর পালিয়েই বা তারা যাবে কোথায় ?

কায়রোতে সামরিক সদর দপ্তরে বসেছে বিপ্লবী পরিষদের বৈঠক। বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায়শেষ করতে হবে। এ পর্যায়—বাদশা ফারুকের সিংহাসনচ্যুতি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলল! রাত্রি বারোটায় তারা সিদ্ধান্ত নিলেন—জাকারিয়া মহীউদ্দিন এবং অপর দু'জন অফিসার যাবেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। আলি মাহেরের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা মোনতাজহ প্রাসাদ অথবা রাস-এল-টিন প্রাসাদ কিম্বা দুটি প্রাসাদই অবরোধ করবেন। ছাব্বিশটি ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ী, একটি গোলন্দাজ বাহিনী এবং এক ব্যাটেলিয়ান মোটরবাহী পদাতিক আলেকজান্দ্রিয়ায় যাবে। প্রয়োজনবোধে ২৭শে জুলাই বিকেল ৫টায় তার প্রাসাদের উপর আক্রমণ চালাবে। উপকূল দরিয়ায় নৌবহর এবং আকাশে জঙ্গীবিমান পাহারা দেবে। প্রাসাদ অবরোধের পর বাদশার হাতে দেওয়া হবে বিপ্লবী পরিষদের চরম-পত্র। আক্রমণের সূচনা হবে কি হবে না তা নির্ভর করবে ফারুকের জবাবের উপর।

২৫শে জুলাই। নাগিব বিমানে চলে গেছেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। তিনি রয়েছেন মুস্তাফা সৈন্যবাসে। বিপ্লবী পরিয়দের অর্দ্ধেক সদস্য যোগ দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে। বাকী সবাই অবস্থান করছেন কায়রোর সদর দপ্তরে। নাসের চিন্তিত। বিকেল ৫টায় ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করার কথা। প্রায় বিনা রক্তপাতে বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছে। বাদশাকে তাড়াবার জন্য রক্তপাত ঘটবে কিনা কে জানে।

দুপুরের পর নাগিব বিপ্লবী পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। জাকারিয়া মহীউদ্দিন গোঁ ধরলেন।

ফারুকের সিংহাসনচ্যুতি স্থগিত রাখতে হবে। পরের দিন সকাল ৫টায় তিনি প্রাসাদ ঘেরাও করার হুকুম দেবেন। তার সৈন্যদল পরিশ্রান্ত। দু'রাত্রি তারা ঘুমোয় নি। কতকগুলো ট্যাঙ্ক এখনও এসে পৌছায় নি। যদি শেষপর্যন্ত প্রাসাদরক্ষীদের সঙ্গে লড়াইএ নামতে হয় তবে সৈন্যদের অন্ততঃ একরাত্রি বিশ্রাম দরকার। সাদাত তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জাকারিয়া মহীউদ্দিন অনড়। অবশেষে ২৬শে জুলাই সকাল ৫টা পর্যন্ত প্রাসাদ অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বিপ্লবী পরিষদের একজন সদস্য বিমানে ছুটলেন কায়রোতে। যথাসময়ে ফারুকের সিংহাসনচ্যুতির খবর না পেলে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়বেন। অভিযান স্থগিতের সংবাদ তাদের আগেই জানানো দরকার।

ফারুক পালিয়েছেন। একটি ক্যাডিল্যাক প্রচণ্ডবেগে মোনতাজহ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেছে। গাড়ী চালাচ্ছিছেন বাদশা নিজে। বিপ্লবী পরিষদের গোয়েন্দারা জীপে তাঁর পিছু নিয়েছিল। ক্যাডিল্যাকের গতির সঙ্গে তারা তাল রাখতে পারেনি। ফারুক অদৃশ্য হয়েছেন। প্রাসাদচক্রীরা হয়ত তাঁকে বুঝিয়েছিল, আত্মগোপন করলেই বৃটিশ তাঁর পক্ষে হস্তক্ষেপ করবে। সাদাত গিয়েছিলেন বাকেলির সরকারী ভবনে আলি মাহেরের সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকেই তিনি শুনে এসেছেন ফারুকের পলায়নের সংবাদ। প্রাসাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলি মাহেরের গত ১২ ঘণ্টার মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। চারদিকে সন্ধান চলল।

রাত্রি ৯টা মুস্তাফা সৈন্যাবাসে বৈঠক বসল। সিংহাসনচ্যুতির পর ফারুককে নিয়ে কি করা হবে? নির্বাসন, না কুচক্রীদল সহ তাঁর প্রাণদণ্ড? সালেম উত্তেজিত ভাবে বললেন—বিচার করতে হবে। ভুলে যাবেন না, ফারুকের হাতে কত নিরপরাধী প্রাণ হারিয়েছে। ভুলে যাবেন না, ফারুক কত পরিবারের সর্বনাশ করেছে। ভুলে যাবেন না, ফারুক কত নারীর ইজ্জত ধূলোয়

মিশিয়ে দিয়েছে। ভুলে যাবেনা, প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে ফারুকের অস্ত্র-জালিয়াতি। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। বিচার এবং প্রাণদণ্ড তাঁর উপযুক্ত শাস্তি। নাগিব রাজী হলেন না। বিতর্ক চলল। রাত্রি বারটা বেজে গেছে। মাত্র পাঁচঘণ্টা বাকী। তারপর প্রাসাদ অভিযান। বিতর্কে কোন মীমাংসায় পৌছান যাবে না। একজন বললেন—'নাসেরের কি মত।' চূড়ান্ত কথা তিনিই বলবেন। সবার খেয়াল হল—বিপ্লবী পরিষদের অর্দ্ধেক সদস্য নিয়ে নাসের রয়েছেন কায়রোতে। তাঁর মত নেওয়া খুবই দরকার। সালেম একটি বিমান নিয়ে রওনা হলেন কায়রোর দিকে। অন্যান্য সবাই একটু ঘুমাবার চেষ্টা করলেন।

রাত্রি ৪টা ৩০ মিনিটে সালেম ফিরে এলেন। তাঁর হাতে নাসেরের বিবৃতি। তিনি চেঁচিয়ে পড়লেন—মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্যই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফারুককে সরানো দরকার। অন্যান্য জরুরী কাজ আমাদের হাতে রয়েছে। ফারুক দুর্নীতির বোঝা জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। মিশরকে দুর্নীতিমুক্ত করা অত্যাবশ্যক। আমরা নূতন যুগের সূচনা করব। জনসাধারণের মান, মর্যাদা এবং মৌল অধিকার কোনমতেই বিপন্ন করা চলবে না। ন্যায়বিচার অবশ্যই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু বিনাবিচারে ফারুককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলে না। তাঁকে জেলে পুরে রাখার ঝামেলা অনেক। বাদশার বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে অনেক সময় লাগবে। ফলে বিপ্লবের অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনে বিলম্ব ঘটবে। ফারুককে নির্বাসনে পাঠানাই যুক্তিযুক্ত। ইতিহাস তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

আর কোন কথা নেই। নাসেরের কথাই শেষ কথা। ফারুক প্রাণে বাঁচলেন। কপালে তাঁর নির্বাসন। সময় চলে যাচ্ছে। গোয়েন্দারা এসে খবর দিল—ফারুক সপরিবারে রাস-এল-টিন প্রাসাদে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়াবহর তৈরী

হয়ে আছে। মিশরীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নাগিব সকাল ৫ টায় মোনতাজহ এবং রাস-এল-টিন প্রাসাদ অবরোধের হুকুম দিলেন। প্রাসাদরক্ষীরা পজিসন নিয়ে দাঁড়াল। আত্মসমর্পণের জন্য বারবার অনুরোধ জানাল বিপ্লবীবাহিনী। কোন সাড়া মিলল না। এভাবে চলল প্রায় দু'ঘণ্টা। সকাল ৭টায় প্রাসাদ আক্রমণের নির্দ্দেশ দিলেন জাকারিয়া। লোক দেখান গুলি বিনিময় সুরু হল। তারপর প্রাসাদরক্ষীরা আত্মসমর্পণ করল। মোনতাজহ প্রাসাদে ঢুকে পড়ল বিপ্লবীবাহিনী। রাস-এল-টিন প্রাসাদেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। সামান্য ক'রাউণ্ড গুলি বিনিময়ের পর রক্ষীরা সেখানে বিপ্লবীদের পথ ছেড়ে দিল। ফারুক এ প্রাসাদেই ছিলেন। প্রত্যেকটি গুলির শব্দে তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড কেঁপে উঠছিল। ভাগ্যে কি আছে তা তিনি জানতেন না। তবু এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তাঁর অবশিষ্ট ছিল—মিশরে বাদশাহী শাসনের সমাপ্তি সম্পূর্ণ। হিসাব করে দেখা গেল—সামরিক অভ্যুত্থানের ক'দিনে মারা গেছে দু'জন এবং আহত আটজন।

সকাল ৮ টা। নাগিব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বাকেলির সরকারী ভবনে হাজির হলেন। সেখানে আছেন প্রধানমন্ত্রী আলি মাহের। তাঁর হাত দিয়ে ফারুককে চরমপত্র পাঠাবার কথা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দপ্তরে ছিলেন না। বাদশা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আলি মাহের ৯টার সময় ফিরলেন। তাঁকে কিছু বলার দরকার ছিল না। তিনি দেখেই এসেছিলেন, রাস-এল-টিন প্রসাদ বিপ্লবীদের দখলে। ফারুক সেখানে অন্তরীণ।

কাউন্সিল অফ স্টেট মিশরীয় সুপ্রীমকোর্ট। তার ভাইস—প্রেসিডেন্ট সুলেমন হাফেজ তৈরী করেছিলেন চরমপত্র। আলি মাহের পড়লেন পত্রের বয়ান—আপনি বারবার মিশরের সংবিধান ভেঙ্গেছেন। ফলে দেশের সর্বত্র দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন তোয়াক্কা আপনি রাখেন নি।

প্রশাসনিক বিচারের উপর তাদের কোন আস্থা নেই। নিরাপত্তা এবং মর্যাদাবোধও তারা হারিয়ে ফেলেছে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছে আপনি মিশরের সুনাম নষ্ট করেছেন। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে মিশরের পরাজয় ঘটেছে। এই পরাজয়ের মধ্যে ঘুষখোর এবং বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি রাজকীয় অনুকম্পার কথা ফুটে উঠেছে।

আমি, মিশরীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল মহম্মদ নাগিব বে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার পুত্র রাজকুমার আমেদ ফুয়াদের (দ্বিতীয়) অনুকূলে আপনার সিংহাসন ত্যাগের দাবী করছি। আপনি আজ দুপুর ১২টার মধ্যে গদী ছাড়বেন এবং বিকেল ৬টার আগে চিরদিনের জন্য মিশর ছেড়ে চলে যাবেন। যদি এই চরমপত্র অনুযায়ী কাজ করতে আপনি অসম্মত হন তবে তার ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে!

চরমপত্র ফারুকের হাতে দেবার জন্য আলি মাহের রাস-এল-টিন প্রাসাদে রওনা হলেন। হাফেজকে সঙ্গে নিয়ে নাগিব ফিরলেন মুস্তাফা সৈন্যাবাসে। প্রায় ১১টার সময় মার্কিন দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী যোশেফ পার্কস এলেন নাগিবের দপ্তরে। তিনি বললেন, মার্কিন সরকার মিশরের সামরিক অভ্যুত্থান আভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে মেনে নিতে রাজী। রাষ্ট্রদূত কাফেরী চান বাদশা এবং তাঁর পরিবার বর্গের নিরাপত্তার:প্রতিশ্রুতি। সসম্মানে তাঁদের দেশ ছেড়ে যাবার সুযোগ। নাগিব তাঁকে বলে দিলেন, বাদশা যদি কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হন তবে তিনি উপযুক্ত মর্যাদা সহ দেশ ছাড়তে পারবেন।

হাফেজ রচনা করে রেখেছিলেন ফারুকের সিংহাসন ত্যাগের দলিল। তার বয়ান ছিল—দেশের প্রগতি, মঙ্গল, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির এবং তার বর্তমান সঙ্কট মোচনে সাহায্যের জন্য জনগণের ইচ্ছা অনুসারে আমি, ফারুক ফুয়াদ (প্রথম) আমার পুত্র রাজকুমার ফুয়াদের (দ্বিতীয়) অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এই দলিল অনুযায়ী কাজ চালাবার দায়িত্ব মন্ত্রীসভার নেতা আলি মাহেরের উপর অর্পণ করছি। বিপ্লবী পরিষদের অনুমোদনক্রমে এ দলিল তৈরী হয়েছিল। বেলা প্রায় ১২টার সময় নাগিব এবং হাফেজ গেলেন বাকেলির সরকারী ভবনে। আলি মাহের তাঁদের বললেন—ফারুক চরমপত্রের সর্তাবলী মেনে নিয়েছেন। তিনি তাতে সাক্ষর দিয়েছেন। তবে কতকগুলো সর্ত আরোপ করেছেন—সিংহাসন ত্যাগের দলিলের ভাষা রাজমর্যাদাসূচক হতে হবে। তিনি রাজকীয় ইয়ট মহরৌসায় নেপল্‌স যাবেন। তিনি ইয়টে ওঠা মাত্রই ২১টি কামানের আওয়াজ তাঁকে স্যালুট জানাবে। নূতন রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁর দেশত্যাগের সময় উপস্থিত থাকবেন। ফারুকের বাদশাহী মেজাজে ভাটা পড়েনি। দর কষাকষির মত অবস্থা তাঁর নেই। তবু তাঁর সর্ত মানতে নাগিব রাজী হলেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত কাফেরী বাকেলির সরকারী ভবনে। আলি মাহের তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। হাফেজ চলে গেলেন রাস-এল-টিন প্রাসাদে।

ফারুক দলিলটি পড়লেন। তিনি "জনগণের ইচ্ছা অনুসারে" কথাগুলো কেটে দিতে চাইলেন। হাফেজ আপত্তি জানালেন। বাদশা হয়ত ভেবেছিলেন, বিদ্রোহী সেনানায়কেরা জোর করে তাঁকে দেশ ছাড়া করছেন। জনগণের ইচ্ছা সেখানে নেই। কিন্তু তিনি অসহায়। দলিলে সই করা ছাড়া উপায় নেই। তাঁর হাত কাঁপছে। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। ফারুক দলিলে সই দিলেন। হাত বশ মানছিল না। স্বাক্ষর অস্পষ্ট রয়ে গেল। তিনি দ্বিতীয়বার স্বাক্ষর করলেন। এবার খানিকটা স্পষ্ট।

বিকেল ৫টা। রানী নরীম্যানের মা আসিলা সাদেক, ফারুকের পাঁচ বোনের মধ্যে দু'জন—ফৈজা এবং ফবজিকা, এবং তাঁদের স্বামীরা প্রাসাদে ঢুকলেন। রক্ষীরা বাধা দিল

না। প্রধানমন্ত্রী আলি মাহের এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত কাফেরী যথাসময়ে প্রাসাদে পৌঁছলেন। সবাই গিয়েছিলেন বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। অদূরে সাগরের নীলজলে নোঙ্গর ফেলে অপেক্ষা করছে মহরৌসা। মিশরীয় নৌবহরের জাহাজগুলো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বিপ্লবী পরিষদ খবর পেয়েছিলেন, কিছু নৌ-অফিসার বেপরোয়া। তারা কিছুতেই ফারুককে প্রাণ নিয়ে দেশ ছাড়তে দেবেন না। তারা বাদশার দৌরাত্ম্যের প্রতিশোধ নিতে চান। ফারুকের রক্ত তাদের দরকার। যাতে কোন অঘটন না ঘটে তার জন্য ফ্রী অফিসারদের মধ্যে ক'জন যুদ্ধ জাহাজগুলোতে স্থান করে নিয়েছিল। তাঁরা উগ্রপন্থী নৌ-অফিসারদের উপর কড়া নজর রাখছিল।

প্রাসাদ থেকে প্রথমে বেরিয়ে এলেন রানী নরীম্যান। পরনে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পোষাক। একজন বৃটিশ-নার্সের কোলে রাজকুমার ফুয়াদ। সঙ্গে ফারুকের প্রাক্তন রানীর তিন মেয়ে—ফেরিয়াল, ফজিয়া এবং ফদিয়া। ভৃত্যেরা বয়ে নিয়ে চলেছিল ২০৪টি মোট বহর। সবার শেষে দেখা দিলেন ফারুক। এ্যাডমিরালের পোষাক পরেছিলেন তিনি। প্রাসাদ থেকে রাজকীয় পতাকা নামানো হল। যন্ত্রীরা জাতীয়সঙ্গীত বাজাতে লাগল। একটি বোটে উঠলেন বাদশা। মহরৌসার চারদিকে ক'বার চক্কর দিয়ে ওটা তার গা ঘেষে দাঁড়াল। ফারুক ইয়টে চড়লেন। নাগিবের পৌঁছতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। তিনি, গামাল সালেম এবং কয়েকজন অফিসার মহরৌসায় উঠলেন। ব্রীজের উপর অপেক্ষা করছিলেন ফারুক। এগিয়ে গেলেন নাগিব। মুখোমুখি হলেন দু'জন। কেউ কথা বলতে পারছেন না। জিব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সামলে নিয়ে নাগিব বললেন—আপনাকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। ফারুক একটু হেসে জবাব দিলেন—আপনি আমাকে ৬টার মধ্যে দেশ ছাড়তে

বলেছেন। আমি কথা রেখেছি। মহরৌসা নোঙ্গর তুলল। সঙ্গীদের নিয়ে নাগিব নেমে এলেন। পর পর একুশটি কামানের আওয়াজে বাদশাকে স্যালুট জানানো হল। প্রাসাদে দাস-দাসীদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। বাইরে জনপথে জনতার উল্লাস। ধীরে ধীরে চলছে ইয়ট। পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন ফারুক। অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেল মহরৌসা। বাতাসে ভেসে এল হাজার কণ্ঠের আওয়াজ—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

২৭শে জুলাই। বৃটিশ চার্জ দি এ্যাফেয়ারস ছুটে এলেন বাকেলির সরকারী ভবনে। তিনি পেশ করলেন তিনটি দাবী—বিদেশী নাগরিকদের রক্ষার জন্য কারফিউ জারী করতে হবে। রিজেন্সী কাউন্সিল গঠনে দেরী করা চলবে না। রাজতন্ত্র চালু রাখতে হবে।

সাদাত সাফ জবাব দিলেন—মিশর স্বাধীন। বিপ্লবী পরিষদ যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। অন্যের ফোপর-দালালীর দিন শেষ হয়ে গেছে। বৃটিশ চার্জ দি এ্যাফেয়ারস কোন কথা না বলে বিদায় নিলেন।

তেরো

দুদিন বিশ্রাম নিয়ে ফ্রী অফিসাররা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। বাদশা ফারুক নির্বাসিত। শিশু ফুয়াদ গেছেন তাঁর সঙ্গে। রাষ্ট্রপ্রধান এখন কে? তাছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ায় গোলন্দাজ বাহিনীতে একটা চাপা উত্তেজনা চলছিল। হঠাৎ গাজা থেকে সেখানে এসেছেন কর্ণেল মহম্মদ রসিদ মেহান্না। সামরিক অভ্যুত্থানের আগে তিনি গোপনে ট্র্যানসফার জোগাড় করে কায়রো থেকে কেটে পড়েছিলেন। তাঁর জন্যই বিপ্লব পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। তিনি

ছিলেন মুসলিম-ব্রাদারহুডের উগ্র সমর্থক। তাঁর প্রতি নাগিবের দুর্বলতা কারও অজানা ছিল না। ১৯৪৭ সালে মেহান্না (তখন গোলন্দাজ বাহিনীর মেজর) তখনকার চীফ অফ স্টাফ জেনারেল আতাল্লার দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বিপ্লবের ষড়যন্ত্রও আঁটছিলেন। জেনারেল আতাল্লার আদেশে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে যাবার ভয়ে তাঁর মামলা বেশী দূর গড়ায় নি। তিনি বেকুসুর খালাস পেয়েছিলেন। অতীতের বৈপ্লবিক কাহিনী ভাঙ্গিয়ে মেহান্না গোলন্দাজ সৈনিকদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়েছিলেন। তিনিই সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের আসল নায়ক। একটা বড় কিছু পদ তাঁর পাওনা। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কায়রোতে বসল বিপ্লবী পরিষদের বৈঠক।

তরুণ সদস্যরা দাবী জানালেন, আর দেরী নয়। এখনই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ দরকার। নাগিব তাতে রাজী নন। প্রধানমন্ত্রী আলি মাহেরেরও ঘোরতর আপত্তি। ঠিক হল, একটি কাউন্সিল অফ রিজেন্টস গঠিত হবে। রাজকুমার ফুয়াদের নামে তাঁরাই চালাবেন রাজকীয় দপ্তর। মেহান্না হবেন এই কাউন্সিলের সদস্য। কিন্তু! আইনের ফ্যাকড়া রয়ে গেছে। সংবিধান বাতিল হয়নি। সংবিধানে বলা আছে—রাজপরিবারের সদস্য এবং তাদের নিকট আত্মীয়, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, ডেপুটি এবং সিনেটের ছাড়া আর কেউ রিজেন্ট হতে পারবেন না। বাধ্য হয়ে মেহান্নাকে করতে হল যোগাযোগ মন্ত্রী। অপর দু'জন রিজেন্ট, বাহী দীন বরাকত এবং প্রিন্স মহম্মদ আবদুল মোনেইম যোগ দিলেন তাঁর সহকর্মী হিসাবে। ভূমি-সংস্কার সবার আগে দরকার। মিশরের জনসংখ্যার অধিকাংশ চাষী। আবাদী জমিগুলো হাজার দেড়েক ছোট বড় জমিদারের হাতে। বিপ্লবী পরিষদ জমির মালিকানার উর্ধ্ব সীমা দু'শ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী। প্রধানমন্ত্রী আলি মাহের পাঁচশ একর করতে চান। বেশ

কিছুদিন চলল টানাহেঁচড়া। অধৈর্য হল তারা। এক হুকুম জারী করে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা দু'শ একর নির্দিষ্ট করে দিলেন। চটে গেলেন আলি মাহের। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদায় দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। উদ্বৃত্ত জমি সামান্য ক্ষতিপূরণে সরকার দখল করলেন। অল্প দামে সেগুলো বিলি হল চাষীদের মধ্যে। জমির খাজনাও কমে গেল। সমবায় পদ্ধতিতে জমি চাষের জন্য প্রচার চলল। মিশরের ভূমিহীন চাষীরা জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ। মাত্র দেড়লক্ষ চাষী ভূমি-সংস্কারে কিছুটা উপকৃত হল। অধিকাংশের ভাগ্যে ছিটেফোটাও জুটল না। ওয়াফদ দলের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়লেও গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রভাব কমেনি। এ দলের নেতারা জমিদার। তাদের স্বার্থে সামান্য আঘাত পড়েছে। ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কমিউনিস্টরা এ সংস্কার ভাল চোখে দেখল না। তারা চায় আমূল পরিবর্তন। মুসলিম-ব্রাদার-হুড ধর্মান্ধ। সামাজিক সংস্কার তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম বিরোধী। তারাও নূতন শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। দক্ষিণ, বাম এবং মোল্লা-তন্ত্রীদের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি এসে পড়লেন বিপ্লবী পরিষদ।

মিশরে যে বিপ্লব এসেছে কমিউনিস্টরা মনে করল, ওটা বুর্জোয়া বিপ্লব। এ বিপ্লবের নায়কদের ঘর গুছিয়ে নেবার আগেই আঘাত হানা দরকার। আগস্ট মাসে আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে একটি মিশরীয় কাপড়ের কারখানায় শ্রমিকরা হাঙ্গামা বাধাল। তারা কারখানা দখল করল। পুলিশ এবং সৈন্যদলের সঙ্গে হাঙ্গামকারীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হল। একদল পুলিশ, দুজন সৈন্য সহ ন'জন মারা গেল। সামরিক আদালত ওদের নেতা মুস্তাফা খামিস এবং মহম্মদ হাসান এল'কে সামরিক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। নাসের আপত্তি জানালেন। কিন্তু তিনি ভোটে হেরে গেলেন।

আর একটি ঘটনা ঘটল উত্তর মিশরে মিনিয়ার কাছে মাঘাঘা গ্রামে। ওটা ছিল আদলি ল্যামলুমের জমিদারী। তিনি একদিন

ত্রিশজন অশ্বারোহী বেতুইন নিয়ে গ্রামে হানা দিলেন। একটি খোলা জায়গায় গ্রামবাসীদের জমায়েত করে তাদের বলে গেলেন— মাঘাঘায় কোন ভূমি-সংস্কার চলবে না। যারা ল্যামুমদের উদ্বৃত্ত জমি কিনবে তাদের জান নেওয়া হবে। চাষীরা সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ল। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তুদিন পর মাঘাঘা গ্রামে জমি বিলি বন্দোবস্তের কথা। সরকারী কর্মীরা খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ সেখানে একদল সশস্ত্র বেতুইন নিয়ে হাজির হলেন আদলি ল্যামলুম। পুলিশ এবং সৈন্যদল তাদের বাধা দিল। কয়েক রাউণ্ড গুলি বিনিময়ের পর আদলি এবং তার পাঁচজন বরকন্দাজ আত্মসমর্পণ করল। বাকী সবাই চম্পট দিল। সামরিক আদালতের বিচারে ল্যামলুম আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিপ্লবী পরিষদের কড়া ব্যবস্থায় আর কেউ মাথা তুলতে সাহস পেল না।

ফ্যাসাদে ফেললেন মহম্মদ রসিদ মেহান্না। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের উগ্র সমর্থক এবং রিজেন্সী কাউন্সিলের সদস্য। বিপ্লবী পরিষদের কোন নির্দ্দেশ মানতে তিনি রাজী নন। গোড়া মোল্লাতন্ত্রীরা, তার উৎসাহ পেয়ে সংখ্যালঘুদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে লাগল। অন্য ধর্মসম্প্রদায়গুলোকে তারা জিম্মির পর্যায়ে ফেলার প্রচার সুরু করল। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও মেহান্নার সম্বিত ফিরল না। বাধ্য হয়ে বিপ্লবী পরিষদ তাঁকে পদচ্যুত করলেন এবং গৃহবন্দী করে রাখলেন। নাগিবের হস্তক্ষেপে তিনি ছাড়া পেলেন। রিজেন্সী কাউন্সিলের অপর সদস্য বাহী এদ দীন বরকতও পদত্যাগ করলেন। আবতুল মোনেইম একা রিজেন্টের পদে রইলেন। ছাড়া পেয়েই মেহান্না স্ব-মূর্ত্তি ধরলেন। তিনি আরও জনাকয়েক সঙ্গী নিয়ে প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্র আঁটলেন। শীঘ্রই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। সামরিক আদালত তাঁকে আজীবন কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন।

সংবাদ পাওয়া গেল, পশ্চিম মরুভূমির গবর্ণর লেঃ কর্ণেল মহম্মদ হুসনি এল দামানছুরি বিপ্লবী সরকার উচ্ছেদের পাঁয়তারা কষছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাজির করা হল সামরিক আদালতে। তিনি পেলেন প্রাণদণ্ড। পরে দণ্ড কমিয়ে তাঁকে আজীবন কারাদণ্ডের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মিশরের সাধারণ জীবনযাত্রা এখন স্বাভাবিক। নাগিব প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি। ফ্রী অফিসারদের সামনে কঠিন সমস্যা। তাঁরা দেশ শাসন করবেন, না ব্যারাকে ফিরে যাবেন। নাগিব তাঁদের ব্যারাকে ফেরত পাঠাবার পক্ষপাতী। কিন্তু বিপ্লবী পরিষদ গররাজী। ফ্রী অফিসারদের ব্যারাকে ফিরলেই হবে সাধারণ নির্বাচন। ওয়াফদ দল শক্তিশালী। ওদের টাকার অভাব নেই। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে তাদের বেগ পেতে হবে না। সামরিক অভ্যুত্থানের সময় নাহাস পাশা এবং তাঁর দলের সেক্রেটারী ফুয়াদ সেরাগ এদ দীন ছিলেন প্যারিসে। তাঁরা ফিরে এসেই নির্বাচন দাবী করলেন। নাগিবের জনপ্রিয়তা তখন উত্তুঙ্গে। ন সের মিশর পরিক্রমায় পাঠালেন নাগিবকে। জনতা তাঁকে স্বাগত জানাল। তাদের চোখে তিনি মিশরের মুক্তিদাতা। ওয়াফদ দলের প্রভাবাধীন অঞ্চলে নাগিব-সম্বর্দ্ধনার জোয়ার বয়ে গেল। নাহাস পাশা বিব্রতবোধ করতে লাগলেন। অবস্থার সুযোগ নিলেন বিপ্লবী পরিষদ। তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে বেআইনী ঘোষণা করলেন। কেবলমাত্র রেহাই পেল মুসলিম ব্রাদারহুড। কারণ সৈন্যবাহিনীতে এবং বিপ্লবী পরিষদে এ সংস্থার প্রভাবশালী সমর্থকের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। বিপ্লবী পরিষদ কতকগুলো কমিটিতে ভাগ হয়ে গেল। এরাই নিলেন এক একটি দপ্তর পরিচালনার ভার। দুর্নীতির দায়ে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার সুরু হল। তাঁদের বিচার করতে লাগলেন সামরিক আদালত। বৃটিশের সঙ্গে

সহযোগিতার অপরাধে ৪ জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবদুল হাদী প্রথমে পেলেন প্রাণদণ্ড। পরে তা কমিয়ে তাঁকে দেওয়া হল আজীবন কারাবাসের হুকুম। নাহাস পাশা দুর্নীতির অপরাধে তিরস্কৃত হলেন। সেরাগ এদ দীনের ভাগ্যে জুটল দীর্ঘ কারাবাস। আলেকজান্দ্রিয়ার তুলোর ব্যবসায়ে জালিয়াতির দায়ে শ্রীমতী পাশা ধিকৃত হলেন এবং তার সম্পত্তি সরকার দখল করলেন। প্রাসাদচক্রীদল সহ ৩১ জন পেলেন বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। এদের মধ্যে ছিলেন চার সাংবাদিক। তারা বিদেশীদের টাকা খেয়ে সংবাদপত্রে বিকৃত খবর প্রকাশ করত।

ইতিমধ্যে বিপ্লবী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—ফ্রী অফিসাররা ব্যারাকে ফিরবেন না। তাঁরা প্রশাসনে যোগ দেবেন। স্থায়ী সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত মিশরে থাকবে একদলীয় শাসন। ১৯৫৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী এক জনসভায় নাগিব "জাতীয় মুক্তি সম্মেলন"এর আবির্ভাব ঘোষণা করলেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী তার আর এক ঘোষণায় মিশরে চালু হল অস্থায়ী সংবিধান। এই সংবিধান অনুযায়ী বিপ্লবী পরিষদ পরিচালনা করবেন অন্তরবর্তীকালীন শাসন। বিপ্লবের নেতা (নাগিব) নিজের হাতে নেবেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব। প্রকৃত প্রস্তাবে নাগিব হলেন মিশরের ডিক্টেটর। তাঁর ক্ষমতার রাশ টানার জন্য পিছনে রইলেন বিপ্লবী পরিষদ এবং তার নেতা নাসের।

নাগিব এখন নিশ্চিন্ত। জনপ্রিয়তায় তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন এমন নেতা তখন মিশরে নেই। মোল্লাতন্ত্রীরা মাঝে মাঝে ঝামেলা সৃষ্টি করছে। মুসলিম ব্রাদারহুডকে বাগে আনা যাচ্ছে না। কিন্তু সঙ্কটের কোন সম্ভাবনা নেই। সপরিবারে তিনি গেলেন মক্কায় হজ করতে। এবার তাঁর দ্বিতীয় হজ। নাগিব পন্থীরা বললেন—ইসলামে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। আর প্রতিপক্ষ বুঝলেন,

মোল্লাতন্ত্রীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রস্তুতির জন্যই তাঁর এই মক্কাযাত্রা!

বিপ্লবী পরিষদ অস্বস্তিবোধ করছেন। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ দরকার। কিন্তু নাগিব এত তাড়াতাড়ি রাজতন্ত্র খতমে সম্মতি দিচ্ছেন না। তাঁর যুক্তি, মিশর রিপাব্লিকের জন্য তৈরী নয়। শেষ পর্যন্ত সংখ্যাধিক্যের মত তাঁকে মানতে হল। ১৯৫৩ সালের ১৮ই জুন তিনি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ~~বিজেন্সীর~~ অবসান ঘটল। মিশর হল রিপাব্লিক। প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী, দুটি পদেরই তিনি দাবীদার। বিপ্লবী পরিষদ উপায়হীন। নাগিব অপরিহার্য। জনতা তাঁকে চেনে। তিনি বিরূপ হলে হয়ত তারা ক্ষেপে উঠবে। সুতরাং নাগিব হলেন প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী। সমস্যা দেখা দিল মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে। অস্থায়ী সংবিধান অনুযায়ী বিপ্লবী পরিষদের শাসন পরিচালনার কথা। কিন্তু নাগিবের ইচ্ছা, ফ্রী অফিসাররা স্বেচ্ছায় ব্যারাকে ফিরে যাবেন। তিনি অসামরিক মন্ত্রীসভা নিয়ে দেশ শাসন করবেন। মুখ ফুটে তিনি কিছু বলতে পারছেন না। কারণ তিনি নিজে সামরিক অফিসার। প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী পদ তাঁর দখলে। অন্যকে প্রশাসন থেকে দূরে সরে থাকার উপদেশ দেবার নৈতিক অধিকার তাঁর নেই। বাধ্য হয়ে তিনি চুপ করে রইলেন। যথারীতি নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হল। সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ নিলেন নাসের। অন্যান্য দপ্তর পেলেন বিপ্লবী পরিষদের অপর সদস্যরা। প্রেসিডেণ্ট হবার পর নাগিব প্রধান সেনাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। আবদুল হাকিম আমেরকে এ পদের জন্য মনোনীত করে রাখা হয়েছিল। তিনি পরপর ক'ধাপ প্রমোশন পেলেন। তাঁর সামরিক পদমর্যাদা এখন মেজর জেনারেল। তিনিই হলেন মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

নাগিব বিপ্লবী নন। তিনি রক্ষণশীল সমরনায়ক। তিনি

ভুলতে পারছিলেন না যে, সৈন্যবাহিনীতে তাঁর পদমর্যাদা বিপ্লবী পরিষদের অন্যান্য সদস্যের চেয়ে অনেক উঁচুতে। উপরওয়ালার কথা বিনাপ্রশ্নে মেনে নেওয়াই তাঁদের কাজ। এই হচ্ছে সামরিক প্রশাসন নীতি। অপর দিকে বিপ্লবী পরিষদ বিশ্বাস করতেন যৌথ নেতৃত্বে। বিপ্লবের পর প্রথম ক'মাসে নাগিবের কার্যকলাপ তাদের ভাল লাগেনি। দ্রুত প্রশাসনিক সংস্কারে তিনি বাধা দিচ্ছিলেন। ক্ষমতা দখলের পরমুহূর্তেই বিপ্লবী পরিষদ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। নাগিবের প্রতিবন্ধকতায় তা সম্ভব হয় নি। তাঁর এক ভাই আলি ছিলেন সামরিক অফিসার। বিপ্লবের রাত্রে যারা সামরিক সদর দপ্তরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, আলি তাদের অন্যতম। নাগিব তাঁকেই রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন সিরিয়ায়। তাঁর অপর ভাই মহম্মদ সরকারী বৃত্তি নিয়ে পশুচিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন লণ্ডনে। নাগিবের বোন নাগুইয়া আমেরিকায় পড়াশুনার জন্য পেয়েছিলেন সরকারীবৃত্তি। শেষ পর্যন্ত তার যাওয়া হয় নি। সম্প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর বকেয়া নেতারা এবং মুসলিম-ব্রাদারহুডের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে দহরম মহরম করছিলেন। তাঁদের চাটুকারিতায় এবং বাইরের জনপ্রিতায় নাগিবের বিভ্রম ঘটেছিল। তিনি ভাবতে সুরু করছিলেন, মিশর এবং নাগিব একাত্ম। তাঁকে ছাড়া মিশর চলতে পারে না। যৌথ নেতৃত্ব এবং একনায়কত্বের বিরোধ ভিতরে ভিতরে জমা হচ্ছিল।

নাগিব বুঝতে পারছিলেন মিশরের আসল ক্ষমতার মালিক বিপ্লবী পরিষদ। তাদের অনুমোদন ছাড়া এক পাও এগুবার উপায় নেই। সামরিক পদমর্যাদায় যারা তাঁর জুনিয়ার, তাঁদের কথামত কাজ করা তাঁর ধাতে সইছিল না। নাগিব চটেছিলেন। তিনি চান সত্যিকারের ক্ষমতা। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। বিদেশী পত্রিকাগুলো বিশেষ করে বৃটিশ পত্রিকাগুলো

এসময় বিপ্লবী পরিষদের কঠোর সমালোচনা করছিল। রাজনৈতিক দলগুলোকে বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদের তুফান তুলছিল। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং গণমান্য রাজনৈতিক নেতাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন সামরিক আদালত। সরকারীভাবে তিনি তা সমর্থন করলেও এত কঠোরতা তাঁর ভাল লাগেনি। বিপ্লবী পরিষদে সংখ্যাধিক্যের মতের বিরুদ্ধে তাঁর করারও কিছু ছিল না। এখন সামরিক আদালতের স্থান নিয়েছে বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল। আবদুল লতিফ বাঘদাদী, হাসান ইব্রাহিম এবং আনোয়ার সাদাত তাঁর সদস্য। দুর্নীতির সমূল উচ্ছেদের সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা কাজে নেমেছিলেন। নাগিবের কাছে যারা যাতায়াত করছিলেন তাদের অনেকের মনেই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন না। কার ঘাড়ে কখন খাঁড়া পড়বে তা কারও জানা ছিল না। সৈন্যবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ অফিসার বিপ্লবী পরিষদের সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। এদের নেতা ছিলেন কর্ণেল আমেদ শাবকী। তিনি নাগিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাসের তাঁকে পদচ্যুত করলেন। বিপ্লবী পরিষদ তাঁর পক্ষে। নাগিব অসহায়।

সুদানের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন মিশরে এবং বৃটেনের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল। সুদানে রয়েছে ইঙ্গ-মিশরীয় যৌথ শাসন। কার্যত বৃটিশ করছে সুদান শাসন। ১৯৫৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী নাগিব বৃটিশের সঙ্গে এক চুক্তি করেছিলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী সুদানে চলবে তিন বছরের অন্তর্বর্তীকালীন শাসন। তিন বছরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই সেখানে হবে স্বাধীন নির্বাচন। স্থায়ী সরকার দাবী জানালেই তিন মাসের মধ্যে সুদান থেকে বৃটিশ এবং মিশরীয় বাহিনী সুদান ছাড়বে। সুদানের ভবিষ্যত নির্দ্ধারণ করবে গণপরিষদ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মিশরীয় সমর্থক ন্যাশান্যাল ইউনিয়নিস্ট দল পার্লামেণ্টে বিপুল সংখ্যাধিক্য পেল। মিশরের

সঙ্গে সুদানের মিলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন বিপ্লবী পরিষদ। নাগিব সুদানে জনপ্রিয়। খার্তুমে তাঁর জন্ম। সুদানে কেটেছে তাঁর শৈশব এবং কৈশোর। সুদান ছিল তার প্রথম জীবনের কর্মভূমি। মিশরীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আধা-সুদানী। সুদানের সঙ্গে মিশরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে নাসেরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিপ্লবী পরিষদ সুদান সফরে নাসেরকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯৫৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী সুদান-চুক্তির এক বছর পূর্ণ হয়েছে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় মুক্তি সম্মেলন সভা ডেকেছেন। বক্তৃতা চলছে। বাইরে ভীষণ গণ্ডগোল। একদল ব্রাদারহুডের সমর্থক হাঙ্গামা বাধিয়েছে। একটা ট্রাক জ্বলছে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ সুরু হয়েছে। আহতেরা রাস্তায় কাঁতরাচ্ছে। নাসের নিজে ত্যক্ত-বিরক্ত। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডকে বেআইনী ঘোষণা করলেন। তাদের সদর দপ্তর এবং শাখা প্রশাখা বন্ধ করে দেওয়া হল। সুপ্রীম গাইড হাসান এল হুদেইবী সহ প্রায় পাঁচশ' মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা এবং কর্মীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। নাগিবের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না।

নাগিব পাল্টা আঘাত হানলেন। সুদান সফর আসন্ন। সর্বত্র প্রস্তুতি চলছে। তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবী পরিষদের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠালেন। কায়রোর উপকণ্ঠে একটি ছোট বাড়ীতে থাকতেন নাগিব। গামাল সালেম এবং হুসেন এল শেফী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন! পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের জন্য তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। নাগিব অনড়। হয় সত্যিকারের শাসন ক্ষমতাদান, নয় পদত্যাগ পত্র গ্রহণ—এ দুয়ের মধ্যে একটা নিতে হবে বিপ্লবী পরিষদকে। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। তারপর ঠিক হল ২৮শে ফেব্রুয়ারী সুদনের অস্থায়ী পার্লামেণ্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নাগিব যোগ দেবেন। তিনি ফিরে না আসা

পর্যন্ত পদত্যাগ পত্রের কথা গোপন থাকবে। দু'সপ্তাহের মধ্যেই বিপ্লবী পরিষদকে বলতে হবে, তাঁরা তাঁকে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ কর্তৃত্ব দেবেন, না পদত্যাগ গ্রহণ করবেন।

পরের দিন বিকেলে নাগিব সরকারী ভবনে গেলেন। এদিন ছিল মন্ত্রীসভার বৈঠক। নাসের এবং সালেম অনুপস্থিত। গামাল সালেম এবং বাঘদাদী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে চলে গেলেন। কামালউদ্দিন হুসেন এবং জাকারিয়া মহীউদ্দিন ক'মিনিট পর বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে স্থানত্যাগ করলেন। নাগিব একা বসে রইলেন। সভা স্থগিত রেখে তিনি নিজের দপ্তরের দিকে পা বাড়ালেন। সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরল। তাঁদের কাছ থেকে তিনি জানলেন, সেজিরায় বিপ্লবী পরিষদের নূতন ভবনে আর একটা বৈঠক বসেছে।

সুদানের জন নেতাদের উপহার দিতে হবে। বিভিন্ন জিনিষের নমুনা তাঁর দপ্তরে জমা হয়েছিল। সালেমের আসার কথা। তিনি এবং নাগিব জিনিষগুলো পছন্দ করবেন। আধঘণ্টা চলে গেল। সালেম এলেন না। নাগিব বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন তার মিলিটারী সেক্রেটারী। সুদানের জন্য উপহার পছন্দ এবং কেনার ভার বিপ্লবী পরিষদের প্রতিনিধিদের উপর দেবার জন্য একটি অনুরোধ পত্র তিনি নাগিবের সামনে ধরলেন। নাগিব তাতে স্বাক্ষর দিলেন।

বাড়ী ফিরে তাঁর (নাগিবের) মনে হল, কাজটি ভাল হয় নি। তিনি যাবেন সুদান সফরে। উপহারের জিনিষগুলো তাঁর নিজেরই পছন্দ করা উচিত। নাগিব মন ঠিক করে ফেললেন। পরের দিন সকালে তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীকে ডেকে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেবেন। বিকেলের পরিবেশ তাঁর ভাল লাগে নি। তিনি অপমানিত বোধ করছিলেন। বিপ্লবী পরিষদ বিদ্রোহ করে বসেছেন। একটা সংঘর্ষ হয়ত অনিবার্য। জনতা

তাঁর পিছনে। সুদানীরা তাঁর অনুরক্ত। নাগিব ভাবলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি জিতবেন। মনে নিদারুণ অশান্তি নিয়ে তিনি ঘুমোতে গেলেন।

চৌদ্দ

নাসেরের বয়স তখন ৩৬ বছর। তিনি সৈন্যবাহিনীর হিরো। সাহস এবং সংগঠন শক্তিতে অতুলনীয়। তিনি অবস্থার মোকাবিলার জন্য তৈরী হলেন। বিপ্লবী পরিষদ এবং অন্যান্য ফ্রী অফিসার তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। নাসের জানতেন, নাগিব জনপ্রিয়। জনতা ভালবেসেছে মিশরের বিপ্লব। তারা শুধু জানে, নাগিব এই বিপ্লবের নেতা, আসল কথাটা তাদের জানানো দরকার। তা না হলে ভবিষ্যতে অনর্থ বাড়বে। মুসলিম ব্রাদারহুড, কমিউনিস্ট এবং বকেয়া রাজনৈতিক নেতারা নাগিবের পক্ষে। তিনি তাদের শেষ ভরসা। নাগিবের মধ্যে মুসলিম ব্রাদারহুড দেখছে তাদের অস্তিত্ব। কমিউনিস্টরা ভাবছে, নাগিবের ক্ষমতায় থাকার অর্থ মিশরের অগ্রগতির মন্থরতা; দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতাদের পুনরাবির্ভাব এবং বিশৃঙ্খলা। বুর্জোয়া বিপ্লবের মোহ ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটবে শ্রমিক বিপ্লব। বকেয়া রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা, নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতায় তাদের ফিরিয়ে আনতে পারেন শুধু নাগিব। বিচিত্র রাজনৈতিক ঘুর্ণীপাকের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে মিশর। বিপ্লবী পরিষদের সদস্যরা দিশাহারা। নাসেরের উপর তাঁদের গভীর আস্থা। তাদের দৃঢ় প্রত্যয়, এ সঙ্কটে তিনি একমাত্র পথ প্রদর্শক।

ভোর সাড়ে ছ'টায় নাগিবের ঘুম ভাঙ্গল। তিনি তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীকে টেলিফোন করতে গেলেন। রিসিভার তুললেন। কিন্তু কোন সাড়া নেই। দ্বিতীয় টেলিফোনে চেষ্টা

করলেন। সেটাও নিঃশব্দ। বিপ্লবী পরিষদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখার জন্য সরাসরি একটি টেলিফোন লাইন ছিল। নাগিব দেখলেন, তাও অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন বুঝলেন, তিনি গৃহবন্দী। ভৃত্য এসে খবর দিল, গোলন্দাজ সৈন্য এবং মিলিটারী পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে। কাউকে তারা বাড়ী থেকে বেরুতে কিম্বা বাইরের থেকে ভিতরে আসতে দিচ্ছে না। তাদের কড়া নির্দ্দেশ, বাড়ীর একজন মাত্র প্রতিদিনের জিনিষপত্র কেনাকাটার জন্য বাইরে যেতে এবং ভিতরে আসতে পারবে। নাগিব তাঁর রোজনামচা লেখায় এবং কোরান পাঠে সারাদিন কাটালেন। বাইরে কি হচ্ছে, না হচ্ছে জানতেও পারলেন না। রাত্রি কেটে গেল। পরের দিন বিপ্লবী পরিষদের ঘোষণা বেরুল। বেতারে নাগিব শুনলেন—কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য মিশরীয় বিপ্লব ঘটানো হয় নি। দুর্নীতিপরায়ণ শাসককুলের হাতে জনসাধারণ অসীম লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার বনিয়াদ সৃষ্টিই ছিল সাম্প্রতিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্য। জাতির মনে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য একজন প্রবীণ নেতাকে সামনে রাখার দরকার পড়েছিল। এই জন্যই গুপ্তসমিতির বাইরে থেকে নাগিবকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২৫শে আগস্টের আগে জেনারেল নাগিব বিপ্লবী পরিষদের সদস্য ছিলেন না। এই দিন পরিষদের প্রেসিডেন্ট লেঃ কর্ণেল গামাল আবদুল নাসের তাঁর অনুকূলে পদত্যাগ করেছিলেন। তারপর নাগিবকে করা হয়েছিল বিপ্লবী পরিষদের প্রেসিডেণ্ট।

বিপ্লবের ছ'মাসের মধ্যেই জেনারেল নাগিব ব্যাপক ক্ষমতার দাবী জানাতে লাগলেন। বিপ্লবী পরিষদের সাধারণ সদস্য অপেক্ষা তিনি বেশী ক্ষমতা চান। বিপ্লবের ক'বছর আগে বিপ্লবী পরিষদের নিয়ম-কানুন প্রণীত হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী

বিপ্লবী পরিষদের প্রত্যেকটি সদস্যদের সমান অধিকার। প্রেসিডেণ্ট এ নিয়মের বাইরে নন। বিপ্লবী পরিষদ তার নিয়ম-কানুনের ব্যতিক্রম ঘটাতে রাজী নন। ভোটাভুটির সময় দুপক্ষের ভোটদাতার সংখ্যা সমান সমান হলেই প্রেসিডেণ্ট তাঁর ভোট দিতে পারেন। জেনারেল নাগিব মিশরীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিপ্লবী পরিষদের প্রেসিডেণ্ট এবং মন্ত্রীসভাও; বিপ্লবী পরিষদের যৌথ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। তা সত্বেও তিনি গোটা বিপ্লবী পরিষদের চেয়ে অধিক ক্ষমতার দাবীদার। আমরা তাঁকে তা দিতে রাজী নই। বিপ্লবী পরিষদের সদস্যরা সমান ক্ষমতার অংশীদার থাকবেন।

সম্প্রতি জেনারেল নাগিব কতগুলো ক্ষমতার দাবী করছেন—বিপ্লবী পরিষদের সিদ্ধান্ত নাকচ, মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং পদচ্যুতি, সৈন্যবাহিনীতে পদোন্নতির সুপারিশ অনুমোদন কিম্বা নাকচ, পদচ্যুতি এবং বদলী—সবই তিনি নিজের ক্ষমতার আওতায় আনতে চান। এর অর্থ ব্যক্তিবিশেষের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ভোরে নাগিবের শোবার ঘরের জানালায় খট্‌খট্‌ শব্দ হল। তাঁর ঘুম ভাঙ্গল। নাগিব আগন্তুকদের সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে বললেন। জনাকয় অশ্বারোহী অফিসার সহ প্রবেশ করলেন বিপ্লবী পরিষদের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য মেজর খালেদ মহীউদ্দিন। তিনি তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন যে, নাগিব হবেন মিশরের প্রেসিডেণ্ট এবং এবং খালেদ প্রধানমন্ত্রী। সব ব্যবস্থা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। শুধু নাগিবের সম্মতির অপেক্ষা। এ ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেলে বিপ্লবী পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পদত্যাগ করবেন। নাগিব তাঁকে বললেন, সবাই যদি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় রাজী থাকেন তবে এ ব্যবস্থায় তাঁর আপত্তি নেই। যথাসময়ে

তাঁকে (নাগিবকে) নিয়ে যাবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল—আসবে—এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেজর খালেদ চলে গেলেন।

নাসের সব খবর পেয়েছিলেন। খালেদ আব্বাসিয়া ব্যারাকের অশ্বারোহী বাহিনীকে বিপ্লবী পরিষদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। এ ব্যারাকে নাগিব পৌঁছতে পারলে অনর্থ ঘটবে। তিনি তুজন সামরিক অফিসার পাঠালেন নাগিবের বাড়ীতে। তাঁরা তাঁকে আলাদাভাবে ঘাঁটিতে নিয়ে গেলেন। নাসের নিজে ছুটলেন আব্বাসিয়া ব্যারাকে। শত চেষ্টাতেও তিনি অশ্বারোহীদের শান্ত করতে পারলেন না। তাদের দাবী—নাগিব প্রেসিডেন্ট এবং খালেদ মহীউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী। নাসের অচঞ্চল। তাঁর সামনে অগ্নিপরীক্ষা। তিনি বুঝতে পারলেন, জনতার মধ্যে নাগিবের প্রভাব অসামান্য! সৈন্যবাহিনীর একাংশ তাঁর সমর্থক। ছোট ভাইএর মত তিনি দেখতেন খালেদকে। তিনি জানতেন, কমিউনিস্টদের সঙ্গে খালেদের গোপন আঁতাত। তাঁর বিরুদ্ধে নাগিবের আক্রোশ ছিল প্রবল। নাসের আগলিয়ে রাখতেন তাকে। প্রেসিডেন্ট নাগিব ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী। তিনি এদের কাউকে বাগে পেলে ছাড়তেন না। কমিউনিস্ট সন্দেহে অনেক সামরিক অফিসারের চাকুরী গিয়েছে। আরও কড়া ব্যবস্থা নেবার জন্য প্রতিদিন নাগিব পীড়াপীড়ি করতেন। নাসের শুধু বলতেন, যতদিন সুয়েজ এলাকায় ইংরাজ থাকবে ততদিন কমিউনিস্ট আন্দোলন ঠেকান যাবে না। ওরা মিশরীয় জাতীয়তাবাদকে নিজেদের কাজে লাগাবে। আজ খালেদ বিদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী এবং নাগিবের দোস্ত। ব্যক্তিগত জীবনে এত বড় আঘাত তিনি বড় একটা পান নি। অনিবার্যকে তিনি স্বীকার করলেন। নাগিবকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিপ্লবী পরিষদ একাত্ম হয়ে নাসেরকে ঘিরে রইলেন। দেখা গেল, জনপ্রিয়তায় সৈন্যবাহিনীতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। খালেদের সমর্থক মুষ্টিমেয়।

একটা মীমাংসা হয়ে গেল। নাগিব থাকবেন প্রেসিডেণ্ট এবং নাসের হবেন প্রধানমন্ত্রী। বিপ্লবী পরিষদ নাগিবকে বাড়ীতে ফেরত পাঠালেন। পরের দিন সংবাদপত্রে নাগিবের ইস্তাহার প্রকাশিত হল। তিনি বললেন, জাতির ঐক্য বজায় রাখার জন্য তিনি আবার প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করেছেন। মিশরে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান তাঁর মূল লক্ষ্য। বিপ্লবী পরিষদ তাদের ইস্তাহারে জানালেন, প্রধানমন্ত্রী নাসেরের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী পরিষদের সহযোগিতায় প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ নাগিবের পরিচালনায় মিশরীয় বিপ্লবের গতি অব্যাহত থাকবে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী সকালে নাগিব রিপাবলিকান প্রাসাদে গেলেন। সেখানে হাজার হাজার নরনারী জমায়েত হয়েছিল। অলিন্দ থেকে তিনি বক্তৃতা করলেন। ইতিমধ্যেই সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে হাঙ্গামা সুরু হয়েছিল। হাঙ্গামায় নেতৃত্ব নিয়েছিল মুসলিম ব্রাদারহুড। একজন পুলিশ সহ ৯ জন ছাত্র মারা গিয়েছিল। বক্তৃতা শেষ হবার আগেই নাগিব বাধা পেলেন। আবদুল কাদের ওদা নামে মুসলিম ব্রাদারহুডের এক পাণ্ডা রক্তমাখা একটি রুমাল দেখিয়ে দাবী করছিল—হাঙ্গামার তদন্ত চাই। নাগিব বলে যাচ্ছিলেন—মিশরে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে—এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করেই তিনি প্রেসিডেণ্টের পদে ফিরে এসেছেন। ওদার চীৎকার কিছুতেই থামছিল না। নাগিব তাকে অলিন্দে ডেকে পাঠালেন। সেখান থেকে ওদা বক্তৃতা করলেন। হাঙ্গামায় তদন্তের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ওদা দলবল নিয়ে চলে গেল। বিপ্লবী পরিষদ রেগে ফেটে পড়লেন। মুসলিম ব্রাদারহুডকে নাগিব প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ধর্মনিরপেক্ষ বিপ্লবকে তিনি পিছন থেকে ছুরি মারছেন। এ অবস্থা অসহনীয়।

সালহ সালেমকে সঙ্গে নিয়ে নাগিব চলে গেলেন সুদানে। নাসের কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন। গত দুদিনের ঘটনাবলী থেকে তিনি বিরাট শিক্ষা পেয়েছিলেন। জনতার বৃহত্তম অংশের

আওয়াজ তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। তারা বলছিল—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। দলাদলি বন্ধ কর। বিপ্লবের ফসল ফেলে দেওয়া চলবে না, চলবে না। ফারুকের আমলে প্রাসাদচক্রী এবং দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতাদের শাসনে জনসাধারণের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। বিপ্লব তাদের উচ্ছেদ করেছে। নাগিব আবার সেই বাতিল রাজনৈতিক নেতাদের শাসন ক্ষমতায় টেনে আনার জন্য ওঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি হয়ত ভাবছেন, বিপ্লবী পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতায় দেশ শাসন তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। নাগিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁকে এধরণের পরামর্শ দিচ্ছেন। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে নাগিবের মনের মিল নেই। তাঁর একমাত্র ভরসা রাজনৈতিক দলগুলো। জনতা আসল সমস্যা বুঝতে পারছে না। নাগিবের প্রতি তাদের মোহ প্রবল। তাঁরা জানে না, নাগিব বিপ্লবী নন। তিনি দ্রুত সংস্কারের বিরোধী। তিনি মনেপ্রাণে রক্ষণশীল। তাঁর হাতে বিপ্লবের ফসল মোটেই নিরাপদ নয়। চরম আঘাত হানার সঙ্কল্প নিলেন নাসের। তিনি নাগিবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবেন। জাগ্রত জনতা তাঁর সহায়। সুরু হল কূটনৈতিক দাবাখেলা।

সন্দেহভাজনদের পাইকারী হারে গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন নাসের। দক্ষিণপন্থী, কমিউনিস্ট, মুসলিম ব্রাদারহুড—কেউ বাদ পড়ল না। পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীতে চলল কড়া শোধন। গ্রেপ্তার হলেন খালেদ মহীউদ্দিন এবং তার সমর্থকরা।

নাগিবের খার্তুম পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে প্রচণ্ড হাঙ্গামা সুরু হল। বাইশ জন নিহত এবং প্রায় দু'শ আহত হবার সংবাদ পাওয়া গেল। নিহতদের মধ্যে ছিলেন পুলিশের বড় কর্তা মিঃ এইচ সাদারল্যাণ্ড ম্যাকগুইগান। সুদানের শাসনভার তখন কার্যত ইংরাজের হাতে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ওম্মা দলকে বিমান-ঘাঁটির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুমতি

দিয়েছিলেন। তারা আওয়াজ তুলছিল—সুদানীদের জন্য সুদান। মিশর-বৃটেন তফাৎ যাও। মিশর-সমর্থক জাতীয় ইউনিয়নিস্ট দলের সদস্যরা বিপুল সংখ্যায় নাগিব-সম্বর্দ্ধনায় বিমান ঘাঁটিতে এসেছিল। এই দু'দলের মধ্যে বেধেছিল সংঘর্ষ। পুলিশবাহিনী নির্বাক দর্শক। একটি গাড়ীতে নাগিবকে তুলে নিলেন জনৈক বৃটিশ অফিসার। সোজা তাঁকে আনা হল বৃটিশ গবর্ণর জেনারেল স্যার রবার্ট হোর বাড়ীতে। দুপুরের কিছু আগে এই ভবনের সামনেই আবার বাধল হাঙ্গামা। এবারের হাঙ্গামাকারীদের অধিকাংশ ছিল উপজাতীয় নরনারী। তাদের হাতে বর্শা, ছুরি এবং লাঠি। ওদের আওয়াজ—সুদানীদের জন্য সুদান! মিশর তফাৎ যাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা শুধু শ্লোগানই দিচ্ছিল। নিরস্ত্র পুলিশ তামসা দেখছিল। একজন বৃটিশ অফিসার তাদের কাঁদানে গ্যাস ছুড়ার হুকুম দিলেন। গ্যাসের ধোঁয়ায় লোকগুলোর চোখ জ্বলতে লাগল। কাঁদানে গ্যাস কি তা উপজাতীয় লোকগুলো জানে না। ওরা ভাবল, ওদের একেবারে মেরে ফেলার জন্য আক্রমণ সুরু হয়েছে। মরিয়া হয়ে তীর, ধনুক বর্শা এবং লাঠি নিয়ে তারা পাল্টা আক্রমণ চালাল। তারপর রক্তগঙ্গা। অনুষ্ঠানের শেষে বিরক্ত হয়ে নাগিব কায়রো ফিরলেন। তিনি সন্দেহ করলেন—সবই বৃটিশের ষড়যন্ত্র। এই সন্দেহের কারণও ছিল।

১৯৫৩ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির সময় সুদানের মিশর বিরোধী ওম্মা দলের ছিল প্রাধান্য। এ দলের নেতারা পেতেন বৃটিশ অর্থ সাহায্য। ওম্মা দলকে আবার বাগে রাখার জন্য বৃটিশ শাসকেরা গড়ে তুলেছেন দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন। দক্ষিণ সুদানীরা আরব নয়। উত্তরের আরব আধিপত্য তারা মানবে না। সুদান স্বাধীন হলে তার দক্ষিণাংশ কেটে নিয়ে বৃটিশ রক্ষণাধীন উগাণ্ডার সঙ্গে জুড়ে

দেওয়াই ছিল বৃটিশ পরিকল্পনা। তার জন্যই তারা দক্ষিণীদের উত্তরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতেন। বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন জোরদার করার জন্য টাকা ঢালতেন। মিশর সমর্থক সুদানীদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। তারা আটটি ছোট বড় দলে বিভক্ত। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকত। সুদানের সাধারণ মানুষ সুদানের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষপাতী। ফারুকের শাসনাধীন মিশরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে তারা রাজী নয়। মিশরের বিপ্লব সুদানীদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দিয়েছিল। ফারুক নির্বাসিত। জাতীয়তাবাদী মিশর ১৯৫৩ সালের চুক্তিতে সুদানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করেছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মিশর এবং সুদানের মধ্যে সহযোগিতা তাদের কাম্য। ১৯৫৩ সালের চুক্তির সময় বৃটিশ ভেবেছিল, সাধারণ নির্বাচনে সংঘবদ্ধ ওম্মা দলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন মিশর সমর্থকরা লড়তে পারবে না। বৃটিশ ঘেষা ওম্মা দল শাসন ক্ষমতা পাবে। মিশর হাতছাড়া হয়ে গেছে। সুদান তাদের সঙ্গে থাকবে। ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তির পর মিশরের উদ্যোগে মিশর সমর্থক দলগুলো নিয়ে গঠিত হল যুক্তফ্রন্ট—জাতীয় ইউনিয়নিস্টস। ফ্রন্টের নেতা ইসমাইল এল আজহারি। বৃটিশ প্রমাদ গণল। ওম্মা এবং ইউনিয়নিস্টস সমর্থকরা দু'টি সম্প্রাদায়ে বিভক্ত—ওম্মার নেতারা খাটমিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইউনিয়নিস্টস নেতারা ছিলেন আনসার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এ দুটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোড়ামি কাজে লাগাচ্ছিল ইংরাজ। মিশরীয় বিপ্লবের প্রভাবে সুদানের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা দানা বেঁধে উঠছিল। সেখানে জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট উন্মেষ ঘটেছিল। ১৯৫৩ সালের নির্বাচনে প্রশ্ন ছিল মাত্র একটি—স্বাধীন সুদান প্রতিবেশী মিশরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, না বৃটিশের লেজুড় হয়ে থাকবে। নির্বাচনের ফলাফল দেখে ইংরাজের চমক লাগল। ইউনিয়নিস্টস দল পার্লামেন্টে

বিপুল সংখ্যাধিক্য পেল। মন্ত্রীসভা গঠন করলেন, ইসমাইল এল আজহারি। বৃটিশ বুঝতে পারল, নূতন সরকার মিশর ঘেষা হবে। অদূর ভবিষ্যতে সুদান ছেড়ে তাদের চলে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। এ সরকারকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র আঁটল তারা। নাগিবের সুদান সফরের সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা এই চক্রান্তেরই পরিণতি। নাগিব এ ধারণা নিয়েই ফিরেছিলেন কায়রোতে।

পনের

নাগিব কায়রো ফিরেই দেখলেন রাজনৈতিক হাওয়া বদলে গেছে। তাঁর সমর্থকরা দলে দলে গ্রেপ্তার হচ্ছেন। নাসের কঠোর হস্তে পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী শোধন করছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং সংবাদপত্রের উপর সেন্সারসীপের কড়াকড়ি হ্রাস করার আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন বিপ্লবী পরিষদ। নাগিবের বলার কিছু নেই। তিনি এসব ব্যবস্থা চেয়েছিলেন।

মন্ত্রীসভা এবং বিপ্লবী পরিষদের বৈঠক বসল। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, আগামী ২৩শে জুলাই মিশরীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান। তার আগেই হবে গণপরিষদের নির্বাচন। ২৩ শে জুলাই সুরু হবে তার অধিবেশন। গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করবে। নূতন সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদই নেবে পার্লামেণ্টের দায়িত্ব। মিশরের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করবে গণপরিষদ। গণপরিষদ গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্ব বিলোপ ঘটবে। নাসের নিজে এনেছিলেন এ প্রস্তাব। ফ্রী অফিসাররা দল হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়াবেন না।

এই দিনই (৯ই মার্চ) তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিলেন। নাগিব হলেন মিশরের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী।

বিপ্লবী পরিষদের সিদ্ধান্ত আনুযায়ী ২৫শে মার্চ নাসের ঘোষণা করলেন—

১. আগামী ২৭শে জুলাই (১৯৫৪) বিপ্লবী পরিষদ তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গণপরিষদের হাত সমর্পণ করবেন। এদিনই সরকারী ভাবে মিশরীয় বিপ্লবের অবসান ঘটবে।

২. বিপ্লবী পরিষদ কোন রাজনৈতিক দল গঠন করবে না।

৩. রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। তারা এখন স্বাধীনভাবে কাজ চালাতে পারবে!

৪. মিশরের নাগরিকরা পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে।

৫. স্বাধীন এবং প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হবে।

৬. গণপরিষদের প্রথম কাজ হবে মিশরীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা মিশর জ্বলে উঠল। জনতা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সবার মুখে একটি মাত্র আওয়াজ—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। নাসের জিন্দাবাদ। সাধারণ মানুষ মনে করল, বিপ্লব যাদের উচ্ছেদ করেছে তারাই আবার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসছে। মিশর পিছিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী নাগিব। তিনিই বকেয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে সক্রিয় করে তুলছেন। ২৮শে মার্চ মিশর-বন্ধের আহ্বান জানানো হল। ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাতে যোগ দিল। কায়রোর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ল। মিশর বিক্ষুব্ধ। জনতার আওয়াজ—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! নাসের জিন্দাবাদ। বিপ্লবী পরিষদ জিন্দাবাদ। নাগিব চমকে উঠলেম। তিনি বুঝলেন, বিপ্লবের সংস্রব বর্জনের

অর্থ রাজনৈতিক আত্মহত্যা। তিনি নাসেরের কাছে আত্মসমর্পন করলেন। ১৭ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়লেন নাগিব। আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন নাসের। গণপরিষদের নির্বাচন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রইল।

সুয়েজ এলাকায় চলছে বৃটিশ আধিপত্য। মিশরের বিপ্লবী সরকার কিছুতেই বৃটিশ কবল থেকে সুয়েজমুক্ত করতে পারছেন না। আপোষ আলোচনার শেষ নেই। সুয়েজকে কেন্দ্র করে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। বৃটিশ সরকারের যুক্তি—রাশিয়াকে ঠেকাবার জন্য সুয়েজ ঘাঁটি দরকার। মিশরের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদনের আগে তারা সুয়েজ ছাড়বে না। বাগদাদ চুক্তি সামনে রয়েছে। এই সামরিক জোটে মিশর যোগ দিলেই একটা ফয়সালা হয়ে যেতে পারে। তাতে নাসেরের ঘোরতর আপত্তি। তাঁর যুক্তি সহজ এবং সরল। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মিশরের কোন বিবাদ নেই। ভারত স্বাধীন। বৃটিশ সামরিক সংরক্ষণ নেহরু সরকার চান না। বৃটিশ তৈল স্বার্থের জন্য তিনি মিশরের সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে রাজী নন।

সুদানের নির্বাচনের ফলাফল দেখে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে। পশ্চিম এশিয়ায় তাদেরও তৈল স্বার্থ রয়েছে। এ অঞ্চলে শান্তি দরকার। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একটা বোঝা পড়ায় না এলে আরব দুনিয়ার উত্তাপ কমবে না। এ পথের প্রতিবন্ধক বৃটেন। মার্কিন সরকার বারবার হুশিয়ারী দিচ্ছেন—বৃটিশ সরকার মিশরের সঙ্গে একটা মীমাংসায় না এলে আমেরিকা আলাদাভাবে নিজের পথ দেখে নেবে। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আর বেশীদিন টাল বাহানা করতে পারলেন না। সুয়েজ আলোচনা একটা পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি বৃটিশ প্রতিনিধিদের নির্দ্দেশ দিলেন। ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুলাই তৈরী হল সুয়েজ

চুক্তির খসড়া। অক্টোবর মাসে চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন নাসের। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী বৃটেন কুড়ি মাসের মধ্যে সুয়েজ এলাকা ছাড়বে। ইস্রাইল ছাড়া অপর কোন রাষ্ট্র যদি আরব লীগের যে কোন সদস্য রাষ্ট্র কিম্বা তুরস্কের উপর আক্রমণ চালায় তবে বৃটিশ-বাহিনী এই এলাকায় আবার ফিরে আসতে পারবে। বৃটেনের পক্ষে এ চুক্তি নিঃসন্দেহে তেতো বড়ি। প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের এটা না গিলে উপায় ছিল না। একদিকে মার্কিন চাপ এবং অন্যদিকে ক্রমবর্দ্ধমান আরব জাতীয়তাবাদ—এ দুয়ের মাঝখানে তিনি বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। কমন্সসভায় তাঁর বক্তৃতায় ফুটে উঠেছিল অসহায় মনোভাব। তিনি বলছিলেন, পারমাণবিক এবং রকেটের যুগে সুয়েজ ঘাঁটির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মিশরের সঙ্গে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠায় জন্য এ চুক্তির দরকার ছিল। কিন্তু পারমাণবিক যুগটা ১৯৫৪ সালে আসেনি। এসেছে প্রায় দশ বছর আগে। তবু বৃটেনের টালবাহানার অন্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইরাণকেও সুয়েজ চুক্তির আওতায় আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিশরের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তা সম্ভব হয়নি। সুয়েজ চুক্তির ফলে মিশরের সাধারণ মানুষের কাছে নাসেরের মর্যাদা বাড়ল। কিন্তু কঠোর সমালোচনায় এগিয়ে এল কমিউনিস্ট এবং মুসলিম ব্রাদারহুড। তাদের অভিযোগ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মিশরকে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সর্বময় ক্ষমতা কার্যত নাসেরের হাতে এসে পড়েছে। নাগিব নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া অন্য কিছু নন। রাজনৈতিক নেতারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। নাগিবের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য তারা জড়িয়ে ফেলেছিলেন। নাগিব এখন নখদন্তহীন। রাজনৈতিক নেতারাও অনাথ। নাসের এ অবস্থার সুযোগ নিলেন। যাদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখা হয়েছিল দিনের পর দিন চলল তাদের বিচার। নাগিব-নাসের মতানৈক্যের

সুযোগ নিয়ে বিপ্লবী সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের দায়ে মিশর থেকে নির্বাসিত হলেন খালেদ মহীউদ্দিন। তাঁর সহযোগী সামরিক অফিসাররা পেলেন কঠোর শাস্তি। নাগিব সমর্থকরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গণতন্ত্র বিপন্ন বলে কমিউনিস্টরা প্রচার সুরু করল। নাসের জানতেন, খালেদ মহীউদ্দিন কমিউনিস্ট সমর্থক। তাদের উস্কানিতেও তিনি নাসের-বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই তরুণ অফিসারটির প্রতি নাসেরের ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। তিনি খালেদকে গড়েপিটে মানুষ করেছিলেন। তিনিই তাকে বিপ্লবের পথে টেনে এনেছিলেন। খালেদের বিশ্বাসঘাতকতা নাসেরের ব্যক্তিগত জীবনে প্রচণ্ড আঘাত। কিছুদিন পর তিনি এই অনুতপ্ত তরুণকে মিশরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। নাসেরের আনুকুল্যেই ১৯৫৪ সালে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন খালেদ। নাসেরেব সুপারিশের জোরেই তিনি পেয়েছিলেন আল আকবর পত্রিকাগোষ্ঠীব পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতির পদ।

কমিউনিস্ট দমন নাসেরের পক্ষে তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। ওরা সংখ্যায় কম এবং বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। নাগিবের ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কমিউনিস্ট নেতা দেশ ছেড়েছিলেন। অন্যেরা যত গর্জায় তত বর্ষায় না। কিন্তু মুসলিম ব্রাদারহুডের চ্যালেঞ্জ দুর্বার। বিপ্লবী পরিষদের সদস্য আবদুল মোনাইম আবদুল রউফ এদের গোপন উস্কানিদাতা। ধর্মান্ধদের বাগে আনা মুস্কিল। নাসের তৈরী হতে লাগলেন। সম্ভাব্য অবস্থার মোকাবিলার জন্য তিনি মন্ত্রীসভা ঢেলে সাজালেন। নূতন মন্ত্রীসভায় নাগিব-সমর্থক কেউ ছিলেন না। বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে নাসের দপ্তরগুলো ভাগ করে দিলেন।

সহকারী প্রধানমন্ত্রী—গামাল সালেম। **যোগাযোগ মন্ত্রী**—ফথি রাদবান। **স্বায়ত্বশাসন দপ্তরের মন্ত্রী**—বাঘদাদী। **প্রতিরক্ষামন্ত্রী**—হুসেন এল শফী (পরে আমের)। **শিক্ষামন্ত্রী**—কামাল উদ্দিন

হুসেন। **সমাজ দপ্তরের মন্ত্রী**—হুসেন এল শফী। **প্রধান সেনাপতি**—আবদুল হাকিম আমের (পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী)। **সুদান বিষয়ক মন্ত্রী**—সালহ সালেম। **স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী**—জাকারিয়া মহীউদ্দিন।

হাসান ইব্রাহিম হলেন রাষ্ট্র প্রধানের দপ্তরের উপমন্ত্রী। মন্ত্রীসভা এবং বিপ্লবী পরিষদের সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের যোগাযোগ রাখা তাঁর মুখ্য কাজ। আনোয়ার সাদাত এল গুম হুরিয়া (রিপাব্লিক) দৈনিক পত্রিকা এবং অন্যান্য সরকারী ও আধা সরকারী প্রকাশনের ডাইরেক্টেরের পদ পেলেন। সরকারী মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি হলেন উপমন্ত্রী। বিপ্লবী পরিষদ থেকে বাদ পড়লেন নাগিব। তিনি এসব পরিবর্ত্তনের নীরব দর্শক। অতীতের ভুলের মাশুল তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করছিলেন। আর ভিতরে ভিতরে জ্বল ছিলেন।

মুসলিম ব্রাদারহুড মরিয়া হয়ে উঠল। ১৯৫৪ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী সুদান চুক্তির বার্ষিক অনুষ্ঠানে তারা হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। বিপ্লবী পরিষদ তারপর এ সংস্থা বেআইনী ঘোষণা করেছিলেন। ব্রাদারহুডের নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকবেন। ধর্ম, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখবেন। এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে এবং নাগিবের অনুরোধে মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিলেন বিপ্লবী সরকার। জুলাই মাসে সুয়েজ চুক্তির পর এ সংস্থা আবার নিজ মূর্ত্তি ধরল। সব আক্রোশ পড়ল নাসেরের উপর। প্রতিবিপ্লবের জন্য তারা তৈরী হতে লাগল। গোপনে চলল অস্ত্রসংগ্রহ। শরিয়ত্তি রাষ্ট্রের বদলে নাসের তৈরী করছেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাঁকে উচ্ছেদ করা দরকার।

১৯৫৪ সালের ২৬শে অক্টোবর। আলেকজান্দ্রিয়ায় সুরু হয়েছে জাতীয় মুক্তি সম্মেলনের সভা। মঞ্চে বসে আছেন

নাসের। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল। দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে নাসের নুইয়ে পড়লেন। তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চলেছে। তিনি আহত হয়েছেন। আঘাত মারাত্মক ~~হয়~~ নয়। আততায়ী ধরা পড়ল। তাঁর স্বীকারোক্তিতে জানা গেল, মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতারাই তাকে নাসের-হত্যার জন্য জন্য পাঠিয়েছেন। চলল ধরপাকড়। গ্রেপ্তার হলেন সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যরা এবং সুপ্রীমগাইড হাসান-এল-হুদাইবি। তাদের ঘাঁটিগুলোতে হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। বিচারে দুজনের হল ফাঁসি। সুপ্রীমগাইড হাসান-এল-হুদাইবি পেলেন আজীবন কারাদণ্ড। মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থক এবং বিপ্লবী পরিষদের সদস্য আবদুল মোনেইম রওফ দেশ ছেড়ে পালালেন। মিশর থেকে মুসলিম ব্রাদারহুড প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সাক্ষীদের জবানবন্দীতে প্রকাশ পেল, এই গুপ্তহত্যার সঙ্গে নাগিব সংশ্লিষ্ট। এ নিয়ে আর বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা হল না। ১৪ই নভেম্বর নাগিব প্রেসিডেন্টের পদ ছাড়লেন। কায়রোর উপকণ্ঠে তিনি নজরবন্দী হয়ে রইলেন। তাঁর পতনে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও সবই বিশ্বাস করল, নাগিব মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থক এবং নাসের-হত্যার প্রয়াসে গোপন মদতদাতা।

মিশরের বিপ্লবের পর দু'বছরের মধ্যে নাসের হলেন রাষ্ট্রের সত্যিকারের নিয়ন্ত্রক। তিনি প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী। বিপ্লবী পরিষদ এবং জনসাধারণ তাঁর পিছনে। রাতারাতি তিনি এসে দাঁড়ালেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাদপ্রদীপের সামনে। প্রতিবেশী ইস্রাইলের সঙ্গে বিরোধ লেগেই আছে। পশ্চিম দুনিয়া এ রাষ্ট্রটিকে আরবের বুকের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার আরব নরনারীকে তারা উদ্বাস্তু করেছে। জন্ম মুহূর্তেই ইস্রাইলকে খতম করার জন্য মিশর লড়েছে। নাসের

নিজে ১৯৪৮ সালের প্যালেস্টাইন যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। ইস্রাইলীদের হাতে আরবের শোচনীয় পরাজয় তিনি ভুলতে পারেন নি। ঐক্যবদ্ধ আরব তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। কিন্তু তাদের মধ্যে অনৈক্য পশ্চিমের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। ভৌগোলিক অবস্থানে মিশর আফ্রিকায়। কিন্তু তার মানসিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এশীয় আরবদের সঙ্গে। ইউরোপ এবং আমেরিকা তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। আরব ত্বনিয়ার তৈলসম্পদ বৃটেন এবং আমেরিকার হাতে। বৃটিশ কলকারখানা চলে আরবের তেলে। প্রতিবছর আমেরিকা লুটে নেয় প্রচুর মুনাফা। এ অঞ্চল তারা সহজে ছাড়বে না। সামরিক স্ট্র্যাটেজীর দিক থেকে মিশরের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুয়েজ খাল পশ্চিমের সোনার খনি। মিশরের নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদ আরবের যুব মানসের আশার প্রতীক এবং পশ্চিমী ত্বনিয়ার নিদারুণ আতঙ্ক। নাসেরের দৃঢ় প্রত্যয়, আরবীয় জাতীয়তাবাদই একদিন ধ্বংস করবে পশ্চিমের কায়েমী স্বার্থ এবং গড়ে তুলবে আরব ঐক্য। তিনি জানেন, তার পথ মসৃণ নয়, বন্ধুর।

ষোল

১৯৫২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় নাসেরের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, বিদেশী প্রভূত্বের অবসান, বিশেষ করে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান এবং মিশরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার। প্রথমে ক্ষমতা দখলই ছিল বড় কথা। এ কাজ সম্পন্ন হবার পর কি-ধরনের সংবিধান মিশরের উপযোগী হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ ফ্রী অফিসাররা পান নি। সংসদীয় গণতন্ত্র অচল। অসময়ে এটা চালু করার চেষ্টার ফল নাগিব হাতে হাতে পেয়েছেন। তিনি এখন মিশরের উপকণ্ঠে নজরবন্দী এবং জনসাধারণের দ্বারা

পরিত্যক্ত। কমিউনিজম এবং সোভিয়েট ধরণের একনায়কত্ব নাসেরের অপছন্দ। মিশ্র অর্থনীতি ভিত্তিক একদলীয় শাসনের কথা বারবার তাঁর মনে উঠেছে। তার একটা রূপ দেওয়া দরকার। কিন্তু আরব দুনিয়ায় চলছে ওলট-পালট। বিপ্লবের পর আঠার মাসের মধ্যে সর্বত্র দানা বেধে উঠছে জাতীয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস। এই নব চেতনাকে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করছে বৃটিশ পক্ষপুটাশ্রিত আরবীয় রাজতন্ত্র। প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান ঘাঁটি ইরাক, সৌদী আরব এবং জর্ডন।

ইরাকের বাদশা ফয়জল এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী নূরী এস সৈয়দ বৃটিশ আশ্রিত। নূরীর কাছে কমিউনিজম অবাঞ্ছিত। তাঁর দৃষ্টিতে রাশিয়া আরব দুনিয়ার প্রধান শত্রু। বৃটেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধাই বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। ফয়জলের জ্ঞাতি ভাই হুসেন। তিনি জর্ডনের বাদশা। ইংরাজের টাকায় তাঁর রাজ্য চলে। জর্ডনের বেদুইন বাহিনীর বড়কর্তা জেনারেল গ্লাব পাশা। তাঁর হাত দিয়েই বৃটিশ পাঠায় বাদশা হুসেনের জন্য খয়রাতি টাকা। বাদশার চেয়ে বৃটিশ জেনারেল গ্লাবের ক্ষমতা বেশী। সৌদী আরবের অবস্থা আলাদা। সেখানে আছেন সামন্ততন্ত্রী বাদশা সৌদী। বৃটেনের অকৃত্রিম বন্ধু তিনি। কিন্তু সৌদী ঘোরতর ফয়জল-হুসেন বিদ্বেষী। তাঁর বাবা ইবন সৌদ হাশেমাইত বংশের বাদশাকে তাড়িয়ে পত্তন করিছেলেন সৌদী আরব। সৌদী বংশ ওয়াহবি ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা। হাশেমাইতদের উপর তাদের জাতক্রোধ। নাসেরের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবে সবাই আতঙ্কিত। কিন্তু এই আতঙ্ক নিরসনের জন্যে সৌদী কিছুতেই হাশেমাইত বংশধর জর্ডন এবং ইরাকের বাদশাদের সঙ্গে হাত মেলাবে না। সিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল। নাসের তাদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমী ঘেষা কোন সরকারের সেখানে টিকে থাকা অসম্ভব।

১৯৫৫ সালে স্বাক্ষরিত হল সোভিয়েট বিরোধী বাগদাদ চুক্তি। তুরস্ক, ইরাক, পাকিস্তান, ইরাণ এবং বৃটেন তার শরিক। আমেরিকা প্রধান পৃষ্ঠপোষক। নাসের রেগে ফেটে পড়লেন। তিনি বললেন, মিশর এবং আরবীয় রাষ্ট্রগুলোর ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা তারা নিগৃহীত এবং শোষিত। আরব দুনিয়াকে পশ্চিমী প্রভাব মুক্ত করতে না পারলে জনসাধারণের দুর্দ্দশা ঘুচবে না। সুয়েজ পাহারার জন্য আগেভাগেই তৈরী হয়েছে ইস্রাইল। ইরাক বৃটিশ তাবেদার। তার তৈলসম্পদ ইংরাজের হাতে। ইরাকী সরকার পশ্চিমী স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। সোভিয়েট রাশিয়া বহুদূরে। ইরাকের সঙ্গে তার কোন সীমান্ত নেই। ইরাককে বাগদাদ চুক্তিতে টেনে আনা হল কেন? প্রশ্ন করলেন নাসের। উত্তর দিল ইরাকী জনসাধারণ—ধ্বংস কর, বৃটিশ দালালদের। কায়রো বেতার ইরাকী শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। জর্ডন বাগদাদ চুক্তিতে সই দিতে উদ্‌গ্রীব ছিল। কিন্তু জনতার চাপে বাদশা পিছিয়ে গেলেন। বাগদাদ চুক্তির দু'মাস পরেই নাসের সম্পাদন করলেন পাল্টা মৈত্রী-চুক্তি। মিশর, সিরিয়া এবং সৌদী আরব তার শরিক। নাসেরের প্রভাব উর্দ্ধমুখী। এডেন থেকে আলেপ্পো পর্যন্ত দোকানে, রেস্তরায়, ট্যাক্সিতে, স্কুল এবং কলেজের দেয়ালে তাঁর ফটো ঝুলছে। জনতার বিশ্বাস, এতদিন পর তারা নেতার মত একজন নেতা পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার হিম্মত রাখেন একমাত্র নাসের। জাতীয়তাবাদী আরবের আশীর্বাদ নিয়ে এপ্রিল মাসে (১৯৫৫) নাসের বান্দুং সম্মেলনে যোগ দিতে রওনা হলেন। নেহরু, চৌ-এন-লাই প্রমুখ প্রবীণ নেতারা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে তিনি বুঝলেন, বয়সে নবীন হলেও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তিনি কারও চেয়ে ছোট নন। প্রবীণ এশীয় নেতারা তাঁকে নিজেদের সমতূল্য বলে মনে করছেন। নেহরু

তাঁর মনে দাগ কেটেছিলেন। জোট-নিরপক্ষ নীতি তাঁর ভাল লাগত। বান্দুং এর পর এ নীতি হল নাসেরের প্রধান অবলম্বন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, জোট-নিরপেক্ষতা ছাড়া উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। পরবর্ত্তীকালে নেহরু, নাসের এবং টিটো হয়েছিলেন জোট-নিরপেক্ষতার তিন স্তম্ভ।

আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বান্দুং থেকে ফিরে এলেন নাসের। বৃটেনের দাম্ভিকতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর মনে বৃটিশ বিরোধিতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এন্থনী ইডেন। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইডেন ব্যাঙ্ককের পথে অল্পক্ষণের জন্য থেমেছিলেন কায়রোতে। তিনি তখন চার্চিল মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী। ইডেন দেখা করতে চাইলেন মিশরীয় প্রধানমন্ত্রী নাসেরের সঙ্গে। বৃটিশ দূতাবাসে দু'জনের ঘটল সাক্ষাৎকার। ইডেন সোভিয়েট বিরোধী সামরিক জোটের গুণকীর্ত্তন করছিলেন। উত্তরে নাসের বললেন, আরব দুনিয়ায় সোভিয়েট ভীতি নেই। কারণ সোভিয়েট রাশিয়া সেখানে শাসন এবং শোষন করতে আসেনি। যারা এসেছিল তারা চলে গেলে এবং সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে আরবীয় রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠিত হলে কমিউনিজম এখানে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে ইডেনের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে একটা লম্বা বক্তৃতা দিলেন। ভুলে গেলেন তাঁর সামনে বসে রয়েছেন মিশরের প্রধানমন্ত্রী, কোন স্কুলের ছাত্র নয়। নাসের আর একটা কথাও বলার সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না। তিনি এই ধারণা নিয়ে ফিরে এলেন, মিশরে বৃটিশ প্রভুত্বের কবর রচিত হয়েছে, কিন্তু বৃটেনের প্রভুত্বকামী মনের প্রেতাত্মা এই কবরের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে নেহরু গিয়েছিলেন মিশর সফরে। নাসের তাঁর সঙ্গী। মনের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি। নেহরু

মন দিয়ে শুনেছিলেন তাঁর কথা। তিনি কখনই তাঁকে বুঝতে দেন নি যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নাসের নবাগত। আলোচনা চলেছিল সমানে-সমানে। নেহরু তাঁকে বলেছিলেন—মিশর এবং ভারত সমদুঃখী। তারা একই পথের পথিক। পশ্চিমী শোষনে উভয় রাষ্ট্রই রিক্ত এবং জাতীয় মর্যাদাবর্জিত। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং হৃত মর্যাদা উদ্ধার উভয়েরই একান্ত কাম্য। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়। বিপদের দিনে মিশর যদি ভারতের সাহায্য চায় বিনা দ্বিধায় ভারত তার পাশে এসে দাঁড়াবে। অগ্রজ প্রতিম নেহরুর কথায় অভিভূত হয়েছিলেন নাসের। বৃটিশ নেতা ইডেন এবং ভারতীয় নেতা নেহরু—এ দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর সামনে।

মিশব-ইস্রাইল সীমান্তে ইতস্তত সংঘর্ষ চলছে। গাজা থেকে মিশরীয় গেরিলারা ইস্রাইলে হানা দিচ্ছে। ইস্রাইল দ্বিগুণ বিক্রমে প্রতিশোধ নিচ্ছে। রাত্রিতে ইস্রাইলী সৈন্তরা মিশরীয় সীমান্ত এলাকায় ঢুকে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছে। তারা বেপরোয়া গুলি চালাচ্ছে! প্রতিদিন নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। জর্ডন এবং সিরীয় সীমান্তে ইস্রাইলী হানার বিরাম নেই। মিশরের জনতা ইস্রাইলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার দাবী জানাচ্ছে। সৈন্যবাহিনী চঞ্চল। ১৯৪৮ সালের পরাজয়ের গ্লানি তারা ভুলতে পারছে না। নাসের লড়াইএ নামতে রাজী নন। তাঁর প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। নিজের ঘর গুছিয়ে নেবার আগে লড়াই-এ মেতে ওঠার পরিণাম তিনি জানেন। আধুনিক যুগের যুদ্ধ সামগ্রিক যুদ্ধ। জয়লাভ করতে হলে প্রয়োজন অর্থনৈতিক কাঠামোর শক্ত বনিয়াদ। এ বনিয়াদ তৈরী হয় নি। জনতা এবং সৈন্যবাহিনীর দাবী এড়ান কঠিন। গেরিলাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাদের দিয়ে ইস্রাইলে হানাদারী চালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এ কাজটা চলবে

গোপনে। মিশর প্রকাশ্যে কোন দায়িত্ব স্বীকার করবে না। ইস্রাইলের চক্ষুলজ্জা নেই। হানাদারীর জন্য প্রকাশ্যেই সে সৈন্যদল পাঠাচ্ছিল। প্রত্যেকটি মিশরীয় হানাদারীর জবাবে তারা ব্যাপক হানাদারী চালাচ্ছিল। জনরোষ কিছুটা শান্ত। ইস্রাইলের আগ্রাসী মতিগতিতে নাসের উদ্বিগ্ন।

ফ্রান্স ভয়ানক চটেছিল। আলজিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছিল। তাদের নেতা বেনবেলাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নাসের। বিদ্রোহীরা পাচ্ছিল সামরিক সাহায্য। মিশর দিত তাদের অস্ত্রের জোগান। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মলে এবং ইস্রাইলের বেন গুরিয়ন পরস্পরের বন্ধু। উভয়েই সমাজতন্ত্রী বলে কথিত এবং নাসের বিরোধী। নাসেরকে শায়েস্তা করতে মলে এবং গুরিয়ন সমভাবেই আগ্রহী। ১৯৪৮ সালে আরব-ইস্রাইলের লড়াই-এর পর বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা এক ত্রিদলীয় চুক্তি করেছিল। তারা এ বিবদমান পক্ষ দু'টির মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখবে। কাউকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না। কিন্তু ১৯৫৪ সালেই ফ্রান্স এ চুক্তি ভেঙ্গেছিল। ইস্রাইলকে সে জঙ্গীবিমান দিয়েছিল। আমেরিকার গোপন নির্দ্দেশে পশ্চিম জার্মানীও ইস্রাইলকে অস্ত্র পাঠাচ্ছিল।

নাসের আমেরিকার কাছে অস্ত্র চাইলেন। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার রাজী হলেন না। অস্ত্রের জন্য তিনি বৃটেনের দরজায় মাথা কুটলেন। প্রধানমন্ত্রী ইডেন অনড়। তিনি তাঁকে অস্ত্র দেবেন না। এদিকে ইস্রাইল শক্তশালী হয়ে উঠছে। তার হানাদারীর তীব্রতা বাড়ছে। সোভিয়েট রাশিয়া নাসেরকে অস্ত্রসাহায্য করতে ইচ্ছুক। সিরিয়া ইতিমধ্যেই সোভিয়েট অস্ত্র সংগ্রহ সুরু করেছে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোকে নাসের খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন, তারা অস্ত্র না দিলে মিশর সোভিয়েট রাশিয়ার অস্ত্র নেবে। ইডেন এবং আইসেন হাওয়ার মনে করলেন,

ওটা একটা ধাপ্পা। তাঁরা মিশরকে শায়েস্তা করার সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। আরব দুনিয়ায় নাসেরের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তায় বৃটেন এবং আমেরিকা চিন্তিত। তাঁর জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রী ভাবধারা পশ্চিম এশিয়ায় তাঁদের তৈল স্বার্থের পরিপন্থী। ইস্রাইল পশ্চিমের হাতের লগুড়। তা দিয়ে নাসেরকে পিটোতে পারলেই মিশর সংযত থাকবে। তাঁর অসহায় অবস্থায় মনে মনে খুশী হচ্ছিলেন ইডেন এবং আইসেন হাওয়ার। ফ্রান্স নিশ্চিন্ত বসে ছিল না। আলজেরিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে মিশরের প্রকাশ্য আন্দোলন বরদাস্ত করতে সে রাজী নয়। ফরাসী সরকারও চান প্রতিশোধ। এই প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা আছে কেবল মাত্র ইস্রাইলের। ফরাসী ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র চালান হতে লাগল সেখানে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে সম্পাদিত হল মিশর-সোভিয়েট গোপনচুক্তি। জুলাই থেকে প্রাগের মাধ্যমে সুরু হল মিশরে সোভিয়েট অস্ত্র সরবরাহ। ২৭শে সেপ্টেম্বর সবাই জানতে পারল মিশর-সোভিয়েট অস্ত্র-চুক্তির কথা। পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়কেরা আর্তনাদ করে উঠলেন। সংবাদপত্রগুলো তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আরবীয় জনতা বুঝল নাসের সত্যিই তাদের বন্ধু। তা না হলে মিশরের উপর বৃটেনের এত রাগ কেন? আরবের স্বার্থ যারা দেখেন বৃটিশ সরকার তাঁদের উপরেই মনের ঝাল মেটান। আরবের সাধারণ মানুষের কাছে নাসেরের মর্যাদা আরও বেড়ে গেল।

এবার ইস্রাইলী সরকারের উদ্বিগ্ন হবার পালা। মিশর কি পরিমাণ সোভিয়েট অস্ত্র পাচ্ছে তা তাঁদের জানা নেই। প্রধানমন্ত্রী ছুটে গেলেন ফ্রান্সের কাছে। ফরাসী সরকার ইস্রাইলকে আধুনিক জঙ্গী-বিমান, জঙ্গী বোমারু-বিমান এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৯৫৫ সালের ১৯শে অক্টোবর গড়ে উঠল মিশর-সিরিয় যৌথ সামরিক

কম্যাণ্ড। বেন গুরিয়নের নেতৃত্ব গঠিত ইস্রাইলী মন্ত্রীসভা আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের জন্য উৎসুক হয়ে পড়লেন। চীফ অফ স্টাফ জেনারেল দেয়ান প্রধানমন্ত্রী গুরিয়ানকে লিখলেন, একমাসের মধ্যেই তিরান প্রণালী দখল করা দরকার।

আমেরিকা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তার ভাবনা, পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েট অনুপ্রবেশ ঘটছে। নাসেরকে খুশী করতে না পারলে এর গতিরোধ করা যাবে না। আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্য তখনও টিকে আছে। মিশরের মাধ্যমে সেখানেও সোভিয়েট প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় নাসেরকে তোষন ছাড়া গতি নেই। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ মিশরের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। এ পরিকল্পনা কার্যকর হলে মিশরীয় কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আসবে। শিল্প এবং গ্রামাঞ্চলের চেহারা পাল্টে যাবে। আমেরিকা এবং বৃটেন আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের খরচ জোগাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন নাসেরকে। ফ্রান্স এগিয়ে এসে বলল, মিশর যদি আলজেরিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যদানে বিরত থাকে এবং তাদের পক্ষে প্রচার বন্ধ করে তবে ফ্রান্স তার কাছে অস্ত্র বেচবে। সাম্রাজ্যবাদের অবসান নাসেরের বিপ্লবের অঙ্গ। আদর্শের বিনিময়ে ফরাসী অস্ত্র গ্রহণে তিনি অসম্মত।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ইডেন বাগদাদ চুক্তির সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। একমাত্র ইরাক ছাড়া অন্য কোন আরব রাষ্ট্র এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয় নি। জর্ডন ইংরাজের হাতের মুঠোয়। তাঁকে দিয়ে হয়ত সই করান সহজ। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল টেম্পলার গেলেন আম্মানে। জনসাধারণ ক্ষেপে উঠল। তারা ভাবল, বাগদাদ চুক্তির স্বপক্ষে ওকালতির জন্য বৃটিশ জেনারেল এসেছেন জর্ডনে। কায়রো বেতার গর্জে উঠল। আম্মানের রাস্তায় সুরু হল বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ এবং হাঙ্গামা। পর পর তিনটি সরকারের উত্থান

পতন ঘটল। নূতন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, জর্ডন কখনই বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে না। নাসেরের জয়ধ্বনিতে আরবের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠল। দ্বিগুণ উৎসাহে কায়রো বেতার ইরাকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। বৃটেনের রক্ষণশীল মহলের ধারণা, জর্ডনের আসল কর্ত্তা গ্লাব পাশা। হুসেন নামেমাত্র বাদশা। হুসেনকে মসনদ থেকে টেনে নামাবার পরামর্শ দিতে লাগলেন তারা গ্লাব পাশাকে। দু একটি রক্ষণশীল পত্রিকা তাদের সঙ্গে সুর মিলালেন। খবরটা গেল বাদশা হুসেনের কানে। তাঁর রাজমর্যাদায় আঘাত লাগল।

মার্চ মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলয়েন লয়েড এসেছিলেন কায়রোতে। ভোজে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে নাসের। আহার শেষ হবার আগেই খবর এল, জর্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ধ্বসে পড়েছে। গ্লাব পাশা পদচ্যুত। লয়েড ভাবলেন, গ্লাব পাশার ভাগ্য বিপর্যয় নাসেরের চক্রান্তের ফল। কায়রো থেকে বাহরেনে গেলেন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে সুলতানের বৃটিশ উপদেষ্টা স্যার চার্লস বেলগ্রেভের বিরুদ্ধে চলছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। জনতার মুখে নাসেরের জয়ধ্বনি। কায়রো বেতার বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানাচ্ছিল। বৃটেন এবং ফ্রান্স দিশাহারা। ভীতি প্রদর্শন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি—কোন কিছুতেই নাসের শান্ত হচ্ছেন না। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভিযানের বিরাম নেই। ভয়েস অফ আরব (কায়রো বেতার) আগুন ছড়াচ্ছে। নিবৃত্তির কোন লক্ষণ নেই।

নাসের-বিভীষিকা নিয়ে ফিরলেন সেলয়েন লয়েড। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছুটলেন মিশরে। তিনি নাসেরকে বললেন, আলজেরিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন না করলে ফ্রান্স মিশরের কাছে অস্ত্র বেচবে। নাসের তাঁকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মলে ইস্রাইলকে জানালেন—অস্ত্রের অভাব তার

হবে না। বৃটেন মিশরে প্রতিবিপ্লবের কথা ভাবতে লাগল। সিরিয়া সরকার নাসের সমর্থক। ইরাকের মাধ্যমে সে নির্বাসিত সিরিয়দের দেশে ফেরার আমন্ত্রণ জানাল। প্রতিবিপ্লবের জন্য অস্ত্র এবং অর্থ জোগাতে বৃটেন তৈরী। বৃটিশ এজেন্টরা মিশরের রাজতন্ত্রী এবং নাগিব পন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। নাসেরকে ইরাণের মোসাদিক করার জন্য তারা উঠে-পড়ে লাগল। নাসের উচ্ছেদের পর ফারুকের পুত্র ফুয়াদকে (দ্বিতীয়) সিংহাসনে বসিয়ে মিশর শাসন ছিল বৃটিশের পরিকল্পনা। এ ষড়যন্ত্র কার্যকর করতে হলে মার্কিন সাহায্য দরকার। ইরাণে মোসাদিক উচ্ছেদের পরিকল্পনা এঁটেছিল সি আই এ। ইরাণী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অজস্র টাকা বিলিয়েছিল তারা। তেহারণের রাস্তায় হাঙ্গামা বাধাবার জন্য গুণ্ডাদের পকেটে টাকা পুরে দিয়েছিল সি আই এ এজেন্টরা। পলাতক জেনারেল জাহিদী যথাসময়ে বিদ্রোহী সৈন্যদল নিয়ে হানা দিয়েছিলেন রাজধানীতে। শাহ-এর যোগসাজসেই ঘটেছিল এসব ঘটনা। জেনারেল জাহিদী যখন রাজধানী আক্রমণ করছিলেন তখন বিমান ঘাঁটিগুলো বৃটিশ এবং মার্কিন বিমানে ভর্তি ছিল। জঙ্গী-বিমানের ওঠানামার পথ একেবারে বন্ধ। ইরাণে মোসাদিকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের গতি থেমে গিয়েছিল। এই নাটকের পুনরাবৃত্তির স্বপ্ন দেখছিল বৃটেন। মিশরের সৈন্যবাহিনীর নেতারা ফ্রী অফিসার। তাঁরা রাজনীতি সচেতন। মাত্র চার বছর আগে তাঁরা ফারুক-উচ্ছেদ করেছেন। উৎকোচে ভুলবার পাত্র তাঁরা নন। তবু বৃটিশ চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পশ্চিম এশিয়ায় তাদের অনুসৃত দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক প্যাটার্ণ ইংরাজ ভুলতে পারছিল না। দুনিয়াটা পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টায়নি শুধু সনাতনী বৃটিশ মনোবৃত্তি।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মলে এলেন লণ্ডনে। ইডেনের সঙ্গে চলল তার গোপন সলাপরামর্শ। ফ্রান্স বাগদাদ চুক্তির বিরোধী। পশ্চিম

এশিয়ায় যে সব অঞ্চলে এক সময় ছিল ফরাসী আধিপত্য, বাগদাদ চুক্তির ফলে সেখানে ঘটছে বৃটিশ অনুপ্রবেশ। ভাল লাগেনি ফ্রান্সের। আলজেরিয়ায় ফরাসী বর্বরতা ইংরাজ ভাল চোখে দেখেনি। কারাগারে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ফরাসী নির্যাতনের কাহিনী হামেশাই প্রকাশিত হ'ত বৃটিশ পত্র-পত্রিকায়। ফরাসী এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে হয়ে গেল একটা বোঝাপড়া। আলজেরিয়ার প্রশ্নে ফ্রান্সকে সমর্থন করবে বৃটেন এবং বাগদাদ চুক্তির সমালোচনায় বিরত থাকবে ফ্রান্স। তারপর ঘন ঘন চলল বৃটিশ এবং ফরাসী মন্ত্রীদের মধ্যে দেখা সাক্ষাত।

ফ্রান্স এবং ইস্রাইলের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠল। ইস্রাইলের অস্ত্রাগারে ফরাসী অস্ত্র জমতে লাগল। বৃটেনে মিশর-বিদ্বেষ মারমুখি রূপ নিল। পশ্চিম এশিয়ায় যেখানেই জাতীয়-তাবাদের ধাক্কায় বৃটিশ বেসামাল হত সেখানেই তারা নাসেরের ছায়ামূর্ত্তি দেখত। মিশর এবং ইরাকের বেতার যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ল। ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং বৃটিশ রক্ষণশীল দলের গন্যমান্য নেতারা একযোগে বলতে লাগলেন—নাসের ক্ষুদে হিটলার। মে মাসে (১৯৫৬) নাসের কমিউনিস্ট চীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। জুন মাসে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেপিলভ এলেন কায়রোতে। মিশর সরকার তখন সুয়েজ এলাকা থেকে বৃটিশবাহিনীর অপসারণ উৎসবে ব্যস্ত! কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলো থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র মিশর পেয়েছে তার প্রদর্শনীও চলল। চারদিকে গেল গেল রব উঠল। রক্ষণশীল ইডেনের দৃষ্টিতে নাসের হলেন কমিউনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রী দলের বিশ্লেষণে তিনি বললেন, ক্ষুদে হিটলার। আমেরিকা ভাবল, নাসের এবং নাসেরবাদ পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন তৈল-স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক। ১৮ই জুলাই ডালেস মিশরের রাষ্ট্রদূত আমেদ হুসেনকে জানিয়ে দিলেন, আমেরিকা আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করেছে। দুদিন পর বৃটেনও তার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার

করে নিল। বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এ দুটি রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরশীল। বৃটেন এবং আমেরিকা যখন আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে সাহায্য দিতে অস্বীকার করল তখন বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতির আর কোন দাম রইল না।

সত্তের

নাসেরের বয়স মাত্র ৩৮ বছর। সুয়েজ খালের তুলনায় আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনা তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়। মিশর আয়তনে বড় হলেও আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ষাট লক্ষ একর। বাকী সব মরুভুমি। দু কোটি চল্লিশ লক্ষ নরনারীর অধিকাংশ এই জমি অবলম্বন করেই কোনমতে বেঁচে আছে। ১৯৪৪ সালে জনসংখ্যা বেড়ে হয়ত হবে ছ' কোটি। এরা খাবে কী? আসোয়ান বাঁধ তাদের ভবিষ্যত। এর নির্মাণ ব্যাহত হলে মিশরের বিপ্লব হয়ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। যে ভাবেই হোক টাকা জোগাড় করবেন নাসের। আসোয়ান বাঁধ তাঁর চাই। ১৯৪২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার মাইলস ল্যাম্পসন গায়ের জোরে ঢুকেছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান বাদশা ফারুকের চেম্বারে। জাতির অপমানে ক্ষেপে উঠেছেল তরুণ অফিসাররা। বৃটিশ বিতাড়নের সঙ্কল্প নিয়েছিল তারা। আবার মিশরের ভাগ্যে জুটেছে দ্বিতীয় অপমান। অপরাধী সেই পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি—সঙ্গে আমেরিকা। ২৬শে জুলাই আলেকজান্দ্রিয়ার এক বিরাট জনসভায় নাসের ঘোষণা করলেন, তিনি সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খালের আয় দিয়ে তিনি বানাবেন আসোয়ান বাঁধ। আনন্দে অধীর হয়ে উঠল জনতা। সারা বিশ্বের চমক লাগল। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর প্রগতিবাদী জনমত তাকে সমর্থন জানাল। এশিয়া এবং আফ্রিকা আওয়াজ তুলল—নাসেরের

পথ, আমাদের পথ। রাগের মাথায় নাসের হুকুম দিলেন, সুয়েজ কোম্পানীর কর্মীদের মধ্যে যারা চাকুরী ছাড়বে তাদের কারাগারে পাঠান হবে। দেশী-বিদেশীর বাছ-বিচার থাকবে না। ছ'দিন পরেই তিনি তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করলেন। পাইলট এবং অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে যারা সুয়েজে ছাড়তে চায় তারা বিনা বাধায় চলে যেতে পারবে।

ভোজে ব্যস্ত ছিলেন ইডেন। তার পাশে বসেছিলেন ইরাকের বাদশা ফয়জল এবং প্রধান মন্ত্রী নূরী-এস-সৈয়দ। এমন সময় খবর এল, নাসের সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্ত করেছেন। ইডেন দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন। নূরী উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলেন—কঠিন আঘাত হানতে হবে। দেরী করলে চলবে না। অতিথিরা চলে যাবার পর ইডেন গোপন-বৈঠকে বসলেন। জর্ডন থেকে গ্লাব পাশার বিতাড়নের পর এমন আঘাত বৃটেন পায় নি। সুয়েজ কোম্পানীর শতকরা ৪৫ ভাগ শেয়ার বৃটেনের হাতে। এ খাল দিয়েই যাতায়াত করে বৃটিশ তৈলবাহী জাহাজ। ইংরাজের মনে বদ্ধমূল ধারনা, আফ্রো-এশিয়ার লোকগুলোকে চোখ রাঙালেই তাদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু নাসের পাল্টা চোখ রাঙাচ্ছেন এখন ইংরাজকে। পশ্চিম এশিয়ায় বৃটিশ মর্যাদার উপর এত বড় আঘাত সহ্য করা ইডেনের পক্ষে অসম্ভব।

কমন্সসভায় শ্রমিক দলের দক্ষিণপন্থী নেতা গেইট স্কেল রাষ্ট্র-সংঘের মাধ্যমে নাসেরের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার দাবী জানালেন। অনেকের সন্দেহ, তিনি তাঁর ইহুদী স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বৃটিশ পত্রিকাগুলো নাসেরের রক্তের জন্যে পাগল হয়ে উঠলেন। নিউজ ক্রনিক্‌ল লিখলেন—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতিশোধ নিলে অন্যায় কিছু হবে না। মিরারের বক্তব্য—নাসের একবার মুসোলিনির ভাগ্য স্মরণ করুন। হেরল্ড বললেন—আর হিটলার নয়। টাইমস সবার উপর টেক্কা দিলেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তারা আগুন ছড়াতে লাগলেন। গার্ডিয়ান কিছুটা সংযত রইলেন।

খবর এল, কায়রোর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর বিশলক্ষ পাউণ্ড মিশরীর সরকার হস্তগত করেছেন। ২৭শে জুলাই বৃটিশ মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল। বিশেষ আমন্ত্রণে সেখানে হাজির ছিলেন সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখার সেনাপতিরা। বৈঠক শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের কাছে তার করলেন ইডেন —আমরা নাসেরকে এভাবে সুয়েজ খালের দখল দিতে পারি না। আমরা যদি রুখে দাঁড়াই তবে দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রর সমর্থন পাব। আমরা যদি নিষ্ক্রিয় থাকি তবে পশ্চিম এশিয়ায় বৃটিশ এবং মার্কিন প্রভাব একেবারে ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। আমরা প্রথমে নাসেরের উপর প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করব। প্রয়োজন হলে শেষ পর্যন্ত শক্তির দ্বারা তাঁর সম্বিত ফিরিয়ে আনব। বৃটেন তৈরী। আমি সেনাপতিদের সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দ্দেশ দিয়েছি।

ইডেনের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। রাত্রে তাঁর ঘুম হত না। সঙ্গে সব সময় অযুধের বড়ি থাকত। যখন তখন তিনি তা খেতেন। পৃথিবীর সর্বত্র তিনি দেখতেন অশান্তি। বৃটেনের গৌরব যুগের মধ্যে কাটিয়েছেন ইডেন। আজ তিনি প্রধানমন্ত্রী। আর তাঁর চোখের সামনেই প্রাক্তন প্রজাদের কাছে মার খাচ্ছে বৃটেন। কেনিয়ায় সুরু হয়েছে মুক্তি সংগ্রাম। মাউ মাউ বিদ্রোহ দমনের নামে চলছে সেখানে অকথ্য অত্যাচার। সাইপ্রাসে গ্রীক সিপ্রিয়টরা নেমেছে গেরিলা লড়াই-এ। আর্চ বিশপ মাকারিউস নির্বাসিত। বৃটিশ সরকার এবং পত্রিকাগুলো যাদের বলেন ডাকাত, কায়রো বেতার তাদেরই বলছে মুক্তিযোদ্ধা। এদের সমর্থনে ভয়েস আরব উদ্দাম। ইডেন ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। কারও কথা শুনতে তিনি রাজী নন। মন্ত্রীসভায় তিনি ডিক্টেটর। তাঁর মতামতই চূড়ান্ত। মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়েন ইডেন। বড়ি খেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। নাসের তাঁকে পাগল করে

তুলেছেন। উইনস্টন চার্চিল ক্ষিপ্ত। তিনি ৩০শে জুলাই ইডেনের সঙ্গে দেখা করলেন। ভদ্রভাষাটা পর্যন্ত চার্চিল ভুলে গেলেন। তিনি বললেন—প্রাচ্যের সঙ্গে বৃটেনের যোগষোগ ব্যবস্থার উপর এই শুয়োরটাকে (নাসেরকে) বসে থাকতে দিতে পারি না। মিশরে সৈন্য পাঠিয়ে স্পষ্টই তাঁকে বলতে হবে—সুয়েজ খাল সম্পর্কে তোমার বেপরোয়া মনোভাব না পাল্টনো পর্যন্ত বৃটিশসৈন্য সেখানে থাকবে। রক্ষণশীল দলের সুয়েজ গ্রুপের নেতা জুলিয়ান আমেরী। সুয়েজ খাল এলাকা থেকে বৃটিশসৈন্য অপসারণে তিনি আপত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বৃটিশসৈন্য সুয়েজ ছাড়লেই ওটা একদিন মিশরের সম্পত্তি হয়ে যাবে। তাঁর ভবিষ্যতবাণী যে কত সত্য তা প্রমাণের জন্য তিনি এবং তাঁর সমর্থকরা ওঠে পড়ে লাগলেন। ইডেনের শেষ পক্ষের স্ত্রী আবার চার্চিলের ভাইঝি। সমরনেতা হিসাবে চার্চিলের মতই তাঁর স্বামীর নাম চার দিকে ছড়িয়ে পড়ুক আন্তরিক ভাবে তিনি তা চাচ্ছিলেন। পিছন থেকে ইডেন-ঘরণী ইউনকে উস্কে দিচ্ছিলেন। এতসব উত্তেজনার মধ্যে ইডেন মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেললেন।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মলে আর এক ডিগ্রী উপরে। আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে মিশরের সমর্থনের প্রতিকার তিনি চান। আরবদের সঙ্গে বোঝাপড়ার আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। ইস্রাইলের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা দিন দিন বাড়ছে। মিশরে সামরিক অভিযান চালাবার জন্য মলে অনবরত ইডেনের উপর চাপ দিচ্ছেন। বৃটেনের জনমত বিভক্ত। ইডেনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন বেভান। তাঁর দাপটে গেইট স্কেল পিছু হটেছেন। আমেরিকা সাড়া দিচ্ছে না। বৃটিশ সামরিক প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। ইডেন ইতস্তত করছেন।

আইনের প্রশ্ন জটিল। ১৮৮৮ সালের কনভেনশনে বলা হয়েছে—শান্তি এবং যুদ্ধের সময়. প্রত্যেক জাতির জাহাজ সুয়েজখাল দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। এমন কি

যুদ্ধ জাহাজও কেউ আটকাতে পারবে না। এই কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী ছিল বৃটেন, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড, রাশিয়া এবং তুরস্ক। মিশর এ সময় ছিল তুরস্কের অধীন। সুতরাং তার স্বাক্ষরের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া এই খালটিকে কোন অবস্থাতেই স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কেউ অবরোধ করতে পারবে না। খালের পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় কিম্বা তার তু'মুখের তু'টি বন্দরে কেউ সৈন্য এবং যুদ্ধসরঞ্জাম নামাতে পারবে না। সুয়েজের তু'পারে কোন স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি বানান কিম্বা সৈন্য সমাবেশ চলবে না। সুয়েজ খাল মিশরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৫৪ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তিতেও সুয়েজ খালকে মিশরের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকার করা হয়েছে। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী মিশরে রেজিষ্ট্রীকৃত। নাসের কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্ত করেছেন। সুয়েজ খালের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তিনি মেনে নিয়েছেন। ১৮৮৮ সালের কনভেনশন তিনি ভাঙ্গেন নি! সুয়েজ কোম্পানীকে তিনি ক্ষতিপূরণ দিতেও তিনি রাজী হয়েছেন। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে মিশরে রেজিষ্ট্রীকৃত যে কোন কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্ত করার আধিকার তাঁর আছে। সুয়েজ দিয়ে ইস্রাইলী জাহাজ চলাচল মিশর বন্ধ করেছে। বৃটিশসৈন্য সুয়েজ এলাকায় থাকাকালীন তা ঘটেছে। ইস্রাইল আইনত মিশরের সঙ্গে যুদ্ধরত রাষ্ট্র, নিরাপত্তার খাতিরে মিশর সরকার তার এলাকায় শত্রুপক্ষের জাহাজ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। তা নিয়ে বিতর্কের অর্থ, মিশরের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার। বৃটেন নিজেও ১৮৮৮ সালের কনভেনশন মানে নি। পর পর তুটি মহাযুদ্ধে সে সুয়েজ অবরোধ করে রেখেছিল। সুয়েজের তু'পারে দীর্ঘদিন বৃটিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। জোর করে তাদের না তাড়ালে তারা চলে যেত না।

আমেরিকারও বলার কিছু নেই। ১৯০১ সালের হেপাউন চেফোটে চুক্তি অনুযায়ী পানামা খালে যুদ্ধ কিম্বা শান্তির সময় যে কোন রাষ্ট্রের জাহাজ চলাচলের অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু আমেরিকা পানামা খাল অঞ্চল দখল করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এখাল মার্কিন স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত হত।

১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী কিয়েল খালে সর্ব জাতির জাহাজের অবাধ যাতায়াতের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে জার্মানী এ চুক্তি বরবাদ করেছিল। কেউ তখন তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদের কথা কল্পনায়ও আনে নি। এ অবস্থায় সুয়েজ সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হলে কিম্বা আন্তর্জাতিক আদালতে গেলে তার ফল কি হবে সে-সম্পর্কে বৃটিশ সরকার নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বৃটেন ভালভাবেই জানত, মিশরের স্বার্থের খাতিরেই সুয়েজ খালের স্বাভাবিক পরিচালনায় নাসের বাধা দেবেন না। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর কাছে রাষ্ট্রায়াত্ত কথাটিই খারাপ। তা যদি আবার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোর নায়কদের মুখ থেকে আসে তবে তো কথাই নেই। সুয়েজ কোম্পানী নিয়ে নাসের যা করছেন তা যদি অব্যাহত থাকে তবে আরব তুনিয়ার বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলোও হয়ত একদিন জাতীয়তাবাদী দেশী সরকারগুলোর হাতে চলে যাবে। ইরাণে মোসাদিক যা পারেন নি, মিশরের প্রেরণায় অন্যেরা হয়ত তা পারবে। যারা পারবে না তারা তেলের রয়েলটি বাড়াবার দাবী জানাবে। বৃটিশ সরকার নিজের দেশে কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প রাষ্ট্রায়াত্ত করেছেন। মিশরের বেলায় তাদের যত আপত্তি। বৃটিশ জনসাধারণের প্রগতিবাদী অংশ জানে, তুনিয়ার জনমত বৃটিশ স্বার্থে পরিচালিত হয় না। গানবোট ডিপ্লোমেসি বর্ত্তমান যুগে অচল। এ ধরণের ডিপ্লোমেসি চালাবার ক্ষমতাও বৃটেনের নেই। ইডেন পুরনো দিনের নেতা। তিনি এ পরিবর্তন মানতে রাজী নন।

রাষ্ট্রায়াত্ত করার পর নাসের যদি সুয়েজখাল চালাতে না পারেন তবে হস্তক্ষেপের হয়ত একটা অজুহাত পাওয়া যাবে। এ সুযোগ আসার ঢের দেরী। নাসের সুয়েজ কোম্পানীর কর্মী এবং পাইলটদের রাখতে রাজী। মিশরের তত্ত্বাবধানে তারাই খাল পরিচালনা করবেন। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৪ সালে সুয়েজ কোম্পানীর মেয়াদ শেষ হবার কথা। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই খাল পরিচালনার দায়িত্ব মিশরের উপর বর্তাবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মেয়াদ শেষ হবার আগেই নাসের সুয়েজ খাল হাতে নিয়েছেন। সার্বভৌম রাষ্ট্রের নায়ক হিসাবে এ ব্যবস্থা গ্রহণের তিনি অধিকারী। আইনের পথ পরিষ্কার নয়। অথচ মিশরকে শায়েস্তা করা দরকার। দুটি ব্যবস্থা এখন বৃটিশ সরকারের সামনে খোলা রয়েছে—নাসের উচ্ছেদ কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে সুয়েজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ। নাসেরের সম্মতি ছাড়া দ্বিতীয় প্রস্তাব কার্যকর করার উপায় নেই। অনেকের মাথায় এক উদ্ভট পরিকল্পনার দানা বেঁধে উঠল। উগাণ্ডায় নীলনদের উৎসমুখে বাধা সৃষ্টি করে মিশরকে সেচের জল বঞ্চিত করতে হবে। তাহলেই নাসের বাগে আসবেন। সম্ভব অসম্ভব সব চিন্তাই ইংরাজের মনে উকিঝুঁকি দিতে লাগল। গোটা জাতিটারই যেন বুদ্ধিভ্রংশ ঘটল।

২৭শে জুলাই বৃটিশ সেনাপতিদের বৈঠক বসল। সুয়েজ অভিযান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলল। তাদের সমস্যা জটিল। বড় বড় জাহাজের নোঙ্গর করার মত কোন বৃটিশ ঘাঁটি মিশরের কাছাকাছি কোথাও নেই। বৃটেনের উপনিবেশগুলোতে বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সাইপ্রাসের গেরিলা লড়াই এবং কেনিয়ার মাও মাও আন্দোলনে বৃটিশ সরকার ব্যতিব্যস্ত। লিবিয়া এবং জর্ডনের বৃটিশ সৈন্যদের অপর কোন আরব রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে ব্যবহার করার ঝুঁকি খুব বেশী। ছত্রীবাহিনী পাঠান ছাড়া ঝট্‌পট্ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। তারও বিপদ আছে। ছত্রীবাহিনী অবতরণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছান আবশ্যক। কিন্তু এই সাহায্য পাঠাবার পথে বাধা অনেক। পরিবহন বিমানের বড় অভাব। শিক্ষিত পাইলটের সংখ্যাও কম। সোভিয়েট রাশিয়া কি পরিমাণ অস্ত্র মিশরকে দিয়েছে তাও অজানা। প্রতিরক্ষা দপ্তরের অনুমান একশ মিগ, একশ মাঝারী ট্যাঙ্ক, এবং অন্ততঃ ত্রিশটি বোমারু বিমান নাসের যুদ্ধে নামাতে পারবেন। তাছাড়া তাঁর হাতে আছে বিমান বিধ্বংসী কামান এবং ট্যাঙ্ক ঘায়েল করার বন্দুক। সোভিয়েট যন্ত্রীরা তাদের যন্ত্রপাতি পরিচালনার ভার নেবে কিনা তাও নিশ্চয় করে জানা যাবে না। জলপথে ছত্রীবাহিনীকে সাহায্য পাঠাতে সময় লাগবে। চীফ অফ স্টাফ স্যার জেরাল্ড টেম্‌প্লার, লর্ড মাউণ্টবেটেন প্রভৃতি সমর নায়কেরা ছত্রীবাহিনী পাঠানোর বিরুদ্ধে। পরের দিন মন্ত্রীসভা জানতে পারলেন, সমর নায়কদের মতামত। সুয়েজ অভিযান পিছিয়ে গেল। সাইপ্রাস, মল্টা এবং এডেনের মিশরীয় গোয়েন্দাদের মারফত এ খবর পেলেন নাসের।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মলের বিশ্বাস, আলজেরিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের পিছনে রয়েছে নাসেরের টাকা, অস্ত্র এবং পরামর্শ। আলজেরিয়ায় ফরাসী শাসন কায়েম রাখতে হলে প্রথমে দরকার নাসের উচ্ছেদ। ফরাসী জনসাধারণের এক প্রভাবশালী অংশ মলের জঙ্গীপনার ঘোরতর বিরোধী। সাধারণ মানুষ ভাবাবেগের দাস। সুয়েজ খাল কেটেছেন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার। সুয়েজ কোম্পানীর সদর দপ্তর প্যারিসে। এ কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন নাসের। তিনি অবশ্যই দুষ্‌মন। মলের কাছে নাসেরের ফিলজফী অফ রেভোলিউশন হিটলারের মাইন ক্যাম্পের দ্বিতীয় সংস্করণ। এই মিশরীয় হিটলারকে ঘায়েল না করলেই নয়। ইডেন তাঁর সঙ্গে

একমত। কিন্তু ফরাসী সমর প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। সমর নায়করা সময় চেয়েছেন। যত ঝামেলা আমেরিকাকে নিয়ে। তাকে কিছুতেই জঙ্গীমতে আনা যাচ্ছে না।

সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়াত্তকরণ নিয়ে আমেরিকা বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না। নভেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আইসেন হাওয়ার নির্বাচনপ্রার্থী। তিনি ভয়ানক ব্যস্ত। আমেরিকার আমদানীকৃত তেলের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ সুয়েজ খাল দিয়ে আসে। ক্যানাল কোম্পানীতে মার্কিন লগ্নীও সামান্য। নূতন প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদেবার জন্য ডালেস গিয়েছিলেন পেরুতে। সেখানেই তিনি শুনলেন, নাসেরের সুয়েজ কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্ত করার কথা। চারদিন পর তিনি ফিরলেন ওয়াশিংটনে। ডালেস মন্তব্য করলেন, যদি সুয়েজ খাল নিয়ে লড়াই-এ নামতেই হয় তবে ল্যাটিন আমেরিকার সম্মতি নেওয়া দরকার। এ ধরণের কূটনৈতিক চাল বৃটেনের কাছ থেকেই তিনি শিখেছেন। বন্ধুরাষ্ট্রের দাবী এড়াতে হলে বৃটিশ সরকার দেন কমন-ওয়েলথের দোহাই, আর মার্কিন কর্তৃপক্ষ দেন ল্যাটিন আমেরিকার দোহাই। এর অর্থ সবাই বোঝে।

৩০শে জুলাই বৃটেন এবং ফ্রান্স পাকাপাকিভাবে মার্কিন মতামত জানতে পারল—যেসব রাষ্ট্র সুয়েজ খাল ব্যবহার করে তাদের সম্মেলন অত্যাবশ্যক। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার আগে শক্তি প্রয়োগ আমেরিকা সমর্থন করে না। এই দিনই লণ্ডনে ফরাসী এবং বৃটিশ সেনাপতিদের যুক্তবৈঠক বসল। সুয়েজ এলাকায় জেনারেল মাসুর অধীনে একটি ছত্রী ডিভিশন এবং আর একটি যান্ত্রিক ডিভিশন পাঠাতে ফ্রান্স রাজী। প্রয়োজন হলে আমেরিকাকে বাদ দিয়েই তারা অভিযান চালাবে! বৃটেনও তাতে গররাজী নয়। বড় ভয় সোভিয়েট রাশিয়াকে। ইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত মারফীকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ

করলেন। ৩১শে জুলাই খাওয়ার টেবিলে তাঁকে বললেন—মিশরে যদি বৃটিশ-ফরাসী যৌথ অভিযান সুরু হয় তবে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর আমেরিকা যেন একটু নজর রাখে! আর তেলের অনটন দেখা দিলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ যেন একটু দয়া করেন। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার কথার মারপ্যাচে অভ্যস্থ নন। তিনি নিজে পানামা খাল নিয়ে বিব্রত। ইউরোপীয় ছাড়া অন্য কেউ সুয়েজ খাল চালাতে পারবে না—এধরণের উন্নাসিকতায় তিনি বিশ্বাসী নন। ৩১শে জুলাই আইসেন হাওয়ার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ইডেনকে চিঠি দিলেন। তিনি খোলাখুলি প্রশ্ন করলেন—সুয়েজ খাল কি আবার দখল করা হচ্ছে? দখলের পর অনির্দ্দিষ্টকাল পর্যন্ত কি বিদেশী দখলদারী সৈন্য ওখানে থাকবে? আবার কি সুয়েজ এলাকায় আগের মতই রক্তারক্তি চলবে? বর্ত্তমান অবস্থায় আমি শক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতী নেই। ডালেসকে লণ্ডনে পাঠাচ্ছি।

সুয়েজে সামরিক অভিযান থামাবার নির্দ্দেশ নিয়ে ১লা আগস্ট ডালেস এলেন লণ্ডনে। তিনি ভাবলেন, দীর্ঘ মেয়াদী আপোষ আলোচনা সুরু করতে পারলেই বৃটেন এবং ফ্রান্সের জঙ্গী মনোভাব কমবে। ডালেস বিশ্বাস করতেন, পশ্চিম এশিয়ায় বৃটেনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যারা এ অঞ্চলের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ দখল করছেন তাঁদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করে চলাই মার্কিন স্বার্থের অনুকূল। তাঁর চোখে সোভিয়েট রাশিয়া এবং কমিউনিজম বিশ্বের শান্তিভঙ্গকারী। অবক্ষয়ী পশ্চিম ইউরোপ এই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। এশিয়ায় বৃটিশ এবং ফরাসী প্রতিমূর্ত্তি পঙ্কিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষক হিসাবে তারা পরিচিত। কমিউনিজম সম্প্রসারণবোধের চেষ্টায় পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো প্রতিবন্ধক। তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা বলেই জাগ্রত আফ্রো-এশীয় চেতনা আমেরিকাকে বিশ্বাস করে না। ইডেন এবং ডালেসের মধ্যে

ছিল সম্প্রীতির অভাব। আফ্রো-এশীয় নেতাদের কাছে পেলে ইডেন যেমন হেডমাস্টার সেজে তাঁদের উপদেশ দিতেন, ডালেসও তেমনি ইডেনকে উপদেশ দেবার সুযোগ ছাড়তেন না। ছুনিয়ার অন্যতম শক্তিমান রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালেস, আর মার্কিন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ইডেন। পদমর্যাদায় ইডেনের স্থান উঁচুতে হলেও ডালেস তাঁকে নিজের সমকক্ষ বলে মনে করতেন না। ডালেস-বিদ্বেষ ইডেনের এত গভীর ছিল যে, তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী না করার জন্য তিনি অযাচিতভাবে এক সময় প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। দিলখোলা আলোচনা এদুজনের মধ্যে না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ফ্রান্স অধীর হয়ে উঠেছিল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সুয়েজে সৈন্য পাঠাতে সে উৎসুক। ডালেসও বাধা দিতে কৃতসঙ্কল্প। ইডেন পড়ে গেলেন ফাপরে। সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের সম্মেলন ডাকলে সময় নষ্ট হবে। আবার আমেরিকার সাহায্য না পেলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। তিনি ডালেসকে বুঝাতে চাইলেন—নাসেরকে না থামালে রাষ্ট্রায়াত্তের সংক্রমণ আফ্রিকায় পৌঁছবে। তার টাল সামলান মুস্কিল হয়ে পড়বে। ডালেস অনড়। তাঁকে কিছুতেই বোঝান যাচ্ছে না। সমস্যার সমাধান দিলেন সৈন্যবাহিনীর নায়কেরা। তারা বললেন—মার্কিন সাহায্য না পেলে ছ' সপ্তাহের আগে তাঁরা অভিযানের জন্য তৈরী হতে পারবেন না। ২রা আগস্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল—আপোষ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রস্তুতি জোর কদমে চলবে। ফরাসী ন্যাশন্যাল এসেমব্লী এবং বৃটিশ কমন্সসভায় সুয়েজ বিতর্ক সুরু হয়েছিল। নাসেরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাবে ফরাসী -সরকার ৮২২—১৫০ ভোটে জিতলেন। কমন্সসভায় ইডেন ঘোষণা করলেন, সুয়েজ খাল কোন একটি রাষ্ট্রের হাতে কোন অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না।

গেইটস্কেল কঠোর ভাষায় নাসেরের উপর আক্রমণ চালালেন। সুয়েজ খালে ইস্রাইলী জাহাজ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মলের মতই তিনি নাসেরকে হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে তুলনা করলেন। তবে রাষ্ট্রসংঘের সনদের বাইরে শক্তি প্রয়োগ না করার জন্য তিনি সরকারকে পরামর্শ দিলেন। উইন্‌স্টন চার্চিল গেইটস্কেলের বক্তৃতায় ভারী খুশী। তিনি বললেন—অতীতে এই দূরদর্শী নেতাকে তিনি ভুল বুঝেছিলেন! গেইটস্কেলের বক্তৃতায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদলে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। অনেকে তাঁর পদত্যাগ দাবী করলেন! গেইটস্কেল ৩রা আগস্ট প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তাঁর বক্তৃতার ব্যাখ্যা দিলেন। তাতে তিনি স্পষ্টই বললেন যে, রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন ছাড়া মিশর অভিযান শ্রমিকদল সমর্থন করবে না।

২রা আগস্ট সন্ধ্যা ৮টায় বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের বৈঠক শেষ হল। বৃটেন এবং ফ্রান্স সুয়েজখাল ব্যবহারকারী ২৪টি রাষ্ট্রের সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব মেনে নিল। ঠিক হল, ১৬ই আগস্ট এই সম্মেলন বসবে। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পনী ইতিপূর্বে তাদের কর্মীদের কাজ ছেড়ে দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অচল অবস্থা সৃষ্টি করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমেরিকাকে খুশি রাখার জন্য বৃটেন এবং ফ্রান্স সুয়েজখাল থেকে কর্মী সরিয়ে আনার প্রস্তাব আপাতত কার্যকর না করার জন্য সুয়েজ কোম্পানীকে পরামর্শ দিল। ত্রিশক্তির এই সিদ্ধান্ত অনেকে সুনজরে দেখল না। ১৮৮৮ সালের কনভেনশনে যারা সই দিয়েছিল তাদের সবার সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন কেউ বোধ করল না। অনেক রাষ্ট্রই আমন্ত্রণের তালিকা থেকে বাদ পড়ল। যাদের সমর্থন সম্পর্কে বৃটেন এবং ফ্রান্সের মনে সন্দেহ ছিল তারা যাতে নিমন্ত্রণ না পায় তার জন্য এদুটি রাষ্ট্র উঠে পড়ে লেগেছিল। প্রায় তিন দিন লণ্ডনে কাটিয়ে ডালেস দেশে ফিরলেন। তিনি

বললেন—যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হয়েছে। আইসেন হাওয়ার এবং ডালেস বুঝলেন, সুয়েজ খাল অচল না হওয়া পর্যন্ত কোন অভিযান চলবে না। ফ্রান্স এবং বৃটেন ভাবল, সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপোষ আলোচনা রাজনৈতিক চালের দিক থেকে সুবিধাজনক।

৮ই আগস্ট ইডেন এক বেতারভাষণ দিলেন। তিনি বললেন—নাসেরের সঙ্গে বিবাদ তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিবাদ বলে মনে করেন। হিটলারের মতই নাসের সাংঘাতিক। সঙ্কটের দিনেও নাসেরের মুখে হাসি ফুটল। মাত্র একবছর আগে যিনি তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে লেকচার দিয়েছিলেন এবং একটি কথাও বলতে দেন নি, তিনিই আজ তাঁকে সমকক্ষ বলে মনে করছেন। হয়ত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মাথা খারাপ হয়েছে। এ অবস্থায় ১৬ই আগস্টের সম্মেলনে নাসেরের পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিক দলের ইতস্তত মনোভাব কেটেছে। বেভান পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। গেইটস্কেল ভোল পাল্টেছেন। তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত—রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন ছাড়া কোন মতেই বৃটেনকে শক্তি প্রয়োগ করতে দেওয়া হবে না। ইডেনের বিলম্বিত পদ্ধতির সমালোচনায় রক্ষণশীলরা মুখর হয়ে উঠেছেন। সংবাদপত্রগুলো তাদের উস্কানি দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিদ্রূপ চলছে। উনি যত গর্জান তত বর্ষান না। একেই বড়ি খেয়ে নার্ভ ঠিক রাখেন ইডেন, তার উপর এত ঝঞ্ঝাট। প্রধানমন্ত্রীর ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল।

উত্তেজনা প্রশমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন নাসের। দিল্লী-কায়রোর মধ্যে ঘন ঘন সলাপরামর্শ চলল। নেহরুর প্রভাব অনেকখানি কার্যকর হয়ে উঠল। সুয়েজ খালে স্বাভাবিক জাহাজ চলাচল অব্যাহত রইল। ইস্রাইলী জাহাজগুলিকে বাধা দেওয়া হল না। সুয়েজ কোম্পানী এবং মিশর সরকার, দুপক্ষই ক্যানাল

কর আদায় করতে লাগলেন। বৃটিশ এবং ফরাসী জাহাজগুলো কর দিচ্ছিল ক্যানাল কোম্পানীকে। মার্কিন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের জাহাজগুলো দিচ্ছিল মিশর সরকারকে। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল, নাসের ক্যানাল করের শতকরা ৩৫ ভাগ পাচ্ছেন। বৃটেন এবং ফ্রান্স রাগে ফেটে পড়ল। এই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সুরু হল সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলন। ২৪টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৮টি রাষ্ট্র যোগ দিয়েছিল। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কৃষ্ণমেনন। রক্ষণশীল দল তাঁর উপর খাপ্পা। তাদের মতে, মেনন মিশর এবং সোভিয়েট রাশিয়ার এজেণ্ট। সোভিয়েট প্রতিনিধি শেপিলভ স্পষ্টই বললেন, সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করার আইনসম্মত অধিকার রয়েছে মিশরের। এ সম্পর্কে কোন আলোচনা চলতে পারে না। সুয়েজখালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজ গমনাগমনের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায় তাই হওয়া উচিত সম্মেলনের বিচার্য বিষয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেঞ্জিস অকুণ্ঠ সমর্থন দিলেন ইডেনকে। অধিকাংশের মত অনুসারে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হল, সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের নিয়ে গঠিত হবে একটি পরিচালকমণ্ডলী। তার সাধারণ সদস্য হিসাবে থাকবে মিশর। এই পরিচালকমণ্ডলীই নিয়ন্ত্রণ করবেন সুয়েজ খাল। মেঞ্জিসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল রওনা হলেন মিশরে, নাসেরের সঙ্গে দেখা করতে।

নাসের যাতে ইঙ্গ-ফরাসী যুক্ত দাবী মেনে নেন তার জন্য বৃটিশ পত্রিকাগুলো সরকারী ইঙ্গিতে সরগোল তুললেন। তাদের বৈদেশিক সংবাদ দাতারা চাঞ্চল্যকর খবর পাঠাতে লাগলেন। তিনটি বিমানবাহী জাহাজ বুলওয়ার্ক, থেসিয়াস, ওসেন, এক স্কোয়াড্রন ক্যানবারা, ট্যাঙ্ক নামাবার ভেলা, ফরাসী নৌবহর প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। ওগুলো হয়ত গন্তব্যস্থলে পৌঁচেছে। বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সাইপ্রাসে জড়

হচ্ছে। চারদিকে ভীতির পরিবেশ। মেঞ্জিস দেখা করলেন নাসেরের সঙ্গে। তার দৌত্য ব্যর্থ হল। নাসের তাঁকে পাল্টা প্রস্তাব দিলেন। সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের এক সম্মেলন হবে। কাউকে বাদ দেওয়া চলবে না। খাল চালু রাখা এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের খাল ব্যবহারের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন তারা। কোন বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রসংঘকে সালিশ মানা হবে। মেঞ্জিসের মুখে কোন কথা নেই। তাঁকে যা বলতে বলা হয়েছে তা তিনি বলেছেন। নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করা তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। আফ্রো-এশীয় নেতারা মেঞ্জিসকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ স্থুরু করলেন। তারা বলতে লাগলেন, বৃটিশ-ফরাসীর তল্পীবাহক কায়রোতে একটু বিশ্রামের সময়ও পেলেন না। একেবারে পত্রপাঠ বিদায়। তাতে আপশোষের কিছু নেই। ডাকহরকরার কাজ চিঠি বিলি, কথা বলা নয়। মেঞ্জিস নাসেরের হাতে চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন। তার কাজ সেইখানেই শেষ হয়েছে। মেঞ্জিস চটলেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ফেরার পথে আমেরিকায় গেলেন। শেষবারের মত প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারকে তাতাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। নাসের খবর পেলেন, একটি গুপ্ত বেতারকেন্দ্র থেকে মিশরে প্রচার চালান হচ্ছে। প্রচারক মিশরীয় জনতাকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি সতর্ক হলেন। বৃটিশ সহ জনাকয় বিদেশীকে গ্রেপ্তার করলেন। তারা কায়রোতে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছিল।

আঠার

বৃটেন এবং ফ্রান্স ভালাভাবেই জানত, মেঞ্জিসের দৌত্য ব্যর্থ হবে। সমর প্রস্তুতির বিরাম ছিল না। ৫ই আগস্ট লণ্ডনে ফরাসী এবং বৃটিশ সেনাপতিদের বৈঠক বসল। অভিযান পরিচালনার ভার তারা ভাগাভাগি করে নিলেন। সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হবেন জেনারেল স্যার চার্লস কেইটলি। তাঁর ডেপুটির পদ নেবেন ফরাসী ভাইস এ্যাডমিরাল বারজোট। স্থলবাহিনীর ভার পাবেন জেনারেল স্যার হিউ স্টকওয়েল। তাঁর ডেপুটি হিসাবে কাজ করবেন ফরাসী জেনারেল এনড্রেবক্রে। নৌবহর পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন এ্যাডমিরাল ম্যাক্সওয়েল রিচমণ্ড। ফরাসী এ্যাডমিরাল লেন্সলট হবেন তাঁর ডেপুটি। বিমান বহরের বড়কর্ত্তার পদ পাবেন এয়ার মার্শাল ডেনিস বারনেট এবং তার সহকারী হবেন জেনারেল ব্রোহোন। অভিযানের সামরিক নেতৃত্বে সব ক্ষেত্রে বৃটিশ প্রাধান্য ফ্রান্সের পছন্দ হয় নি। কিন্তু বাস্তব অবস্থা স্বীকার না করে উপায় ছিল না। কারণ বৃটেন দেবে বেশী সংখ্যায় জঙ্গী বিমান। অভিযানে থাকবে তার ৫০ হাজার সৈন্য। আর ফ্রান্স পাঠাবে ৩০ হাজার সৈন্য। বৃটেনের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা একশ'র বেশী, ফরাসীদের মাত্র ৩০টি। বিমানবাহী ৭টি জাহাজের মধ্যে বৃটেনের ৫টি এবং ফ্রান্সের ২টি। তাছাড়া এ দুটি রাষ্ট্রের ৮০টি পণ্যবাহী জাহাজ যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে সুয়েজে পাড়ি জমাবে। বিশ হাজার গাড়ী যাবে অভিযানকারী সৈন্যদলের সঙ্গে। যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলা বর্ষণের পর ছত্রীবাহিনী অবতরণ করবে।

কোথায় এই বিরাট সমাবেশ ঘটবে? সাইপ্রাসে বড় বন্দর নেই। মল্টা উপযুক্ত স্থান। পোর্টসৈয়দ থেকে মল্টা এক

হাজার মাইল দূরে। এই এক হাজার মাইল যেতে অন্ততঃ ছ'দিন সময় লাগবে। ঠিক হল, বৃটিশ নৌবহরের সমাবেশ ঘটবে মল্টায়। ফরাসী নৌবহর জড় হবে আলজেরিয়ায়। যৌথ অভিযানের অসুবিধা অনেক! বৃটিশ সিগন্যালারদের মধ্যে অনেকেই ফরাসী জানেনা। ফরাসীদের মধ্যেও ইংরাজী জানা লোক বেশী নেই। ভাষা বিভ্রাটের জন্য সিগন্যাল বিভ্রাটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুয়েজ অভিযানের প্রথম সাংকেতিক নামাকরণ ছিল হামিলকার। গাড়ী, বিমান প্রভৃতিতে লেখা হতে লাগল হামিলকার। ফরাসীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়াল আমিলকার। পরে নাম পাল্টিয়ে নূতন নাম দেওয়া হল মাস্কেটিয়ার। মল্টা এবং সাইপ্রাস থেকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করছিলেন যানবাহনের তৈল, খাদ্য এবং অন্যান্য রসদ। সিপ্রিয়ট গেরিলারা (ইওকা) সুযোগ পেলেই ওগুলো লুটে নিচ্ছিল। মাঝে মাঝে তারা অস্ত্রাগারে হানা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চম্পট দিচ্ছিল।

৮ই আগস্ট চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী হল। ইডেন এবং মলে তা আনুমোদন করলেন। ৯ই এবং ১০ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ নৌবহর মল্টা ছাড়বে। ১৫ই এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর মিশরের উপকূলে পৌঁছবে। জাহাজগুলো অর্দ্ধেক পথ যাবার পরই চরমপত্র দেওয়া হবে নাসেরকে। তিনি যথারীতি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। সদর দপ্তর থাকবে সাইপ্রাসে। এখান থেকে বৃটিশ বোমারু বিমানগুলো ৩৬ ঘণ্টা মিশরীয় বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর বোমা বর্ষণ করবে। তাদের সঙ্গে যোগ দেবে বিমানবাহী জাহাজগুলোর জঙ্গী বিমান। মূল লক্ষ্য, মিশরীয় বিমান বহরের ধ্বংস সাধন এবং রানওয়েগুলো অকেজো করে ফেলা! নৌবহর উপকূলের উপর আক্রমণ চালাবে। এ কাজ শেষ হবার পরই বৃটিশ এবং ফরাসী ছত্রীবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণে অবতরণ করবে। সঙ্গে সঙ্গে নৌসৈন্যরাও ডাঙ্গায় নামবে। তিনচার দিনের মধ্যে

তারা সেখানে সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে ফেলবে। বৃটেনের সাউদাম্পটন বন্দর থেকে বৃটিশ তৃতীয় ডিভিশন আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছানোর পর তারা কায়রোর পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কায়রো দখল করবে কিনা এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ সৈন্যবাহিনীর উপর ছিল না। ইডেন হয়ত ধরে নিয়েছিলেন, বৃটিশ এবং ফরাসী বাহিনী মিশরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নাসেরের পতন ঘটবে। তাঁরা নাগিব কিম্বা নাহাস পাশাকে দিয়ে নূতন সরকার গঠন করতে পারবেন। মিশরে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। এই সরকারের সঙ্গে বৃটেন এবং ফ্রান্স একটা বোঝাপড়ায় আসবেন। কায়রো দখলের আর প্রয়োজন হবে না। নাহাস পাশার উপর রক্ষণশীলদলের অটুট আস্থা। ১৯৪২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আবদিন প্রাসাদ ঘেরাও করে বৃটিশ হাইকমিশনার স্যার ল্যাম্পসন তাঁকে ফারুকের উপর চাপিয়েছিলেন। জুলিয়ান আমেরী আগাগোড়াই নাহাসেব সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন।

বেন গুরিয়ন দীর্ঘদিন ধরেই মিশর আক্রমণের ফিকির খুঁজছিলেন। তাঁর লক্ষ্য—গাজায় মিশরীয় গেরিলা ঘাঁটিগুলোর ধ্বংস সাধন, সুয়েজ খালের বিকল্প হিসাবে আকাবা প্রণালীতে ইস্রাইলী জাহাজের গতিবিধির বাধা অপসারণ এবং যৌথ আরব কম্যাণ্ড গড়ে ওঠার আগেই মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করা। সিনাই অভিযান ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়। ১৯৪৮ সালের চেয়ে মিশরের বিমানবহর এখন বেশী শক্তিশালী। অভিযানের সুরুতেই মিশরীয় বিমানবহর অকেজো করে ফেলা দরকার। এককভাবে ইস্রাইল তা পারবে কিনা সন্দেহ। সোভিয়েট রাশিয়া কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান মিশরে পাঠিয়েছে তার সঠিক হিসাব ইস্রাইলী সরকার পান নি। যা পেয়েছেন তার উপর নির্ভর করে ঝুঁকি নেওয়াটা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার কথাও বেন গুরিয়ন

ভাবছিলেন। মিশর অভিযানের সঙ্গী এবং সমর্থক তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সুয়েজ কোম্পানী রাষ্ট্রায়াত্ত হবার পর বৃটেন এবং ফ্রান্স নাসেরের উপর চটা। ফ্রান্সের সঙ্গে ইস্রাইলের যোগাযোগ পুরনো। যৌথ অভিযানের সুযোগ বেন গুরিয়নের সামনে এসে পড়েছে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মলের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। এখন বৃটেনকে দলে টানার সময়। ২৭শে জুলাই টেলিফোনে ইডেনকে ইস্রাইলী পরিকল্পনার আভাস দিলেন মলে। ইডেন কোনমতেই ইস্রাইলের সঙ্গে সামরিক আঁতাতে রাজী নন। কারণ বন্ধুরাষ্ট্র ইরাক, জর্ডন এবং সৌদী আরব অসুবিধায় পড়বে। ইস্রাইল বৃটিশ-ফরাসীর যৌথ মিশর অভিযানের পরিকল্পনার কথা জানত। ফ্রান্স তাকে ওয়াকেফহাল রেখেছিল। জেনারেল দেয়ান এ সংবাদও পেয়েছিলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়া কিম্বা পোর্ট সৈয়দে আক্রমণের আশঙ্কায় নাসের সাঁজোয়া ব্রিগেড সহ তাঁর প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য সিনাই থেকে সরিয়ে এনেছেন। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নূরী-এস-সৈয়দ সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে ব্যস্ত। তিনি বৃটিশ অর্থে নির্বাসিত সিরীয় নেতাদের দলে টানার চেষ্টা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাসেরকে খতম করার স্বপ্ন দেখছিলেন। মিশর আক্রমণের জন্য তিনি অনবরত বৃটেনকে উস্কানি দিচ্ছিলেন। মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ইউ ২ সুয়েজ এবং মিশরের উপর গোয়েন্দা বৃত্তি চালাচ্ছিল। তারা গোপন সংবাদ ফ্রান্সে পাচার করছিল। মার্কিন সমর নায়করা ন্যাটোর অস্ত্রশস্ত্র মলের হাতে তুলে দিচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের অজ্ঞাতসারেই হয়ত এসব ঘটনা ঘটছিল। ফ্রান্স গোপনে ইস্রাইলকে বলেছিল যে, ৬ই নভেম্বর মিশরের উপর ইস্রাইলী আক্রমণ সুরু করতে হবে। এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আইসেন হাওয়ার ব্যস্ত থাকবেন। তিনি হস্তক্ষেপের সময় পাবেন না।

ফ্রান্স ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মলে আলজেরিয়া ঘুরে এসেছেন। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামের তীব্রতা বাড়ছে। তাঁর বিশ্বাস, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাসেরকে ঘায়েল করতে হবে। তা না হলে আলজেরিয়া হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি ইস্রাইলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন। ইস্রাইল ফরাসী সহযোগিতায় মিশর অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। ফ্রান্স আবার বৃটিশ-ফরাসী যৌথ পরিকল্পনার সঙ্গে ইস্রাইলী পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটাচ্ছে। বৃটেন সব জেনেও প্রকাশ্যে না জানার ভাণ করছে। শ্রমিক দলের নেতা গেইটস্কেলের উপর ইডেনের কোন আস্থা নেই। তাঁর ধারণা, বেভান এবং তাঁর সমর্থকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ক্ষমতা গেইটস্কেলের নেই। তিনি তাঁকে কিছু জানাবার দরকারও বোধ করলেন না। নেপথ্যে এতসব কাণ্ড কারখানা ঘটছে। সাধারণ রাজনৈতিক বোধ যাদের আছে তারা পর্যন্ত বুঝতে পারছে একটা কিছু আসন্ন। গেইটস্কেলের ধারনা, ইডেন বিরোধী দলের নেতাকে না জানিয়ে কোন বড় ঝুঁকি নেবেন না। মল্টার প্রধানমন্ত্রী ডোমিনিক মিন্‌টফ এসেছিলেন লণ্ডনে। তিনি কথায় কথায় গেইটস্কেলকে সুয়েজ অভিযানের প্রস্তুতির খবর দিলেন। মল্টায় চলেছিল বৃটিশ নৌবহরের সমাবেশ। মিন্‌টফের কাছে কিছু অজানা থাকার কথা নয়। গেইটস্কেল তাঁর কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। বেভান সতর্ক। তিনি শ্রমিক দলকে সতর্ক করলেন। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার একটা চিঠি দিয়েছেন ইডেনকে। তাতে তিনি বলেছেন, নাসেরের উপর তিনি নিজে খুশী নন। আস্তে আস্তে অর্থ নৈতিক চাপ দিয়ে তাঁকে সাবাড় করাই যুক্তিযুক্ত। মিশরে সামরিক অভিযান চালালে গোটা আরব দুনিয়া নাসেরের পিছনে এসে দাঁড়াবে।

আফ্রো-এশিয়ার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন

সৃষ্টি হবে। নাসেরের জনপ্রিয়তা বাড়বে। তিনি হবেন অত্যাচারিত মানব সমাজের হিরো। আপোষ আলোচনার সব পথ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শক্তিপ্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। তা করলে দুনিয়ার জনমত বিরুদ্ধে যাবে।

সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর ডিরেক্টর জর্জেস পিকট সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি ফরাসী এবং বৃটিশ সরকারকে বললেন, সুয়েজ খালের পাইলটদের সরিয়ে আনলেই খাল অচল হয়ে পড়বে। তিনি আগেও এ প্রস্তাব করেছিলেন। মেঞ্জিসের দৌত্যের ফলাফলের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। মেঞ্জিস নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছেন। সুয়েজ খাল অচল হলে বৃটেন এবং ফ্রান্স হস্তক্ষেপের সুযোগ পাবে। ডেইলি মিরারের মালিক সেসিল কিং এর মারফত ইডেন বৃটিশ সংবাদপত্রগুলোকে হাত করেছিলেন। পত্রিকাগুলো নূতন উৎসাহে প্রচারে নামল। ইউরোপীয় পাইলটরা চাকুরী ছাড়লে খালে জাহাজ চলাচলের পথ দেখাবার সাধ্য অন্য কারও নেই। ফরাসী সংবাদপত্রগুলোকে নিজেদের মতে আনবার জন্য এবং কোম্পানীর যুক্তিতর্ক প্রকাশের জন্য ঘুষ দেবার ব্যবস্থা হল। বামপন্থী পত্রিকা লিবারেশন পেলেন একশ পাউণ্ডের এক চেক। তারা এই চেকের প্রতিলিপি ছাপিয়ে দিলেন। অন্যান্য পত্রিকারও কোম্পানীর পক্ষে ওকালতির সুযোগ অনেকটা কমে গেল। ইস্রাইলী প্রস্তুতির অসম্পূর্ণতা, সুয়েজ খালে অচল অবস্থা সৃষ্টির জন্য সময় দান, আমেরিকার প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি কারণে সুয়েজ অভিযানের দিন পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। তা ছাড়া ইস্রাইলী পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে সামগ্রিক পরিকল্পনার রদবদলের দরকার পড়েছিল।

প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার এবং ডালেস জানতেন, মেঞ্জিসের দৌত্য ব্যর্থ হবে। বিকল্প হিসাবে সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা তাঁরা তৈরী করে রেখেছিলেন। সুয়েজের

দু'মুখে দুটি জাহাজ থাকবে। তারা টোল আদায় এবং খালের ভিতরে জাহাজগুলোর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবে। নাসেরকে সহযোগিতা করতে বলা হবে। তিনি অসম্মত হলে কিছু যাবে আসবে না। গায়ের জোরে সংস্থার কাজ চলবে। ডালেসের সঙ্গে ইডেনের তার বিনিময়ের বিরাম ছিল না। ইডেন বুঝলেন, আমেরিকা কিছুটা এগিয়ে এসেছে। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, নাসের এ পরিকল্পনায় সম্মতি দেবেন না। বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিন জাহাজের কনভয় সুয়েজ খালে ঢুকবে। তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে গান বোট। মিশর বেযাদপী করলেই সুরু হবে গোলা বর্ষণ। আমেরিকা তাতে জড়িয়ে পড়বে। প্রস্তাবটি তাঁর মন্দ লাগল না।

সুয়েজ কোম্পানীর তালিকায় ছিল ২০৫ জন পাইলট। তাদের মধ্যে ৬১ জন বৃটিশ, ৫৩ জন ফরাসী, ৪০ জন মিশরীর এবং ৫১ জন অন্যান্য জাতির। এদের প্রত্যেকের বেতন মাসে দুশো থেকে পাঁচশো পাউণ্ড। কোম্পানী তাদের সরিয়ে নিলেন। কিন্তু মিশরীয় পাইটলরা কর্তপক্ষের কথা শুনল না। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নামল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল ১৫ জন সোভিয়েট পাইলট। তারপর অন্যান্য জাতির পাইলটরাও সুয়েজে ভিড় করল। আর দু'শ সুয়েজে চাকুরী নিল। প্রথম সপ্তাহেই ২৫৪টি জাহাজ খালের ভিতর দিয়ে নির্বিঘ্নে এমুখ ওমুখ হল। তারপর জাহাজ চলাচলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় বৃটেন এবং ফ্রান্স সুয়েজে জাহাজের ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়ামের হার বাড়িয়ে দিয়েছিল। দুর্ঘটনার লক্ষণ যখন দেখা গেল না তখন তারা প্রিমিয়ামের হার কমাতে বাধ্য হল। ইউরোপীয় বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের এ অপমান ইডেন নীরবে হজম করলেন। সংবাদপত্রগুলোর কলরব নীচু পর্দায় নেমে এল। তাদের বৈদেশিক সংবাদদাতারা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলেন, হিসাবে কারচুপি চলেছে। আসলে এতগুলো জাহাজ

সুয়েজ দিয়ে যাতায়াত করছে না। কোন কোন সংবাদপত্র আবার ইউরোপীয় শিক্ষার তারিফ করতে লাগলেন। তাদের ধারণা, শ্বেতাঙ্গের শিক্ষা না পেলে মিশরীয় পাইলটরা এতখানি করিৎকর্মা হতে পারত না।

মলে এবং ইডেন বিপাকে পড়লেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, পাইলটদের সরিয়ে নিলেই সুয়েজ খাল অচল হবে। তারপর একটা চরমপত্র দিয়ে মিশর আক্রমণ করা চলবে। কিন্তু খাল বন্ধ হল না। চরম পত্রের কোন অজুহাত নেই। একমাত্র ভরসা ইস্রাইল। সে যদি সিনাই দখল করে সুয়েজ খালের দিকে এগিয়ে আসে তবেই হস্তক্ষেপের সুযোগ মিলবে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ছুটে এলেন লণ্ডনে। ইডেনের সঙ্গে তিনি গোপন আলোচনায় বসলেন। সুয়েজ দখল তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। তা না হলে রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করবে। ফলে অভিযান অসম্পূর্ণ থাকবে। ছত্রীবাহিনীর ব্যবহার ছাড়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খাল দখল সম্ভব নয়। যৌথ পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটল। আলেকজান্দ্রিয়ার বদলে পোর্ট সৈয়দে সৈন্য অবতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ইস্রাইলের সঙ্গে আলোচনার ভার নিলেন মলে। ইঙ্গ-ফরাসী এবং ইস্রাইলী পরিকল্পনার সমন্বয়ের জন্য কিছুটা সময় হাতে রাখার প্রয়োজন পড়ল। কালহরণের অছিলা চাই। হাতের কাছে আছে ডালেসের সুয়েজ ব্যবহারকারী সংস্থার পরিকল্পনা। ইডেন এবং মলে আপাততঃ এ পরিকল্পনা গ্রহণের এবং পরে সুযোগমত বানচালের ষড়যন্ত্র আঁটলেন।

যথারীতি সুয়েজ ব্যবহারকারী রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলন বসল। সোভিয়েট রাশিয়া সম্মেলন বয়কট করল। তার প্রতিনিধি স্পষ্টই বললেন—এটা হচ্ছে আর একটা সাম্রাজ্যবাদী ফাঁদ। মতানৈক্য এত গভীর যে, সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়াই সম্ভব হল না। ওটা মুলতুবী রইল। ইস্রাইলী পররাষ্ট্র মন্ত্রী গোলদা মেইর

এবং জেনারেল দেয়ান হাজির হলেন প্যারিসে। সিনাই অভিযানের জন্যে তাঁদের চাই ট্যাঙ্ক। সাঁজোয়া গাড়ী এবং ফরাসী জঙ্গী বিমানের আশ্রয়। ফরাসী সরকার উদার। ইস্রাইলকে অস্ত্র এবং অন্যান্য সাহায্য দিতে তার আপত্তি নেই। নাসের উচ্ছেদ মুখ্য কথা। অন্যান্য প্রশ্ন গৌণ। আলজেরিয়া রাখতে হবে। নাসের মুক্তি যোদ্ধাদের বৈপ্লবিক প্রেরণা। এই প্রেরণার উৎসমুখে আঘাত হানতে ফ্রান্স দৃঢ়সঙ্কল্প।

ইডেনের চেয়ে বয়সে বড় ম্যাকমিলান। বংশ কৌলিন্যে কিছুটা ছোট। প্রধানমন্ত্রী হবার সাধ তাঁরও বড় কম নয়। আজীবন চার্চিলের সেবা করেছেন। এই চার্চিলই শেষ পর্যন্ত ইডেনকে বসিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর গদীতে। ইডেন যদি পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রীত্ব করেন তবে ম্যাকমিলানের ভাগ্যে হয়ত এ পদটি জুটবে না। বাটলার বয়সে ছোট। তিনি ম্যাকমিলানের চক্ষুশূল। ওর হাতে প্রধানমন্ত্রীত্ব গেলে ম্যাকমিলান মুখ দেখাতে পারবেন না। তাঁর স্ত্রী হয়ত আত্মহত্যাই করবেন। বাটলার গৃহিণী এবং ম্যাকমিলান গৃহিণীর মধ্যে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। মুখোমুখি ঝগড়া বহুবার হয়েছে। বাকী আছে শুধু চুলোচুলির। ইডেন খান অষুধের বড়ি। মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়েন তিনি। সুয়েজ অভিযানের বিলম্বে রক্ষণশীল দলের দক্ষিণপন্থী অংশ ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছিল। সংবাদপত্রগুলোও ইডেনের বিরূপ সমালোচনা শুরু করেছিলেন। অর্থমন্ত্রী ম্যাকমিলান ভাবলেন, রক্ষণশীল দলে তাঁর নেতৃত্বের বনিয়াদ তৈরীর সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। অর্থমন্ত্রী রাতারাতি সমরনেতা সাজলেন। মার্কিন দূতকে ডেকে তিনি জানিয়ে দিলেন, নাসেরকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাবেন না। বৃটিশ জনসাধারণের ঘুমন্ত সাম্রাজ্যবাদী গৌরব বাসনা আবার চাঙ্গা করে তোলা হল। ম্যাকমিলান প্রমাণ করবেন, গ্রেট বৃটেন সত্যিই গ্রেট। যারা তাকে লিট্‌ল বৃটেন ভাবেন তারা ভ্রান্ত।

রাষ্ট্রসংঘ একেবারে নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ড ছয় দফা পরিকল্পনা পেশ করলেন—(১) সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে সব জাতির জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা থাকবে, (২) মিশরীয় সার্বভৌমত্বের মর্যাদা দেওয়া হবে, (৩) যে কোন একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব রাজনীতি থেকে সুয়েজ খাল মুক্ত থাকবে, (৪) মিশর এবং খাল ব্যবহারকারী সংস্থা খালের টোলের হার নির্দ্ধারণ করবে, (৫) খাল উন্নয়নের জন্য আদায়ীকৃত টাকার একটি অংশ বরাদ্দ থাকবে এবং (৬) মিশর সরকার ও পুরনো কোম্পানীর বিরোধ মেটাবার জন্য সালিশ বসবে। নেহরু এসময় তৎপর হয়ে উঠলেন। ছয় দফা পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তিনি মিশরকে পরামর্শ দিলেন। মিশরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফৈজী এ পরিকল্পনা মেনে নিলেন। ভয়ানক আপত্তি জানালেন ইডেন। তাঁর ধারনা নাসেরের ডাকাতি স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। ইডেন এবং সেলয়েন লয়েড প্যারিসে হাজির হলেন। সংবাদপত্রগুলো প্রচার করলেন, বারোয়ারী বাজারে বৃটেনের প্রবেশ সম্পর্কে আলোচনাই তাদের প্যারিস পাড়ি জমাবার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইডেন, লয়েড, মলে এবং ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপন পরামর্শ করলেন। তাদের বৈঠকের সময় কোন পঞ্চম ব্যক্তিকে সেখানে থাকতে দেওয়া হল না। বারোয়ারী বাজার নিয়ে আলোচনার খবর লোক ঠকান ভাওতা। সুয়েজ অভিযানে ইস্রাইলী সহযোগিতার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্যই তাঁরা প্যারিসে গিয়েছিলেন। তাঁদের আলোচনার কোন সরকারী বিবরণ পর্যন্ত রাখা হল না।

এদিকে ইস্রাইল এক ফ্যাঁসাদ বাধাল। সিনাই আক্রমণের প্রস্তুতি গোপনের জন্য জর্ডন সীমান্তে ইস্রাইলী সৈন্যেরা প্রচণ্ড হানা দিল। বাদশা হুসেন ইঙ্গ-জর্ডন চুক্তি অনুযায়ী বৃটেনের সাহায্য চাইলেন। ইডেনের উভয় সঙ্কট। তিনি কি করবেন, ভেবে পেলেন না। তেল-আবিবের বৃটিশ চার্জ দ্য এ্যাফায়ার্স প্রধানমন্ত্রী

বেন গুরিয়নকে বললেন, ইরাকের বৃটিশবাহিনী জর্ডনের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এ ভদ্রলোক বৃটেন এবং ইস্রাইলের যোগসাজসের কথা জানতেন না। তাঁর হুমকির উত্তরে বেন গুরিয়ন শুধু বললেন —তোমার কর্তারা অবস্থার গুরুত্ব তোমার চেয়ে ভাল বোঝেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। ইরাকের বৃটিশবাহিনী যেখানে ছিল সেখানেই রইল। দু'চারদিন পর তাদের সংখ্যা কমল। বেন গুরিয়ন মুচকি হাসলেন। আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিণাম দেখে বাদশা হুসেন থ' বনলেন। নাসের উচ্ছেদ-পরিকল্পনায় ইডেন আবার মন দিলেন। ম্যাকমিলান তাণ্ডব-নৃত্য সুরু করলেন। তাঁর সহকারী হলেন জুলিয়ান আমেরী।

ঘটনার গতি দ্রুত আবর্তিত হতে লাগল। ফরাসী জেনারেল চালে এবং ফরাসী শ্রমমন্ত্রী আলবার্ট গাজিয়ের এলেন লণ্ডনে। গোপনে ইডেনের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁরা। চালে একটি মানচিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মানচিত্রের স্থান নির্দ্দেশ করে বললেন—এখানে থাকবে ইস্রাইল। ওখানে মিশরীয় বাহিনী। আমাদের স্থান কোথায়? এখানে, সুয়েজ খালের দু'পারে। ইডেন তাঁর বুদ্ধির তারিফ করলেন। ইস্রাইল সিনাই দখল করে সুয়েজ খালের দিকে এগুবে। ফ্রান্স এবং বৃটেন সুয়েজ রক্ষার জন্য সৈন্য নামাবে। মলে এবং ইডেনের মনে এ চিন্তাটা আগেই এসেছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার বদলে পোর্টসৈয়দ দখলের কথা তাই আগে ভাগেই তাঁরা ভেবে রেখেছিলেন। ইউরোপীয় পাইলটরা সুয়েজ ছাড়ার জন্য সুয়েজ অচল হয় নি। মিশর আক্রমণের কোন অজুহাত নেই। ইস্রাইল দেবে তাঁদের নূতন সুযোগ। তারা তার সদ্ব্যবহার করবে। ইডেনের দুর্বল নার্ভ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। তিনি এবং লয়েড পাড়ি দিলেন প্যারিসে। স্থানীয় বৃটিশ রাষ্ট্রদূত হতবাক। তিনি নেপথ্য ঘটনাবলীর কোন খবরই রাখতেন না। পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁকে কিছুই জানান নি। ইডেন, লয়েড এবং মলের

মধ্যে চলল গোপন আলোচনা। উঁচু মহলের গোপন কথা গোপনই রইল। তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সর্বত্র। বৃটিশ এবং ফরাসী সমর নায়কেরা লণ্ডন এবং প্যারিসে ঘন ঘন বৈঠক করতে লাগলেন। জেনারেল চালে সোজা রওনা হলেন ইস্রাইলে। বৃটিশ এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরগুলোর মধ্যে চিরাচরিত সংবাদের আদান প্রদান হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তেল-আবিবের মার্কিন বিমান এ্যাটাচি বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইস্রাইলের সামরিক আঁতাতের আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি চুপ করে বসে রইলেন। মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ইউ-২ ইস্রাইলী সৈন্য সমাবেশের খবর পাঠিয়েছিল তাদের বড় কর্তাকে। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারকে বোঝান হল, জর্ডন আক্রমণের জন্য চলছে ইস্রাইলী প্রস্তুতি। ১৭ই অক্টোবর বেন গুরিয়ন ঘোষণা করলেন—তাদের সামনে সমূহ বিপদ। মিশরের ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর ইস্রাইল আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছেন।

বৃটিশ এবং ফরাসী সমর নায়কদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসল। তাঁদের সামনে রয়েছে মাসকেটিয়ার পরিকল্পনা এবং ইস্রাইলের নিজস্ব কাদেশ পরিকল্পনা। এই দুই পরিকল্পনার সমন্বয়ে চলবে মিশর অভিযান। আকাশ থেকে অবিরাম ৪৮ ঘণ্টা বোমা বর্ষণে ধ্বংস করতে হবে মিশরের বিমান ঘাঁটিগুলো। তারপর চলবে ৬ দিন বেতার প্রচার, ইস্তাহার বিলি এবং মিশরীয় সৈন্য সমাবেশের উপর বিমান আক্রমণ। সব শেষে ঘটবে পোর্ট সৈয়দে সৈন্য অবতরণ। ছত্রীবাহিনী তৈরী থাকবে সাইপ্রাসে। ইস্রাইলের মতামত দরকার। জেনারেল চালে গিয়েছেন তেল-আবিবে। তিনি বেন গুরিয়ন এবং জেনারেল দেয়ানকে নিয়ে ফিরবেন। তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন সবাই।

২২শে অক্টোবর বেন গুরিয়ন এবং জেনারেল দেয়ান এলেন প্যারিসে। তাঁরা সোজা চলে গেলেন সহরের উপকণ্ঠে একটি বাড়ীতে। সেখানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মলে। সারাদিন গোপন

সলাপরামর্শ চলল। বেন গুরিয়ন দাবী করলেন, ইস্রাইলী বাহিনীর মিশর সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই মিশরীর বিমান বহরের ধ্বংস অত্যাবশ্যক। বৃটেনের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। ইস্রাইলী বাহিনী যখন এগিয়ে যাবে তখন বিমান আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে বৃটেন এবং ফ্রান্সের। মলে সব সর্তেই রাজী। তাঁর দেরী সইছে না। স্বদেশে তিনি বেকায়দায় পড়ে গেছেন। ফ্রান্সের আমন্ত্রণে আলজেরিয়ার মুক্তি যোদ্ধাদের নেতা বেন বেলা এবং বেন খিদাব আপোষ আলোচনার জন্য বিমানে যাচ্ছিলেন টিউনিসে। পথে স্বল্পস্থায়ী যাত্রা বিরতির সময় তাদের গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দিয়েছিলেন এই হুকুম। বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে ফ্রান্স অপরাধী। দেশে বিদেশে চলছিল কঠোর সমালোচনা। ফরাসী সমালোকদের মুখ বন্ধ করার জন্য দরকার তাড়াতাড়ি সুয়েজ অভিযান। কিন্তু বেন গুরিয়ন চান তিন পক্ষের স্বাক্ষরিত দলিল। বিকেলে প্যারিসে পৌঁছলেন সেলয়েন লয়েড এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসার প্যাট্রিক ডীন। দেড় ঘণ্টা ধরে চলল তাঁদের বিতর্ক। বৃটেন লিখিতভাবে কোন চুক্তি করতে রাজী নয়। ইস্রাইলী বাহিনী সুয়েজ খালের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত সে আক্রমণও চালাবে না। তা করলে বিবদমান পক্ষ দুটিকে সুয়েজ থেকে তফাৎ রাখার ঘোষণা কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা সবাই বুঝবে, ইস্রাইলের সঙ্গে রয়েছে বৃটিশ যোগসাজস। বেন গুরিয়নও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি লিখিত চুক্তি ছাড়া এক পা'ও এগুবেন না। একটা মীমাংসার প্রস্তাব দিলেন মলে। ফরাসী নৌবহর ইস্রাইলী উপকূল দরিয়ায় ঘুরে বেড়াবে। তার বিমান বহর অভিযানকারী ইস্রাইলী বাহিনীকে সাহায্য করবে। পরিবহন বিমানগুলো খাদ্য জোগাবে। জঙ্গী বিমান বহর ইস্রাইলী সহরগুলো পাহারা দেবে। বেন গুরিয়ন নাছোড়বান্দা। স্বাক্ষরিত ত্রিদলীয় চুক্তির দাবী তিনি ছাড়বেন না। সেলওয়েন

লয়েড চলে এলেন লণ্ডনে। তিনি নিজে ঝুঁকি নিতে নারাজ। প্যাট্রিক ডীন রইলেন প্যারিসে। ত্রিদলীয় চুক্তির খসড়া তৈরী হল। তাতে স্বাক্ষর দিলেন মলে, বেন গুরিয়ন এবং প্যাট্রিক ডীন। ইস্রাইলী প্রধানমন্ত্রী চান, তাঁদের সমমর্যাদা সম্পন্ন বৃটিশ মন্ত্রীব স্বাক্ষর। ডীন বৃটিশ সরকারের একজন অফিসার মাত্র। তাঁর স্বাক্ষরের মূল্য এমন বেশী কিছু নয়। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিমানে রওনা হলেন লণ্ডনে। বিমান ঘাঁটি থেকে সোজা তিনি চলে গেলেন ইডেনের কাছে। বৃটেনের হাত পা বাঁধা। ইতিমধ্যে জর্ডনের নির্বাচন শেষ হয়েছে। ইডেন সেখানে প্রচণ্ড মার খেয়েছেন। নাসের সমর্থকরা নির্বাচনে জিতেছেন। বাদশা হুসেন ইরাকের সঙ্গে সামরিক চুক্তি বাতিল করেছেন। নাসের তাঁকে সামরিক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ অবস্থায় দর কষাকষি বৃটেনের পক্ষে সম্ভব নয়। ইডেন গোপন দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছুটলেন প্যারিসে। দলিল নিয়ে বেন গুরিয়ন বিমানে উঠলেন। তিনি যাবেন তেল-আবিবে।

মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর সম্ভাব্য ত্রিদলীয় অভিযানের খবর পেয়েছিল। তাদের বড় কর্তারা ইস্রাইলী সমর্থক। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার অন্ধকারে পায়চারী করছেন। বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইস্রাইল তাঁকে বড় আমল দিচ্ছে না। কূটনৈতিক সাংবাদের আদান প্রদানের গতি মন্থর হয়ে আসছে। ফ্রান্স এবং বৃটেন তাদের নাগরিকদের মিশর ছাড়ার নির্দ্দেশ দিয়েছে। ফরাসী নার্সরা দলে দলে সাইপ্রাসে জড় হচ্ছে। সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার ফোনে কথা বললেন লণ্ডনের মার্কিন দূত অলড্রিচের সঙ্গে। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসল ঘটনা জানবার নির্দ্দেশ দিলেন তাঁকে। অলড্রিচ হাজির হলেন সেলয়েন লয়েডের দপ্তরে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে লয়েড

তাঁকে বললেন, ইস্রাইলী পরিকল্পনার কথা তিনি কিছুই জানেন না। প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার আবার পড়লেন অন্ধকারে। তিনি মার্কিন নাগরিকদের পশ্চিম এশিয়া থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন।

বৃটিশ মন্ত্রীসভার গোপন বৈঠক বসল। ইডেন বহুদূর এগিয়ে গিয়েছেন। সামরিক প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। পিছু হটা অসম্ভব। বৃটিশ-ফরাসী-ইস্রাইলী অভিযান অনুমোদন না করা ছাড়া উপায় নেই। ইস্রাইলের সঙ্গে যোগসাজস অনেকেরই ভাল লাগছিল না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী নাটিং 'স্বাস্থ্যের কারণে' আগেই পদত্যাগ করেছেন। হাঙ্গেরীতে হাঙ্গামা চলেছে। সোভিয়েট রাশিয়া সেখানে ব্যস্ত। সময় অনুকুল। মন্ত্রীসভার মনে আর কোন সংশয় রইল না। তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন।

সমর নায়করা অসম্ভব কর্মতৎপর হয়ে পড়লেন। মণ্টা বন্দরের জাহাজগুলোতে মাল বোঝাই হতে লাগাল। এ্যাডমিরাল ম্যাক্সওয়েল রিচমণ্ডের জাহাজে গড়ে উঠল বৃটিশ-ফরাসী যৌথ সামরিক দপ্তর। মাসকেটিয়ার এবং ·াদেশ পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ নিল। ২৯শে অক্টোবর ইস্রাইল প্রথম আঘাত হানবে। বৃটিশ এবং ফরাসী বাহিনী ৩১শে অক্টোবর অভিযান সুরু করবে। **ইস্রাইলের লক্ষ্য**—(১) সুয়েজ খালের কাছাকাছি মিশরীয় ঘাঁটিগুলো দখল এবং খালের উপর আক্রমণ চা্াবার ভাণ, (২) তিরাণ প্রণালী দখল, এবং সিনাইএ মিশরীয় বাহিনীর ধ্বংস সাধন। **বৃটিশ-ফরাসী মতলব**, (১) সুয়েজ থেকে তফাৎ থাকার জন্য মিশর এবং ইস্রাইলকে চরম পত্র দান, (২) মিশরীয় বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর অবিরাম বোমা বর্ষণ, (৩) প্রচার অভিযান, (৪) নৌবহর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে বোমা বর্ষণ এবং সৈন্য অবতরণ, (৫) ছত্রীবাহিনীর অবতরণ এবং সুয়েজ খাল দখল। ২৮শে অক্টোবর রাত্রিতে মণ্টা থেকে মালবাহী জাহাজগুলো ছাড়ল।

তার আগের দিনই বিমানবাহী জাহাজগুলো যাত্রা সুরু করেছিল। বিশ স্কোয়াড্রন ক্যানবারা এবং ভেলিয়েণ্ট বোমারু সাইপ্রাসে হাজির হল। ছত্রীবাহিনী তৈরী রইল।

উনিশ

২৯শে অক্টোবর বিকেল ৪টা। প্রায় চারশো ইস্রাইলী ছত্রীসৈন্য সুয়েজের ত্রিশ মাইল পূবে মিটলায় অবতরণ করল। আর একটি বাহিনী ইস্রাইলী-মিশরীয় সীমান্তের দক্ষিণাংশের গুরুত্বপূর্ণ মিশরীয় ঘাঁটিগুলো দখল করে নিল। ছত্রিশটি ফরাসী জঙ্গী বিমান ইস্রাইলে উড়ে গেল। সাইপ্রাস থেকে ফরাসী পরিবহন বিমানগুলো প্যারাসুটের সাহায্যে মিটলায় ইস্রাইলী ছত্রীসৈন্যদের খাদ্য এবং অস্ত্র দিতে লাগল। বৃটিশ বিমানগুলো মিশরের উপর পর্যবেক্ষণ সুরু করল। মিশরীয়-ইস্রাইলী সীমান্তের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে জর্ডনের বেতুইন বাহিনী অপেক্ষা করছিল। তারা যাতে অভিযানকারী ইস্রাইলী বাহিনীকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য জর্ডনস্থ বৃটিশবাহিনী আকাবায় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাত্রে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আহারে বসেছিলেন ইডেন। তিনি মিশরে ইস্রাইলী আক্রমণ আরম্ভের খবর শুনলেন। তাঁর মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তিনি শান্ত এবং সংযত। সারা মুখে চোখে প্রশান্তির ছায়া। ম্যাকমিলান আনন্দে আত্মহারা। তিনি তাঁর জামাতা আমেরীকে একান্তে ডেকে বললেন, ইডেনের সময়টা বড় খারাপ। সামনের ক'টা দিন তাঁর পক্ষে সাংঘাতিক। শেষ পর্যন্ত হয়ত তিনি গদীচ্যুত হবেন। ম্যাকমিলান ভয়ানক খুশী। ইডেন বিদায় নিলেই প্রধানমন্ত্রীত্ব তাঁর নাগালের মধ্যে। শ্রমিকদলের পররাষ্ট্র দপ্তরের

মুখপাত্র রোবেনস কাছেই ছিলেন। ১৯৫০ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন ইডেনকে। এই চুক্তি অনুযায়ী মিশর কিম্বা ইস্রাইল ১৯৫০ সালের সীমান্ত অতিক্রম করলে বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা একযোগে বাধা দেবে। চুক্তির মর্যাদা রক্ষার সময় এসেছে। মার্কিন সরকারের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ দরকার। ইডেন শুধু বললেন—জাতীয় সঙ্কটে প্রথম প্রয়োজন সর্বদলীয় ঐক্য। তিনি ঐক্য চান।

পরের দিন সকালে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসল। ইডেন বললেন, ইস্রাইলী বাহিনীর একটি বাহু ইসমাইলিয়ার কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছেছে। অপর বাহু সুয়েজের দিকে ধাওয়া করেছে। সুয়েজখাল বিপন্ন। সুতরাং মিশর এবং ইস্রাইলকে চরম পত্র দেবার সময় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী যখন এসব কথা বলছিলেন তখন ইস্রাইলী বাহিনী তাদের সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে লড়াই করছিল। ছত্রীবাহিনী মিটলা থেকে এক পা'ও এগোয়নি। সাহায্যের জন্য তাঁরা আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। সুয়েজের ধারে কাছে কোন ইস্রাইলী সৈন্য ছিল না। আমেরিকাকে জানাবার দরকার কেউ বোধ করলেন না।

বিকেল প্রায় তিনটের সময় বৃটেন এবং সাড়ে তিনটায় ফ্রান্স, ইস্রাইল এবং মিশরকে চরম পত্র দিল। তাতে বলা হল—সুয়েজ থেকে দশ মাইল দূরে সৈন্যদল সরিয়ে নিতে হবে। খালের পার বরাবর বৃটিশ এবং ফরাসী বাহিনী অবতরণ করবে। সাময়িকভাবে খাল মিটলা নিজেদের দখলে রাখবে। চরম পত্র অগ্রাহ্য হলে বৃটেন এবং ফ্রান্স গায়ের জোরে পথ করে নেবে।

যখন এই চরম পত্র দেওয়া হল তখন ইস্রাইলী বাহিনী ছিল খালের ৩০ মাইল দূরে। ওরা মিটলায় লড়াই করছিল। এক পা'ও এগুতে পারছিল না। মার্কিন রাষ্ট্রদূত অলড্রিচ ছুটে গেলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে। লয়েড তাঁকে বললেন—ইস্রাইল

আক্রমণকারী কিনা তা নির্দ্ধারণের জন্য তাঁরা ফরাসী সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। বিকেল চারটায় বিরোধীদলের নেতা গেইটস্কেলকে বৃটিশ চরম পত্রের কথা জানালেন ইডেন। সাড়ে চারটায় জানল কমন্সসভা। সবশেষে খবর পেলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত অলড্রিচ। ইস্রাইল বিনা ওজর আপত্তিতে ইঙ্গ-ফরাসী দাবী মেনে নিল। অগ্রাহ্য করল মিশর। প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার কড়া তার পাঠালেন ইডেনের কাছে। তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। ইস্রাইল আক্রমণকারী। মিশরীয়-ইস্রাইলী সীমান্ত সে লঙ্ঘন করেছে। ১৯৫০ সালের চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স এবং আমেরিকা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য। পশ্চিম এশিয়ায় শক্তি প্রয়োগে বিরত থাকার নির্দ্দেশ দিল স্বস্তি পরিষদ। ফ্রান্স এবং বৃটেন ভিটো দিয়ে এ প্রস্তাব বানচাল করল।

শ্রমিকদল গর্জে উঠল। গেইটস্কেল বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, তাঁর অগোচরে ইডেন এমন একটা কাণ্ড করবেন। তাদের ধারণা, গোটা জাতি প্রতারিত হয়েছে। ইডেন খুশীতে ভরপুর। তিনি বললেন—ইস্রাইলের উত্তর চমৎকার। মিশর যত নস্টের গোড়া। চরম পত্র অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস সে দেখিয়েছে। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের উপর। স্বয়ং শাসিত এই সংস্থাটিকে সরকারী আওতায় আনতে হবে। সংবাদের উপর সেন্সরসীপ বসবে। যুদ্ধের ভিত্তিতে বি বি সির কাজ চলবে। কিন্তু যুদ্ধ কোথায়? কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করে নি। আইনের তর্ক তুললেন এটর্নী জেনারেল। সঙ্কল্পটা ফেঁসে গেল। নাসের প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন, চরম পত্র হয়ত একটা ভাঁওতা। ইস্রাইলকে বিনা বাধায় সিনাই দখল করতে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। বিশ্বাসঘাতকতা তিনি দেখেছেন। কোন সভ্য রাষ্ট্র যে এত বড় বিশ্বাসঘাতক হতে পারে তা তাঁর কল্পনায় আসে নি। কায়রোর বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের ডেকে তিনি

ঘটনার বিবরণ দিলেন। আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলোতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সুরু হল। সিনাই এ লড়াই চলছে। তাঁর সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ সেখানে ইস্রাইলকে বাধা দিচ্ছে। 'সাময়িক-ভাবে' বৃটিশ-ফরাসীর সুয়েজ দখলের অর্থ নাসের ভালভাবেই বোঝেন। ১৮৮২ সালে গ্ল্যাডষ্টোন 'সাময়িকভাবে' মিশর দখল করেছিলেন। এই সাময়িক দখলের জের মিটাতে মিশরের লেগেছিল ৭০ বছর। চরম পত্র অগ্রাহ্য করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না।

বেন গুরিয়ন উত্তেজিত। চুক্তি অনুযায়ী চরম পত্রের মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা ইস্রাইলী আক্রমণের ৩৬ ঘণ্টা পরে বৃটেনের বোমা বর্ষণের কথা। ৩১শে অক্টোবর সকাল সাড়ে চারটায় চরম পত্রের মেয়াদ শেষ হয়েছে। বৃটেন বোমা বর্ষণ সুরু করছে না। মিটলায় তাঁর ছত্রীবাহিনী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফরাসী বিমানগুলো তাদের সাহায্য দিচ্ছে। এ অবস্থা বেশীক্ষণ চলতে পারে না। তারা হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বেন গুরিয়ন তাদের ফিরিয়ে আনার সঙ্কল্প করলেন। বাধা দিলেন জেনারেল দেয়ান। মিটলা ছাড়া সুয়েজের কাছাকাছি অন্য .কান স্থানে ইস্রাইলী বাহিনী নেই। ওদের সরিয়ে আনলে সুয়েজ বিপন্নের অজুহাত টেকে না। ফ্রান্স এবং বৃটেন বিপদে পড়বে। সিনাই এ প্রচুর লোকক্ষয় হবে। অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। ইস্রাইলের চিন্তা নেই। তার সহরগুলোতে পাহারা দিচ্ছে ফরাসী জঙ্গী বিমান। উপকূল দরিয়ায় রয়েছে ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ। মিশরীয় ডেষ্ট্রয়ার ইব্রাহিম এল আবল বন্দর ছেড়েছিল। তাকে আক্রমণ করল ফরাসী ফ্রিগেট কারসেইণ্ট। পঙ্গু অবস্থায় কোন রকমে মিশরীয় ডেষ্ট্রয়ার আবার ঢুকল বন্দরে। চরম পত্রের মেয়াদ শেষ হবার এক ঘণ্টা আগেই ঘটেছিল এ ঘটনা।

ইডেন খবর পেয়েছিলেন, কায়রোর বিমান ঘাঁটিতে ১৫টি মার্কিন পরিবহন বিমান অপেক্ষা করছে। মার্কিন নাগরিকদের

তারা নিয়ে যাবে। আলেকজান্দ্রিয়ার পথে রয়েছে এক ঝাঁক মার্কিন বাস। আরোহীরা সব মার্কিন। আকাশ থেকে বোমা ফেললে এদের জীবন বিপন্ন হবে। আমেরিকায় দেখা দেবে নিদারুণ বিক্ষোভ। সাইপ্রাসে আছেন মিশর অভিযানের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার কেইটলি। টেলেক্সে তাঁকে নির্দ্দেশ দেওয়া হল, বোমা বর্ষণ স্থগিত রাখ। কেইটলি বললেন—বোমারু বিমানগুলো রওনা হয়ে গেছে। আবার প্রশ্ন—তোমার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে? উত্তর—হ্যাঁ, আছে। নির্দ্দেশ—তাদের ফিরিয়ে আন। কেইটলি বোমারু বিমানগুলোকে ফিরে আসার নির্দ্দেশ দিলেন। তাদের পুনঃ যাত্রা আরম্ভে ১২ ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। বেন গুরিয়ন এতসব জানতেন না। তিনি ভেবেছিলেন, ইংরাজ চুক্তি ভেঙ্গেছে। নাসের অবস্থার সুযোগ নিতে পারলেন না। কায়রোর বিমান ঘাঁটিতে ছিল তাঁর সোভিয়েট জঙ্গী বিমানগুলো। এগুলো নিয়ে তিনি অনায়াসেই সাইপ্রাসে এবং ইস্রাইলে হানা দিতে পারতেন। মিশরীয় পাইলটদের শিক্ষা তখন সম্পূর্ণ হয়নি। হাতে অস্ত্র থাকা সত্বেও তা ব্যবহারের সুযোগ পেলেন না নাসের।

৩১ শে অক্টোবর। রাত্রে মিশরের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটির উপর সুরু হল বৃটিশ এবং ফরাসী বোমারু বিমানের বোমা বর্ষণ। প্রথম আক্রমণে রানওয়েগুলোতে তারা সৃষ্টি করবে বিরাট বিরাট গর্ত। বিমানবাহী জাহাজগুলোর বিমান বহর মাটিতেই টুকরো টুকরো করে ফেলবে মিশরীয় বিমানগুলো। বিমান ঘাঁটিগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য সাইপ্রাস বেতার নির্দ্দেশ দিল মিশরীয় জনসাধারণকে। আকাশ থেকে চলল ইস্তাহার নিক্ষেপ। ৪৮ ঘণ্টা ধরে বয়ে গেল তাণ্ডবের ঢেউ। সুয়েজ উপসাগরে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ডুবিয়ে দিল একটি মিশরীয় ফ্রিগেট। বোমা বর্ষণ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাসের বুঝলেন বৃটেন ধাপ্পা দেয় নি। তিনি সমর পরিকল্পনা পাল্টালেন। তাঁর ধারনা বৃটিশবাহিনী আলেক-

আলেকজান্দ্রিয়া কিম্বা পোর্টসৈয়দে অবতরণ করবে। ৩১শে অক্টোবর রাত্রিতে তিনি সিনাই থেকে মিশরীয় বাহিনী সরিয়ে আনার হুকুম দিলেন। কায়েরোর চারদিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে উঠল। সুয়েজ খাল এলাকার কর্মীরা এক মাসের আগাম বেতন পেল। তাদের দিয়ে গেরিলাবাহিনী গঠনের উদ্যোগ চলল। সোভিয়েট জঙ্গী বিমান মিগ এবং ইলিউসিনগুলোকে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে সরিয়ে ফেলা হল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪৭টি জাহাজ ডুবিয়ে মিশরীয় ইঞ্জিনীয়াররা সুয়েজ খাল বন্ধ করল। সিরিয় বাহিনীর ইঞ্জিনীয়াররা ইরাকের পাইপ লাইনের তিনটি পাম্পিং ষ্টেশনে বোমা ফাটাল। সুয়েজখাল এবং তেল সরবরাহ ব্যবস্থা দুই-ই অচল হয়ে পড়ল।

১লা নভেম্বর। বোমা বর্ষণের তীব্রতা বেড়েছে। হাজার হাজার ইস্তাহার আকাশ থেকে মিশরের সর্বত্র নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ওগুলোর ভাষা মারাত্মক। জনসাধারণ নাসেরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। বৃটিশ এবং ফরাসী সৈন্যদের হাতে কারও ক্ষমা নেই। সাইপ্রাস বেতার উদ্দাম। তার সুর ভয়ানক কড়া। নাসেরের উপর আস্থা রেখে জনগণ মহাপাপ করেছে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় এসছে। মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর শেষ দিন আগত। যেখানে তাদের পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের উপর বোমা বর্ষিত হবে। এই সাংঘাতিক পরিণাম এড়াবার একমাত্র উপায়—নাসেরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান এবং নূতন সরকার গঠন। বৃটেন এবং ফ্রান্স তাদের সাহায্য দিতে তৈরী। নাসেরের বেতার ভাষণ চরম উত্তাপ সৃষ্টি করল। জনতা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তাদের মুখে একটি মাত্র আওয়াজ—নাসের, নাসের। যুগ যুগ জিও নাসের। মসজিদে মসজিদে চলল প্রার্থনা। কায়রো বেতার কেন্দ্রের উপর বোমা পড়ল। একটি ছাড়া আর সবগুলো ট্র্যান্সমিটার অকেজো হয়ে গেল। ভয়েস অব আরব দুর্বল। কিন্তু সাইপ্রাস বেতার দুর্দান্ত। শার্ক আল আদনা বেতার কেন্দ্র থেকে ফরাসী-বৃটিশের পক্ষে

প্রচার চালাচ্ছিল ফারগুসন। তাঁর বড় লোকাভাব। ভাল আরবী জানা বিঘোষক পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনিও ফ্যাসাদে পড়লেন। স্থানীয় কর্মীরা মিশরের বিরুদ্ধে কাজ করতে রাজী নয়।

সিনাই থেকে মিশরীয় বাহিনীর অপসারণ সুরু হয়েছে। ইস্রাইলী সৈন্য দল তাদের পিছু ধাওয়া করছে। হতাহাতের সংখ্যা বাড়ছে। ফরাসী জঙ্গী বিমানগুলো ইস্রাইলের বিমান ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে। মল্টার বৃটিশ নৌবহর মাঝ দরিয়ায়। তারা এখনও মিশরের উপকূল থেকে পাঁচশো মাইল দূরে। ছত্রীসৈন্যরা সাইপ্রাসেই অপেক্ষা করছে। কিন্তু বৃটিশ সংবাদ পত্রগুলোর বৈদেশিক সংবাদ দাতারা জানাচ্ছেন—ছত্রীবাহিনী সুয়েজ এলাকায় নেমে গেছে। তারা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করছে। তাদের সাফল্যের রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে পাতায় পাতায়। যুগোশ্লা-ভিয়ার রাষ্ট্রদূত গেলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রতিবাদ জানাতে। মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কড়া জবাব পেলেন তিনি। জনৈক বৃটিশ অফিসার রূঢ় ভাষায় তাঁকে বললেন—বৃটেন দীর্ঘদিন পৃথিবীর আধখানা ভূ-ভাগ শাসন করেছে। নীতির উপদেশ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সে নেবে না। আইসেন হাওয়ার তাঁর নির্বাচনী প্রচার স্থগিত রাখলেন। বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট রাতারাতি সাজলেন জেনারেল। ফোনে ডাকলেন ইডেনকে। রীতিমত সৈনিকের ভাষায় তিনি কৈফিয়ত চাইলেন। কাচুমাচু করতে লাগলেন ইডেন। বিরক্ত আইসেন হাওয়ার ফোন ছেড়ে দিলেন। বৃটিশ মন্ত্রীসভার চমক লাগল। তাঁরা ভেবেছিলেন, আইসেন হাওয়ার নির্বাচনে ব্যস্ত থাকবেন। তিনি সুয়েজের দিকে নজর দেবার সময় পাবেন না। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট উল্টো পথ ধরেছেন। ডালেস আরও চটা। মহাযুদ্ধের সময় এবং তার পরে বহু মার্কিন নুন খেয়েছে বৃটেন। আমেরিকার অজ্ঞাতসারে মিশরে চলেছে বৃটিশ অভিযান।

ডালেস প্রমাণ করবেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা বৃটেনের নেই। মার্কিন সমর্থন না পেলে ইডেন অনাথ। বিশ্বসভায় আসামীর কাঠগড়ায় বৃটেন এবং ফ্রান্সকে টেনে আনার উদ্যোগ-আয়োজন চলল। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলো বেপরোয়া। নাসের তাদের একনম্বর শত্রু। শীঘ্রই দু নম্বরের সন্ধান মিলল। তারা নেহরুকে পাকড়াও করলেন। এই ভদ্রলোক কমনওয়েলথে ফাটল ধরিয়েছেন। তিনিই নাসেরের বেসরকারী পরামর্শদাতা। রাগের কারণও ছিল। বি বি সি এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রচার করছিল যে, মিশরের উপর বোমা বর্ষণে প্রাণহানি বেশী হচ্ছে না। দুনিয়ার অন্যতম সভ্য এবং সাংস্কৃতিবান জাতি বৃটিশ। এশিয়া এবং আফ্রিকার অনুন্নত লোকদের মত তারা অযথা মানুষ মারে না। ইংরাজের হিসাবে হতাহতের সংখ্যা যখন একশ'র উপরে ওঠে নি তখন নেহরু ঘোষণা করলেন, বোমা বর্ষণে হাজার হাজার নরনারী মরছে। অমনি সুরু হল গালাগালি। একটি পত্রিকা ডবল কলম হেডিং দিয়ে খবর ছাপালেন—নেহরু সোভিয়েট গুপ্তচর। কমনওয়েলথের গোপন সংবাদ তিনি মস্কোতে পাচার করেন। এই সংস্থা থেকে ভারতকে বার করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অপর ক'টি পত্রিকা কমনওয়েলথের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে মাথা ঘামাতে লাগলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে হলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তারও একটা ফিরিস্তি কোন কোন উৎসাহী দৈনিক প্রকাশ করে ফেললেন। আভ্যন্তরীণ শাসনে যে রাষ্ট্র হবে স্বয়ং শাসিত এবং পররাষ্ট্রনীতিতে মেনে নেবে বৃটিশ নেতৃত্ব সেই রাষ্ট্রই কমনওয়েলথের সদস্য হবার যোগ্য অধিকারী। এ হিসাবে আদর্শ কমনওয়েলথ রাষ্ট্র অষ্ট্রেলিয়া।

ঘটনার গতি নাসেরের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। পিছুহটার সময় তাঁর সৈন্যদল প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। ইস্রাইল গাজা আক্রমণ করে বসেছে। বৃটিশ এবং ফরাসী বাহিনী যে

কোন মুহূর্ত্তে অবতরণ করবে। ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অসম্ভব। গণপ্রতিরোধ ছাড়া উপায় নেই। ওদিকে ইডেনের হিসাবেও গরমিল হয়ে গেছে। আরব রাজনীতি বিশেষজ্ঞ বলে তিনি পরিচিত। আরবী ভাষা তিনি জানেন। জর্ডনের বাদশা হুসেন, ইরাকের নূরী এস সৈয়দ এবং সৌদী কেউ কথা বলার সাহস পাচ্ছেন না। গোটা আরব তুনিয়া নাসেরের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর পতনের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। জাতীয়তাবাদের উত্তাল স্রোতের সামনে দাঁড়াবার সাধ্য কারও নেই। এমন কি বৃটেনকে বাগদাদ চুক্তি থেকে বার করে দেবার কথাবার্তা বলছেন নূরী এস সৈয়দ। জানের মায়া কার না আছে? উল্টো সুরে কথা বললে রক্ষা নেই। আরব তুনিয়ার এ পরিবর্ত্তন নূতন নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই তা চলছে। শুধুমাত্র মিশর নয়, প্রগতিবাদী আরবের নেতা নাসের। বৃটিশ এবং ফরাসী আক্রমণ বিচ্ছিন্ন আরবকে সংঘবদ্ধ করেছে। নাসেরের প্রভাব ব্যাপকতর করে তুলেছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসেছে। বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইস্রাইল আসামীর কাঠগড়ায়। সবাই তাদের মুণ্ডপাত করছে। অস্ত্র সম্বরণ প্রস্তাব ৬৪—৫ ভোটে গৃহীত হল। বৃটেন এবং ফ্রান্স ভোট দানে বিরত রইল। কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিয়ারসন রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দিলেন। এ বাহিনী সুয়েজ এলাকা দখল করবে। কানাডীয় প্রস্তাব যথারীতি অনুমোদন পেল। পিয়ারসন এবং হ্যামারশীল্ড পরিকল্পনা প্রণয়নে মন দিলেন। অসুস্থ ডালেস ক্যানসার অপারেশনের জন্য হাসপাতালে স্থান নিলেন। নিজের তৈরী ফাঁদে আটকে পড়েছিলেন ইডেন। বেরিয়ে আসার একটা পথ তাঁর জন্য খুলে রেখে গেলেন ডালেস।

রাষ্ট্রসংঘের খড়্গ ঝুলছে মাথার উপর। পিনো ছুটে এলেন লণ্ডনে। অবিলম্বে মিশরে সৈন্য নামান দরকার। তা না হলে সুয়েজ

খাল দখলের সময় পাওয়া যাবে না। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী এসে পড়বে। সমর নায়কেরা উদ্বিগ্ন। ফ্রান্স ছত্রীসৈন্য পাঠাতে উৎসুক। বৃটিশ গররাজী। অভিযানকারী জাহাজগুলো এখনও মাঝ দরিয়ায়। মিশরের উপকূলে পৌঁছতে তিন দিন লাগবে। ছত্রীবাহিনী কার সাহায্যের উপর নির্ভর করে এ তিন দিন ঘাঁটি আগলাবে? রসদই বা কে জোগাবে? ইস্রাইল রাজী। কিন্তু বৃটিশ সায় দিচ্ছে না। ইস্রাইলী সাহায্য নিলে গোপন আঁতাতের কথা ফাঁস হয়ে যাবে। বিবদমান পক্ষ দুটোকে তফাৎ রাখার অজুহাত ধ্বসে পড়বে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলছে। কোন সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

মিশরে বোমা বর্ষণের বিরাম নেই। সাইপ্রাস বিমানঘাঁটি কর্মমুখর। প্রতি মিনিটে একটি করে বিমান উঠছে এবং নামছে। মিশরের উপকূল দরিয়ার বিমানবাহী জাহাজগুলো থেকে প্রতি তিন মিনিটে এক একটি করে বিমান ওঠা-নামা করছে। ইংরাজ কথার দাম রাখে। দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ইস্রাইলের সঙ্গে তাদের কোন আঁতাত নেই। এ কথার সত্যতা প্রমাণে তারা জান কবুল করতে রাজী। মিশরীয় ঘাঁটি গুলোর উপর বোমা বর্ষণ করতে গিয়ে জ্বলে উঠল একটি বৃটিশ বিমান। পাইলট প্যারাসুট নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। তার সাহায্যে এগিয়ে গেল ইস্রাইলী সৈন্যরা। অপর একটা বৃটিশ বিমান তাদের উপর মেসিন গান চালাল। ইস্রাইলীরা বিপন্ন বৃটিশ পাইলটকে সাহায্য করছে, এ দৃশ্য কেউ দেখে ফেললে ইডেনের ইজ্জত যাবে। সবাই ভাববে, বৃটিশ ইস্রাইলী আঁতাতের খবর সত্য।

কমন্সসভায় শ্রমিকদল মারমুখী হয়ে উঠেছে। অধিবেশন চালান মুস্কিল। তাদের প্রশ্ন—বৃটেন যুদ্ধে নেমেছে, কি নামে নি। যদি নেমে থাকে তবে জেনিভা কনভেনশন মানা হয়েছে কি না। ইডেনের মুখে জবাব নেই। শ্রমিক দল নাছোড়বান্দা। উত্তর তাদের চাই। মন্ত্রীরা ছুটলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের আইন-পরামর্শদাতার

কাছে। তিনি বললেন—বৃটেন এমন এক অবস্থা ডেকে এনেছে যার কোন আইন সম্মত নজির নেই। শ্রমিক দলের বিক্ষোভ শুধু মাত্র কমন্সসভায় সীমাবদ্ধ রইল না। রাস্তায় রাস্তায় তা ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে আওয়াজ—ইডেন মাস্ট গো। ৪ঠা নভেম্বর ট্র্যাফেলগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হল বিরাট জনসভা। বেভান প্রধান বক্তা। ওয়েলসের এই শ্রমিক নেতাকে ভয় করতেন চার্চিল। তাঁর সরস ব্যাঙ্গোক্তিতে হামেশাই জর্জরিত হতেন তিনি। ইডেন দাঁড়াতে পারতেন না বেভানের সামনে। ট্র্যাফেলগার স্কোয়ারে তাঁর বক্তৃতা অবিস্মরণীয়। ছেলেবেলায় তিনি তোতলা ছিলেন। পরিণত বয়সে তোতলামির ভাব কেটেছিল। বিষম রেগে গেলে তাঁর কথাগুলোর মধ্যে সামান্য জড়তা দেখা দিত। যারা আসল খবর জানত না তারা ওটাকে বৈভানিক ঢং বলে ভুল করত। ভাষণ দিতে দিতে তিনি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণের জন্য একেবারে থেমে গেলেন। কাছেই একদল ভারতীয় দাঁড়িয়েছিল। তাদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন—আপনারা যখন দেশে ফিরে যাবেন তখন আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন, ডাকাতের সর্দার ইডেন গ্রেট বৃটেনের একক প্রতিনিধি নয়। সেখানে শ্রমিক দলও রয়েছে। তারা মনে প্রাণে সুয়েজ অভিযানের বিরোধী।

ইস্রাইলী বাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে তাল রাখতে হলে ফরাসী এবং বৃটিশ বাহিনীকে নির্দ্ধারিত সময়ের আগেই মিশরে নামানো অত্যাবশ্যক। সেনাপতিরা একমত হতে পারছেন না। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিনো এবং জেনারেল চালে দুদিন ধরে লণ্ডনে বসে রয়েছেন। ইডেন কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। যখন তখন তিনি সেনাপতিদের ফোনে ডেকে পাঠাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক প্রস্তাব দিয়ে তাদের বেকায়দায় ফেলছেন। ছত্রীবাহিনীর অবতরণের সময় এগিয়ে আনা যায় কিনা তা জানার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী এণ্টনী

হেড গেলেন সাইপ্রাসে। তিনি দেখলেন, বৃটিশ এবং ফরাসী কম্যাণ্ডাররা বির্তকে মেতে আছেন। গত ১২ ঘণ্টা ধরে চলছে এই বিতর্ক। অবশেষে ঠিক হল, ৫ই নভেম্বর সকালে পোর্টসৈয়দে ছত্রীসৈন্য অবতরণ করবে। ৬ই নভেম্বর সুরু হবে নৌ-বহরের গোলা বর্ষণ।

কুড়ি

এই সিদ্ধান্ত নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খবর এল, ইস্রাইলরাষ্ট্র-সংঘের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অস্ত্র সম্বরণে রাজী। রাজী না হবারকোন কারণ নেই। অভিযান তাদের সম্পূর্ণ। গাজা ইস্রাইলের দখলে। আকাবার প্রবেশ মুখে শার্ম এল শেখ তাদের হাতের মুঠোয়। ইস্রাইলী জাহাজের গতিবিধির পথ নিষ্কণ্টক। অনাবশ্যক রাষ্ট্রসংঘের বিরাগভাজন হয়ে লাভ কি? খবরটা শুনেই ইডেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। বৃটিশ এবং ফরাসী সৈন্য মিশরে অবতরণই করে নি। এ সময় যদি ইস্রাইল অস্ত্র সম্বরণ করে তবে বিবদমান পক্ষ দুটিকে তফাৎ রাখার কোন সুযোগই তারা পাবে না। সুয়েজ দখলও হবে না। নাসেরও যথাস্থানে থেকে যাবে। এতদিনের আয়োজন পণ্ড হতে বসেছে। ইস্রাইলকে থামাতে হবে। দুচারদিনের মধ্যে অস্ত্র সম্বরণে রাজী হলে চলবে না। বৃটেন এবং ফ্রান্সকে সুয়েজ দখলের সুযোগ দিতে হবে। মলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ইডেন। ইস্রাইলের উপর ফরাসী প্রভাব খুব বেশী। মলের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না বেন গুরিয়ন। তিনি ভালভাবেই জানেন যে, ইস্রাইল অস্ত্র সম্বরণ করলে বৃটেন এবং ফ্রান্স বিবদমান পক্ষ দুটিকে তফাৎ রাখার কোন অজুহাত পাবে না। তাদের সুয়েজ দখলও হবে না। বেন গুরিয়ন অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৫ই নভেম্বর সকালে ছয়শো বৃটিশ এবং প্রায় পাঁচশো ফরাসী

ছত্রীসৈন্য পোর্টসৈয়দের অদূরে অবতরণ করল। উপকূলদরিয়ায় টহল দিচ্ছিল বিমানবাহী জাহাজগুলো। ছত্রীসৈন্য নামার আগে তাদের বিমানগুলো বন্দরের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করেছিল। বিমান আক্রমণে মিশরীয় প্রতিরোধ ঘাঁটিগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল। দুপুরের দিকে নামল দ্বিতীয় দল। উপকূল রক্ষীদের কাছ থেকে এল প্রচণ্ড বাধা। বেশীক্ষণ প্রতিরোধ চালান তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিমান আক্রমণের তীব্রতা বাড়ছে। জল সরবরাহ ব্যবস্থা অচল। বাইরের সাহায্য মিলবে না! তারা একেবারেই অবরুদ্ধ। স্থানীয় মিশরীয় কম্যাণ্ডার এল মোগেরের মতিগতি সন্দেহজনক। তাঁর পূর্ব প্রস্তুতি মোটেই ছিল না। লড়াইএর উৎসাহ তিনি সৈন্যদের দেন নি। আত্মসমর্পণের জন্য তিনি যেন অপেক্ষা করছিলেন। সারাদিন ইতস্তত লড়াই চলল। বিকেলে মোগের বৃটিশ সেনাধ্যক্ষের কাছে খবর পাঠালেন, তিনি আত্মসমর্পনের আলোচনা আরম্ভে রাজী। লণ্ডনে কমন্সসভার অধিবেশন বসেছে। চারদিকে তুমুল উত্তেজনা। এমন সময় সেখানে খবর পৌঁছল, নাসের আত্মসমর্পন করেছেন। রক্ষণশীল দলের সদস্যরা আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন। হাতের কাগজগুলো তাঁরা শূন্যে উড়োতে লাগলেন। প্রচণ্ড উল্লাসে কমন্সসভা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। শ্রমিক দলের সদস্যগণ হতবাক। কি এমন কাণ্ড ঘটে গেল তাঁরা ঠাহর করতে পারছিলেন না। রক্ষণশীল দলের সদস্যরা বাগ মানছেন না। রুল বৃটানিয়া গাইবার জন্য তাঁদের গলায় সুড়সুড়ি লেগেছে। আওয়াজটা প্রায় বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ সব থেমে গেল। মুখের হাসি চাপা পড়ল। ধীরে ধীরে তারা আসনে বসলেন। ভূয়া খবর এসেছিল। নাসের আত্মসমর্পন করেন নি। পোর্টসৈয়দের মিশরীয় সেনাধ্যক্ষ আত্মসমর্পন করতে চেয়েছিলেন। নাসের তাঁকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছেন। জনসাধারণের হাতে রাইফেল দেওয়া হচ্ছে। তারা গেরিলা যুদ্ধ

চালাবে। লাউড স্পীকারে নাসেরের নির্দেশ পোর্টসৈয়দের সর্বত্র জানানো হচ্ছে। নৈরাশ্য দেখা দিল রক্ষণশীল মহলে। নাসের হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও ছিটকে বার হয়ে চলে গেলেন।

৫ই নভেম্বর সন্ধ্যা। লণ্ডনে থমথমে ভাব। নাসের উচ্ছেদের প্রচণ্ড উল্লাসে হঠাৎ যেন চ্ছেদ পড়ল। বুলগানিন হুমকি দিয়েছেন। তিনি ইডেন, মলে এবং বেন গুরিয়নকে লিখেছেন, সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণকারীদের গুড়িয়ে ফেলতে তৈরী। প্রয়োজন হলে সে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র প্রয়োগেও পিছু পা হবে না। ইস্রাইলের নাম মানচিত্র থেকে একেবারে মুছে যাবে। আগেই গুজব রটেছিল, সোভিয়েট রাশিয়া স্বেচ্ছা সৈন্যদল গড়ছে। তারা মিশরে রওনা হবার আয়োজন করছে। দুএকজন প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতা সোভিয়েট স্বেচ্ছা সৈনিকদের একাংশকে সিরিয়ায় দেখে এসেছেন। শ্রমিকদল দ্বিগুণ তেজে দাবী জানাল— ইডেন গদী ছাড়। জংলী নীতি বন্ধ কর। রক্ষণশীল দলেও দানা বেঁধে উঠল চাপা বিদ্রোহ। দুনিয়ার ধিক্কার এবং সোভিয়েট হুমকি তাদের পাগল করে তুলেছিল। নাটিং আগেই পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের জন্য অনেকেই কিউতে দাঁড়ালেন। রক্ষণশীল দলের একাংশ প্রকাশ্যে যুদ্ধ বিরতির দাবী জানালেন। প্যারিসের মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডগলাস ধীলন রাত্রে দেখা করলেন মলের সঙ্গে। তাঁকে তিনি বললেন—ফ্রান্স যদি তার নিজের খুশীমত চলে তবে সঙ্কটের সময় মার্কিন সাহায্যের প্রত্যাশা না করাই যুক্তিযুক্ত। বুলগানিন আর একটি চিঠি লিখলেন প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের কাছে। তাতে তিনি বললেন, বিবদমান পক্ষ মিশরীয় এবং বৃটিশ-ফরাসী-ইস্রাইলী আঁতাতের সৈন্যবাহিনীকে তফাৎ রাখার জন্য মার্কিন-সোভিয়েট যৌথবাহিনী মিশরে পাঠান দরকার। প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। গভীর রাত্রে লণ্ডন থেকে টেলিফোন

এল। অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে ইডেন। প্রেসিডেন্টকে তাঁর বড় দরকার। সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করলে বৃটেনের জন্য পারমাণবিক ছত্রছায়া চাই। আইসেন হাওয়ার তাঁকে বললেন, ন্যাটোর সর্ত এবং রাষ্ট্রসংঘের সনদের বাইরে তিনি যাবেন না। পরের দিন হুলুস্থুল বেধে গেল। রক্ষণশীল দলের এম. পি'রা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতির দাবী জানাতে লাগলেন। যারা যুদ্ধ চান না তাদের নেতৃত্ব নিলেন ম্যাকমিলান। তিনি মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন। পাউণ্ডের দাম কমে গেছে। বাজারে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন অর্থদপ্তর বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে বৃটেনকে টাকা তুলতে দিচ্ছে না। বেশ কিছুদিন ধরেই পাউণ্ডের উপর চাপ চলছিল। অর্থমন্ত্রী ম্যাকমিলান তা গোপন রেখেছিলেন। তিনি এক সময় মিশর আক্রমণের জন্য ওঠে পড়ে লেগেছিলেন। এখন আবার যুদ্ধ থামাবার জন্য জান কবুল করেছেন। ইডেনের পথে বসতে দেরী নেই। ম্যাকমিলানের কূটনৈতিক চালে তিনি পরাজিত। প্রধানমন্ত্রীর আসনের দিকে ক' কদম এগিয়ে গেলেন ম্যাকমিলান।

৬ই নভেম্বর। বৃটিশ এবং ফরাসী নৌবহর পোর্টসৈয়দের কাছাকাছি দরিয়ায় পৌঁছল। আরম্ভ হল বন্দরের উপর গোলা বর্ষণ। ভোরের দিকে বৃটিশ বাহিনীর প্রথম দল পাড়ে নামল। ফরাসীরা পোর্টফুয়াদ দখল করল। মিশরীয় বাহিনীর সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু গেরিলাদের গুলি বর্ষণের তীব্রতা বাড়ল। কানতারা এবং ইসমাইলিয়ায় ছত্রীবাহিনী নামানোর কথা ছিল। মিশরীয় প্রতিরোধের দৃঢ়তা দেখে এ পরিকল্পনা বাতিল করা হল। বিকালের দিকে পোর্টসৈয়দ আত্মসমর্পণ করল। ব্রিগেডিয়ার বাটলার ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে ছুটছেন সুয়েজের দিকে। পথে মিশরীয় সৈন্যদল বাধা দিচ্ছে। সুয়েজ খালের উত্তর প্রান্তে পোর্টসৈয়দ দক্ষিণ প্রান্তে সুয়েজ।

উত্তর প্রান্ত বৃটিশ এবং ফরাসীদের দখলে। দক্ষিণ প্রান্ত দখল না করা পর্যন্ত সুয়েজ খাল দখল সম্পূর্ণ হয় না। জীবন মরণ পণ করে ব্রিগেডিয়ার বাটলার ছুটছেন। সময় হাতে নেই। যে কোন সময় যুদ্ধ বিরতির হুকুম এসে যেতে পারে।

ইডেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। সহরে গুজব রটেছে তুরস্কের উপর দিয়ে সোভিয়েট জঙ্গী বিমান .সিরিয়ায় উড়ে গেছে। সেখানে সোভিয়েট স্বেচ্ছা সৈন্য জড় হচ্ছে। আইসেন হাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বারা বৃটেন এবং ফ্রান্স আক্রান্ত হলে ন্যাটোর শরিক হিসাবে আমেরিকার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। সোভিয়েট রাশিয়া হয়ত খাস বৃটেন এবং ফ্রান্স আক্রমণ না করে মিশরে তাদের যৌথ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবে। এক্ষেত্রে হয়ত ন্যাটোর দায়িত্ব আমেরিকার উপর বর্ত্তাবে না। ইস্রাইলের সঙ্গে একজোট হয়ে মিশরে অভিযান চালিয়ে ইডেন নিজে ১৯৫০ সালের ত্রিদলীয় চুক্তি ভেঙ্গেছেন। ন্যাটোর আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের উপর চাপ দেবেন কোন মুখে? ত্রিশজন রক্ষণশীল এম. পি বিদ্রোহ করেছেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ম্যাকমিলান। পাউণ্ড সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পরিত্রাণ করতে পারে একমাত্র আমেরিকা। ইডেন আবার প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। প্রেসিডেণ্ট তাঁকে সাফ বলে দিলেন, অস্ত্র সম্বরণে সম্মত হলেই বৃটেনের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ৩০ কোটি পাউণ্ড ঋণের ব্যবস্থা আমেরিকা করবে। মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল। অস্ত্র সম্বরণ ছাড়া কোন পথ খোলা নেই। অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া চোখ রাঙাচ্ছে। আমেরিকা ভরসা দিচ্ছে না। ইডেনের লালচে মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। ডালেস প্রমাণ করেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার এবং খুশীমত চলার

ক্ষমতা বৃটেনের নেই। সোভিয়েট রাশিয়া তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, গ্রেট বৃটেনের গ্রেট কথাটি অনেক আগেই খসে পড়েছে। তার জায়গায় বসেছে লিটল কথাটি। অর্থাৎ গ্রেট বৃটেন পরিণত হয়েছে লিটল বৃটেনে। মন্ত্রীসভা অস্ত্র সম্বরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। রাত্রি ১২টায় তা কার্যকর হবে।

সমর নেতাদের পরামর্শ চাওয়া হল না। তাঁরা কিছুই জানতেন না। ইডেন ফোনে মলেকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। কোন তর্কের অবকাশ পেলেন না মলে। বৃটেনকে বাদ দিয়ে তিনি একা কিছু করতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সও অস্ত্র সম্বরণে সম্মতি জানাল। পোর্টসৈয়দ থেকে বৃটিশ অগ্রবর্তীদল দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে। সুয়েজ তখনও বহু দূরে। মাত্র ২৫ মাইল যাবার পরই বেতারে যুদ্ধ বিরতির সংবাদ এল। সুয়েজ খাল দখল অসম্পূর্ণ রইল। বৃটিশ প্রচারকরা বলতে লাগলেন, আর ক'ঘণ্টা সময় পেলেই বৃটিশবাহিনী গোটা খাল দখল করতে পারত। সেনাধ্যক্ষেরা ততখানি আশাবাদী ছিলেন না। ইসমাইলিয়ায় বাধা দেবার জন্য মিশরীয় বাহিনী ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। বিমান বিধ্বংসী কামান তারা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করছিল। অগ্রবর্তী দলের এগিয়ে যাওয়া এক কথা, আর সারা এলাকার যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখা অন্যকথা। গেরিলারা অবশ্যই নাশকতামূলক কাজ চালাত। তারা বৃটিশ এবং ফরাসী সৈন্যদের সহজে প্রতিষ্ঠিত হতে দিত না।

রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী সুয়েজের দখল নেবে। এ বাহিনী পৌঁছতে হয়ত ক'দিন দেরী হবে। ইডেন নূতন চাল দিলেন। তিনি বললেন, বৃটিশ এবং ফরাসী বাহিনীই রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীতে পরিণত হতে পারে। আক্রমণকারী রাতারাতি সাজবে নিরপেক্ষ শান্তিরক্ষক। ইডেন মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। ঘা খেয়েও তাঁর

সম্বিত ফেরে নি। তিনি কড়া উত্তর পেলেন, একজন বৃটিশ কিম্বা ফরাসী সৈন্য মিশরে থাকতে পারবে না। যথা সময়ে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী সুয়েজ অঞ্চলে হাজির হল। সুয়েজ খাল অবরুদ্ধ: জাহাজ ডুবিয়ে ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খাল পরিষ্কার এবং চালু করতে সময় লাগবে। ইডেন আবার প্রস্তাব দিলেন, বৃটিশ এবং ফরাসী ইঞ্জিনীয়াররা রাষ্ট্রসংঘের তদারকীতে খাল পরিষ্কার করে দেবে। মিশরের হুঁশিয়ারী—বৃটিশ সৈন্য কিম্বা ইঞ্জিনীয়ারদের গায়ে যার ইউনিফর্মই থাক না কেন, তাদের দেখলেই গুলি করা হবে। রাষ্ট্রসংঘ ইডেনের শেষ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল। ইস্রাইল তার পুরনো সীমান্তে ফিরে গেল। আকাবা উপসাগরে সে অবাধ জাহাজ চলাচলের অধিকার পেল। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বৃটিশ এবং ফরাসী বাহিনী পোর্টসৈয়দে টিকে রইল। গেরিলাদের ভয়ে তারা রাস্তায় বেরুত না। দলবেধে আরব এলাকায় হাঙ্গামা করতে যেত। তাদের কাউকে একা পেলেই আরবরা ধরে ঠ্যাঙ্গাত। পোর্টসৈয়দ ছেড়ে আসার আগে বৃটিশ এবং ফরাসী সৈন্যরা সংঘবদ্ধ লুঠপাট চালাল। লুটের মাল নিয়ে তারা জাহাজে উঠল। বৃটিশ সম্পত্তি এবং প্রভাব যা কিছু মিশরে ছিল সব খুইয়ে চূড়ান্ত অপমানের মধ্যে সৈন্যদল আবার সাগর পাড়ি দিল।

নাসের যুদ্ধে হারলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা ধরা পড়ল। বিমান বহর কর্মবিমুখতার প্রমাণ দিল। পোর্টসৈয়দের সেনাধ্যক্ষের প্রাণদণ্ড হল। কিন্তু নাসেরের নৈতিক বিজয় সম্পূর্ণ। আফ্রো-এশিয়ায় তিনিই একমাত্র নেতা যিনি গোটা পশ্চিম ইউরোপের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস রাখেন। সুয়েজ খালের উপর তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। ছ'দিন আঠার ঘণ্টা চলেছিল সুয়েজের লড়াই। সমর-নেতা হিসাবে নাসেরের কৃতিত্ব তেমন কিছু চোখে পড়েনি। অল্প সময়ের মধ্যে মিশরীয় বাহিনীকে

ঢেলে সাজান হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধির অবিনশ্বর স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন সুয়েজ সঙ্কটের দিনগুলোতে। তাঁর সমর্থনে বিশ্বজনমত গড়ে উঠতে দেরী লাগে নি। বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন তিনি সোভিয়েট রাশিয়াকে। জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো ছিল তাঁর সহায়। আরব দুনিয়ায় নাসেরের শ্রেষ্ঠ অবদান ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ। জনমানসে এই সব চেতনার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল মিশরে পশ্চিমী অভিযানের সময়। ইরাকের তেলের পাইপ উড়িয়ে দিয়েছিল সিরিয়া। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সুয়েজ খাল অচল হয়েছিল। জাতির চরম দুর্দ্দিনে নাসের এবং জনতা কখনও আত্মবিশ্বাস হারান নি। বৃটিশ এবং ফরাসীর অবিরাম বোমা বর্ষণের মধ্যেও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ভেঙ্গে পড়ে নি। অপর পক্ষে ইডেন দেখিয়েছিলেন চরম অদূরদর্শিতা। সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় তাঁর মন ছিল আচ্ছন্ন। আরবীয় জাতীয়তাবাদের সঠিক মূল্যায়ণ ইডেনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সামরিক অভিযানের পিছনে থাকা দরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ইডেন কিম্বা মলের মনে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারনা ছিল না। মিশর দখল ছাড়া সুয়েজ খাল দখলে রাখা যায় না। বৃটেন এবং ফ্রান্স এ কথাটি বুঝতে চায় নি। মিশরীয় সৈন্যবাহিনী রাজনৈতিক সচেতন। তাদের হাতেই শাসন ক্ষমতা। নাসেরকে বাদ দিয়ে মিশরে দ্বিতীয় সামরিক নেতা খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। বিশ্বাস-ঘাতকদের নিয়ে কারবার করতে চেয়েছিলেন ইডেন। নাসেরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের যুগ শেষ হয়েছে। ইতিহাসের চাকা আর পিছন দিকে ঘুরবে না। বকেয়া যুগের নেতা ইডেনের মাথায় আধুনিক যুগের চিন্তাধারা ঢোকে নি। অথচ তাঁর দম্ভ তিনি প্রাচ্য রাজনীতি বিশারদ। কারণ তিনি আরবী ভাষা জানেন এবং হিন্দীরও দুচারটি শব্দ আয়ত্ত করেছেন।

একুশ

সুয়েজের পর বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পটভূমিতে দাঁড়াল এসে মিশর। সে আরব এবং আফ্রিকার যোগসূত্র। ভৌগেলিক অবস্থানে মিশর আফ্রিকান এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সে আরব। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন নাসের। তাঁর সংগ্রাম প্রত্যেকটি পরাধীন জাতির সংগ্রাম। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে তাদের আশ্রয় এবং প্রেরণার স্থল মিশর। জাতীয়তাবাদী পলাতক নেতাদের আশ্রয় দিচ্ছেন নাসের। উগাণ্ডার জাতীয় কংগ্রেসের নেতা জন কালে, ক্যামারুণের ফেলিক্স মৌমি প্রভৃতি কত বিপ্লবী নেতা সাময়িক বাসা বেঁধেছেন কায়রোতে। নাসেরের ঢালা হুকুম—এশিয়া এবং আফ্রিকার মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে কোন নেতা মিশরে এলেই তিনি পাবেন আশ্রয়, মাসিক একশ পাউণ্ড (মিশরীয়) হাত খরচা এবং মিশর পরিক্রমার ফ্রি টিকেট। এই সঙ্গে থাকবে কায়রো বেতার থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচারের সুযোগ। আলজেরিয়ার মুক্তি' যোদ্ধাদের নেতা বেন বেলা বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন মিশরে। অমানুষিক অত্যাচার চলছিল আলেজেরিয়ার স্বাধীনতা সৈনিকদের উপর। ফরাসী বর্বরতার নির্মম কাহিনী প্রচার করত কায়রো বেতার। আর্থিক এবং সামরিক সাহায্য নাসের পাঠাতেন আলজেরিয়ায়। কেনিয়ায় চলছিল মুক্তি সংগ্রাম। বৃটিশ তার নাম দিয়েছিল মাও মাও বিদ্রোহ। জমু কেনিয়াত্তার হয়েছিল কারাবাস। আশী হাজার নর নারীকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার রেখেছিলেন বিনা বিচারে আটক। তাদের উপর চলত অকথ্য নির্যাতন। আট শতাধিক মুক্তি যোদ্ধাকে রাস্তার দু'পাশে গাছের ডালে ফাঁসীর দঁড়িতে ঝুলিয়ে প্রদর্শনী দেখিয়েছিলেন তাঁরা। গুলি করে মেরেছিলেন প্রায় দেড়

হাজার নর-নারীকে। এ বীভৎস কাহিনী দুনিয়া জেনেছিল কায়রোর মাধ্যমে। এডেনের মুক্তিকামীরা বিনা বিচারে আটক ছিলেন ইংরাজের জেলে। তাদের উপর চলত বেত্রাঘাত। নাসের এসব নির্যাতীতের অকৃত্রিম বন্ধু। তার কণ্ঠে এবং কায়রো বেতারে ধ্বনিত হত তীব্র প্রতিবাদ। ইংরাজ তাঁকে ভয় করত। নাসের উচ্ছেদের তাই তাদের এত আয়োজন।

নাগিবের পতনের পর সর্বময় ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন নাসের। একনায়কত্বের বিপদ তিনি জানতেন। মিশরকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংবিধান তিনি দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে সংবিধান তৈরী করেছিলেন তিনি। গঠিত হয়েছিল নূতন মন্ত্রীসভা। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের আগেই এসে পড়েছিল সুয়েজ সঙ্কট। বেশীদূর এগুতে পারেননি নাসের। ঝামেলা কিছুটা মিটেছে। আভ্যন্তরীণ-প্রশাসনে মন দেবার সময় এসেছে। কিন্তু আরব দুনিয়ায় দেখা দিল আর একটি উপসর্গ। সুয়েজ লড়াইএর আগে রাজতন্ত্রীরা ভেবেছিলেন, বৃটিশবাহিনী নাসেরকে খতম করবে। তারা হবেন নিষ্কণ্টক। সুয়েজের পরে বইতে লাগল জোরাল উল্টো হাওয়া। মিশরের বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা এবং সাধারণতন্ত্রী মতবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। যুদ্ধে পরাজিত নাসেরের মাথায় তারা পরিয়ে দিয়েছিল বিজয়ীর মুকুট। প্রকাশ্যে তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারও ছিল না। রাজতন্ত্রীরা প্রমাদ গণলেন। সুরু হল নূতন ধরণের ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নূরী এস সৈয়দ। তাঁর সহযোগী সৌদী আরবের বাদশা সৌদ এবং জর্ডনের বাদশা হুসেন। এদিকে আমেরিকার মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিল। পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব বাড়ছিল। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মস্কো। মার্কিন তৈলস্বার্থ বিপন্ন হবার অংশঙ্কায় প্রেসিডেণ্ট আইসেন-

হাওয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভাবলেন, নাসেরকে সামনে রেখে সোভিয়েট রাশিয়া আরবে পশ্চিমী পুঁজীবাদের উচ্ছেদ ঘটাবে। ডালেস নিজে সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁর ধারণা, এই রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থানের দেরী নেই। ইডেনের মতই মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষও পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা বিশ্লেষণে ভুল করলেন। জোট নিরপেক্ষতার বনিয়াদ সেখানে ছিল শক্ত। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। নিজস্ব স্বতন্ত্র্য পথে চলছিল প্রগতিবাদী আরব রাষ্ট্রগুলো। ১৯৫৭ সালের ৮ই জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করলেন তাঁর ঐতিহাসিক ডক্‌ট্রিন। কমিউনিজম প্রতিরোধে যারা মার্কিন সাহায্য চাইবে তারা তা পাবে। সাহস পেল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো। তারা প্রকাশ্যে নাসেরের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে লাগল। জর্ডনের বাদশা হুসেনের ভয় সবচেয়ে বেশী। তাঁর প্রজাদের এক বিরাট অংশ প্যালেস্টাইনী আরব। ওরা মনে প্রাণে নাসের সমর্থক। হুসেনের ভরসা বেছুইন বাহিনী। এরা রাজতন্ত্রী এবং সিংহাসনরক্ষী। প্রধানমন্ত্রী নবুলসি জাতীয়তাবাদী। জর্ডনের উপর ইংরাজের ফোপর দালালী তাঁর অসহ্য। নবুলসির মন্ত্রীসসভা মিশর সমর্থক। বাদশা হুসেন অস্বস্তিতে দিন কাটান। তিনি ভাবেন, নবুলসির মাধ্যমে জর্ডন শাসন করছেন নাসের। আরবের বাদশারা মিশরের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন লেবাননের খৃষ্টান প্রেসিডেণ্ট চামুন। মনে বল পেলেন বাদশা হুসেন। তিনি নবুলসি মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিলেন।

সৌদী আরবের সৌদী গোড়া মুসলমান। সংবিধান জাতীয় কোন কিছু তাঁর রাজ্যে নেই। বাদশার ব্যক্তিগত তহবিল সৌদী আরবের সরকারী ট্রেজারী। আয় ব্যয়ের হিসাব কেউ

রাখে না। রাখলেও সে-খবর কেউ জানেনা। তেলের রয়ালটি দেয় আমেরিকা। বাদশা মরুভূমিতে বানান জলঢাকা প্রাসাদ। সৌদীকে ভয় করে প্রজারা। ভালবাসে নাসেরকে। বাদশা সর্বত্র দেখেন নাসেরের ছায়া। তাঁর সিংহাসন মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। জঙ্গী বিমানের উপর বাদশার বড় শ্রদ্ধা। এ গুলো হাতে থাকলে গদীচ্যুতির আশঙ্কা নেই। বৃটেন থেকে সৌদ কেনেন জঙ্গীবিমান। মোটা মাইনে দিয়ে রাখেন বৃটিশ পাইলট। দেশী পাইলটদের বিশ্বাস নেই।

প্রেসিডেণ্ট চামুন পশ্চিমী ঘেষা। তিনি খৃষ্টান। লেবাননের জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক খৃষ্টান। শিক্ষায় এরা উন্নত। ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি প্রায় সব কিছুই এই সম্প্রদায়ের ধনীদের হাতে। আরবের জাতীয়তাবাদ তাদের অপছন্দ। মুষ্টিমেয় ধনী ছাড়া লেবাননের মুসলমান মাত্রই নাসের সমর্থক। খৃষ্টান তরুণদের মধ্যেও তাঁর প্রভাব বাড়তির মুখে। সুয়েজ সঙ্কটের সময় যারা কোনক্রমে গোপন উল্লাস চেপে রেখেছিলেন চামুন ছিলেন তাদের একজন। নাসেরের পতন কামনায় বাদশাদের সঙ্গে হাত মেলাতে তিনি পিছ পা' নন।

আইসেন হাওয়ার ডক্‌ট্রিন ব্যর্থ। সিরিয়ায় বামপন্থী রাজনীতির প্রাধান্য দেখে তিনি চঞ্চল হয়েছিলেন। ইরাকের নূরী এস সৈয়দের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সিরিয়ায় প্রতিবিপ্লব ঘটাবার আপ্রাণ চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি। ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়েছে। পুলিশ কঠোর না হলে দামাস্কাসের রাস্তায় জনতার হাতে তাদের অপমৃত্যু হত। আরবদের চোখে নাসের তাদের মর্যাদার প্রতীক। মিশরকে তিনি ইংরাজের প্রভাব মুক্ত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে তিনি সুয়েজ খাল ছিনিয়ে নিয়েছেন। জন সাধারণের মনে জেগেছে নব কল্পনা। বিচ্ছিন্ন আরব সংঘবদ্ধ হবে নাসেরের নেতৃত্বে। উপেক্ষিত পশ্চিম এশিয়া ফিরে পাবে তার

পূর্ব মর্যাদা। সিরিয়ার শাসনভার বাথ সোস্যালিস্টদের হাতে। তারা চায় মিশরের সঙ্গে সিরিয়ার মিলন। এ আকাঙ্ক্ষার কারণ ও ছিল।

১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাথ সোস্যালিস্ট পার্টি। আক্রাম হারানির সোস্যালিস্ট পার্টি এবং মিচেলে আফ্লাক ও সালাহ বিতারের বাথ (রেনেসাঁ) পার্টির সমন্বয়ে গঠিত এই দল। আফ্লাক বাথ-সোস্যালিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা। মার্ক্সবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সংস্কারবাদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল দলীয় চিন্তাধারা। লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন এবং ইরাকে এদের সমর্থক সংখ্যা কম ছিল না। মিশরে বাথ সোস্যালিস্টদের অনুপ্রবেশ ঘটে নি। সিরিয়াতে বুদ্ধিজীবী মহলে এ দলের প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ। হারানি এবং বিতার, দুজনেই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেছিলেন। সৈন্যবাহিনীতে এদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের অনেকেই বাথ সোসালিষ্ট পার্টির সদস্য। ফলে ক্ষমতা দখলে কোন অসুবিধা হয় নি। সিরিয়ায় দলীয় শাসন কায়েম করতে হলে দরকার জনতার সমর্থন। একমাত্র নাসেরই জোগাড় করতে পারেন বাঞ্ছিত গণ-সহানুভূতি। নাসেরের সমাজতন্ত্রবাদ এবং বাথ সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে অমিল বেশীকিছু ছিল না। সিরিয় নেতারা ভেবেছিলেন, নাসেরের নেতৃত্ব তাদের দেবে জনপ্রিয়তা এবং বিনিময়ে তাঁরা দেবেন তাঁর প্রতি আনুগত্য। স্থানীয় দলের হাতেই থাকবে প্রশাসন। নাসের প্রথমে বেশী আগ্রহ দেখান নি। ফেডারেশনের বদলে তিনি চেয়েছিলেন কনফেডারেশন। জনতার চাপ তীব্র। সিরিয় নেতারা ফেডারেশনের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গড়ে উঠল মিশর-সিরিয়া ফেডারেশন। যৌথ রাষ্ট্র নিল নূতন নাম—সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক।

চমক লাগল প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোর। সৌদীআরবের বাদশা নাসেরকে ঘায়েল করার জন্য ওঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাঁর পিছনে

ছিল বৃটেন। হঠাৎ সংবাদ বেরুল নাসের হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটছেন সৌদী। আরবদুনিয়া উত্তাল হয়ে উঠল। খাস সৌদী আরবে প্রজাবিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিল। সৌদের বিরুদ্ধে ঘটল প্রাসাদ বিপ্লব। তিনি সিংহাসন ছাড়লেন। বাদশা হলেন তাঁর ভাই ফয়জল। তিনি অপেক্ষাকৃত প্রগতিবাদী। নাসের বিদ্বেষ তাঁর কম। কিন্তু ক্ষেপে উঠলেন ইরাকের নূরী এস সৈয়দ। বৃটিশ আশ্রিত তিনি। সুয়েজের আগে ভয়ডর তাঁর ছিল না। সুয়েজের পর তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। মিশর এবং সিরিয়ার মিলন তাঁর সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য তিনি তৈরী করলেন জর্ডন-ইরাক ফেডারেশন। রাজতন্ত্রী ফেডারেশন রণচণ্ডীমূর্ত্তিতে দাঁড়াল সাধারণতন্ত্রী ফেডারেশনের সামনে। একটির পিছনে বৃটেন এবং আমেরিকা। অপরটির পিছনে গোটা আরবের সংগ্রামী জনতা।

সুয়েজ সঙ্কটের সময় লেবাননে তৈরী হয়েছিল গৃহযুদ্ধের পটভূমি। আরব জনতা তাদের খৃষ্টান প্রেসিডেন্টের বৃটিশঘেষা নীতি পছন্দ করেনি। গণবিদ্রোহের উস্কানি দিচ্ছিল সিরিয়া। বৃটিশ-ফরাসী বাহিনী মিশর ছাড়ার পর অবস্থার অবনতি ঘটল। যে কোন সময় রক্তারক্তি সুরু হতে পারে। নূরী এস সৈয়দ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন চামুনকে। সামনাসামনি আঘাতের ক্ষমতা তাঁর নেই। ষড়যন্ত্র একমাত্র সম্বল। জর্ডনে নাসের সমর্থকরা উত্তেজিত। নবুলসির অপসারণে তারা ক্ষুব্ধ। বাদশাকে তারা চায় না। হুসেনের সিংহাসন বিপন্ন। নূরী মৌকা পেলেন। তাঁর প্ররোচনায় জর্ডন-সিরিয় সীমান্তে ইতস্তত সংঘর্ষ চলল। জর্ডনের সামরিক সাহায্য দরকার। ওটা একটা অছিলা। নূরীর আসল মতলব জর্ডনের সীমান্ত দিয়ে সিরিয়া আক্রমণ। এবার তাঁর সহায় বৃটেন এবং আমেরিকা। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল করিম কাসেম এবং কর্ণেল আবদুল সালাম

আরেফকে তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে জর্ডনের পথে রওনা হবার হুকুম দিলেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাসেম তাঁর সৈন্যদল নিয়ে জর্ডনের পথ ধরলেন। ভিতরে ভিতরে বারুদের স্তূপ জমা হচ্ছিল। মিশরের ফ্রী অফিসারদের ছোঁয়াচ লেগেছিল তাদের গায়ে। নূরী এস সৈয়দ এবং বাদশা ফয়জলের বৃটিশপ্রীতি সাধারণ সৈনিকদের পাগল করে তুলেছিল। তরুণ অফিসাররা হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী। মিশরের অনুকরণে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল তাদের প্রস্তুতিপর্ব। নাসেরের বিপ্লবের পিছনে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। ইরাকে ছিল বাথ সোস্যালিস্ট পার্টি। সৈন্যবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের প্রভাব। সিরিয়ার শাসনকর্তা বাথ সোস্যাইলিস্ট পার্টি। তাদের বিরুদ্ধেই অভিযান চালাবার জন্য নূরী পাঠিয়েছিলেন ইরাকী সৈন্যদল। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার ফন্দী। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাসেম এবং কর্ণেল আরেফ ভালভাবেই বুঝেছিলেন নূরী এস সৈয়দের মতলব। সৈন্য-বাহিনী মার্চ করছে জর্ডনের পথে। বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের বুটের আওয়াজ। চলতে চলতে তারা ধরল বাগদাদের রাজ-প্রাসাদের রাস্তা। রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। জনপথ প্রায় ফাঁকা। কাসেমের বাহিনী নিঃশব্দে ঘেরাও করল বাদশা ফয়জলের প্রাসাদ। প্রহরীরা সতর্ক হল। বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। গুলি বর্ষণের সময় পেল না তারা। ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল বুলেট। দুচারজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সদর ফটক চুরমার হয়ে গেল। বিদ্রোহী সৈনিকরা ঢুকে পড়ল প্রাসাদে। ফয়জলের কাকা আবদুল ইলাহা ভারী বদমেজাজের লোক। তিনি গুলী চালালেন। সৈন্যরা প্রতিশোধ নিল। ইলাহা প্রাণ হারালেন। সপরিবারে পালাবার চেষ্টা করলেন ফয়জল। সব পথ বন্ধ। রক্তের নেশায় বিদ্রোহীরা পাগল। রাজপরিবারের একজনও রক্ষা পেল না। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল কাসেম

বেতারে ঘোষণা করলেন, ক্ষমতা দখল সম্পূর্ণ। দুর্নীতিপরায়ণ শাসকগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করেছে সৈন্যবাহিনী। ইরাকে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। সাধারণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে সেখানে। রাজপথে বেরিয়েছে ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ী। আকাশে উড়ছে জঙ্গী বিমান। চারদিকে জনতার জয়ধ্বনি। পরের দিন গোটা বাগদাদ উৎসবমুখর হয়ে উঠল। নাসেরের ছবি শোভা পাচ্ছে সর্বত্র। মিশর তাদের প্রেরণা। ইরাকের বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে নাসেরের বিপ্লব। তাঁর সংগঠনী কাঠামোর সার্থক রূপ দিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাসেম। রাজপরিবার নিশ্চিহ্ন। কিন্তু নূরী এস সৈয়দ কোথায়? যত নষ্টের গোড়া এই বৃটিশ স্তাবক আরব নেতা। নাসেরকে খতম করার প্ররোচনা দিয়েছিলেন তিনি ইংরাজকে। সিরিয়ায় প্রতিবিপ্লব ঘটাবার জন্য এঁটেছিলেন ষড়যন্ত্র। বৃটিশের টাকায় ফেঁপে উঠেছিলেন তিনি। তাঁকে খুঁজে বার করা দরকার। পালাতে পারলে হয়ত পরে অনর্থ ঘটাবেন নূরী। চারদিকে সন্ধান চলল। জনতা উপযাচক হয়ে বিপ্লবী সরকারের সাহায্যে এগিয়ে এল। স্ত্রীলোকের বেশে বোরখা পরে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন নূরী। মোটা মোটা পায়ের গোছা প্রতারিত করল তাঁকে। তিনি ধরা পড়লেন। কারাগারে পাঠাবার সুযোগ পেলেন না বিপ্লবী সরকার। জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল নূরীর হাত পা। শবের উপর দিয়ে চলল গাড়ী ঘোড়া সব কিছু। হাড়গোড় চুরমার হয়ে গেল। কতকগুলো মাংসপিণ্ড ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। অগুনতি নরনারী থু থু দিতে লাগল নূরীর রক্তমাখা পথে। একজন সেখানে চাপিয়ে দিল একটি পোষ্টার—বৃটিশের দালালগিরির শাস্তি। নূরীর ভাগ্য বিপর্যয়ে কারও মনে কোন দুঃখ নেই। কত বেদনাময় স্মৃতি নূরীর শাসনের সঙ্গে জড়িত। কত দেশপ্রেমিককে তিনি ফাঁসীকাষ্ঠে

ঝুলিয়েছেন। তাঁর ঘাতকেরা কত তরুণকে গুম করেছে। কত পরিবারকে তারা সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। নূরী তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। বৃটেনের বড় দুর্দিন। মিশর হাতছাড়া। সুয়েজ নাসেরের দখলে। ইরাক ছিল তাদের সান্ত্বনা। নূরী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাকও হয়ত পড়বে নাসেরের খপ্পরে। বাকী আছে জর্ডন এবং লেবানন। ইরাকের ধাক্কা সেখানে লাগবে। জর্ডনের বাদশা হুসেন চাইলেন বৃটিশ সাহায্য। লেবাননের প্রেসিডেন্ট চামুন নিলেন আমেরিকার আশ্রয়। হুসেনের সিংহাসন রক্ষায় এগিয়ে এল বৃটিশবাহিনী। বেইরুটে নামল মার্কিন সৈন্যদল। ওরা দুজন বাঁচলেন।

বাইশ

বাগদাদ চুক্তির বাগদাদ কাটা পড়ল। বিপ্লবী ইরাকী সরকার নিলেন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। আরব দুনিয়ায় পশ্চিমী সামরিক জোটের অবসান ঘটল। ইঙ্গ-মার্কিন নায়কেরা নাছোড়বান্দা। তারা ভেক বদল করলেন। বাগদাদ চুক্তির নূতন নাম হল সেণ্টো। সদর দপ্তর তুরস্কের রাজধানী আঙ্কোরায়। বৃটিশ পত্রিকাগুলো আর্তনাদ করে উঠলেন। ইরাকী বিপ্লবের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাদের বৈদেশিক সংবাদদাতারা পশ্চিম এশিয়া তছনছ করে বেড়ালেন। তারা সর্বজ্ঞ। ভগবান দিয়েছেন তাদের অসামান্য প্রতিভা। কল্পনার চক্ষু মেলে বৃটিশ সাংবাদিকরা দেখলেন—ইরাকী বিপ্লবের আসল নায়ক নাসের। এই নায়কের নায়ক সোভিয়েট রাশিয়া। বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষদর্শীর রোমাঞ্চকর বিবরণে নির্ভেজাল তথ্য দুনিয়াকে জানিয়ে দিলেন লণ্ডনের জ্ঞানতীর্থ ফ্লীটষ্ট্রীটের রক্ষণশীল কাগজগুলো। পশ্চিম জার্মানী সুযোগ সন্ধানী।

সেখানে চলছে কলকারখানার পুনর্গঠন। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরিয়ে আসছে শিল্পসমৃদ্ধ নূতন জার্মানী। বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিন পণ্য মিশরের বাজারে আসে না। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক। বৃটিশ এবং ফরাসীর ফেলে আসা বাজারে ঢুকল পশ্চিম জার্মানী। ইংরাজের টনক নড়ল। ব্যবসা হাতছাড়া করা যায় না। আবার সুরু হল নাসের তোষণ। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা। জাত্যাভিমানী বৃটিশ। বাণিজ্যিক তাগিদে ক্ষুদ্র মিশরের কাছে নতি স্বীকার করতে সরম লাগে। পত্রিকাগুলোর সুর পাল্টাল। নাসেরকে ভুল শোধরাবার সব রকম সুযোগ দিচ্ছেন সদাশয় বৃটিশ সরকার। তাদের দান তুহাতে লুফে নেওয়া উচিত মিশরের। দিনের পর দিন চলল ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ। কিন্তু নাসের মুখ ফুটে কিছু বলছেন না। বিরক্ত হয়ে উঠলেন তুনিয়ার অভিভাবক স্থানীয় বৃটিশ সাংবাদিক মহল। তারা মিশরে আবিষ্কার করলেন, পশ্চিম জার্মানীর পলাতক নাৎসী বিজ্ঞানীদের। হিটলারের আমলে তাদের ইহুদী ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়নি। নাসের ইহুদী-মেধ যজ্ঞের আয়োজন করছেন। এ যজ্ঞের পুরোহিত জার্মান বিজ্ঞানীরা। রাশি রাশি রকেট তৈরী হচ্ছে। এগুলো একদিন ইস্রাইলের দিকে ছুটবে।

মিশরে ছিল একটি মাত্র রাজনৈতিক দল—ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন। এই দল তৈরী করেছিল জাতীয় পরিষদ। মিশর-সিরিয়া ফেডারেশন গঠনের পর পুরনো প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটল। সিরিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ করল। জাতীয় পরিষদও ভেঙ্গে গেল। যৌথ সংবিধান এবং প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠল। সংযুক্ত আরব রিপাব্লিকের জন্য ব্যবস্থা হল তুটি আঞ্চলিক পরিষদ (একটি সিরিয়ার জন্য এবং অপরটি মিশরের জন্য), একজন প্রেসিডেন্ট, চারজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার। ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের একটি শাখা ঘাঁটি গেড়ে বসল

সিরিয়ায়। প্রেসিডেন্ট নাসের তুজন সিরিয়কে দিলেন ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রইলেন জনাকয় সিরিয় মন্ত্রী। মিশরীয় অফিসারা গেলেন সিরিয়ায়। আন্তরিক উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে সুরু হল কাজ। ইতিমধ্যে সংযুক্ত আরব রিপাব্লিকে যোগ দিয়েছে ইয়েমেন। এ ধরনেব মিলনের পক্ষপাতী নাসের ছিলেন না। ইয়েমেনের সঙ্গে মিশরের রাজনৈতিক মতবাদের কোন মিল নেই। এই রাষ্ট্রের বাদশা ইমাম আমেদ চরম প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী শাসনের দাপট সৌদী আরবের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এডেনের উপর বাদশা আমেদের দাবী দীর্ঘ দিনের। তাঁর এলাকা থেকে গেরিলারা হানা দিত এডেন সীমান্তে বৃটিশ ঘাঁটিগুলোর উপর। বৃটিশ সৈন্যদলও ইস্রাইলী পদ্ধতিতে নির্মম প্রতিশোধ নিত। খাস এডেনে চলেছে মুক্তি সংগ্রাম। বিদ্রোহী আরব এলাকাগুলোকে উজাড় করছে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী। বৃটিশ কারাগারে জননেতাদের ভাগ্যে জুটছে অকথ্য নির্যাতন। মিশব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস। সাধারণ মানুষ চায় নাসেরের সহানুভূতি। তাদের আগ্রহের আতিশয্যেই নাসের সংযুক্ত আরব রিপাব্লিকে স্থান দিয়েছিলেন রাজতন্ত্রী ইয়েমেনকে। বাদশা সেখানে গৌণ, মুখ্য আরব জনতা।

আবেগ প্রধান মিলনে ভাটা পড়তে দেরী হয় নি। কিছুদিন যেতে না যেতেই সিরিয়ার উঁচুমহলে দেখা দিল চাঞ্চল্য। সৈন্য-বাহিনীর অফিসাররা অসন্তুষ্ট। তাদের ধারনা, মিশরীয় অফিসাররা তাদের প্রমোশনের পথ অবরোধ করে রেখেছেন। বিলুপ্ত বাথ সোস্যলিস্ট পার্টির নেতারা ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের মধ্যে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। কমিউনিস্টরা কোণঠাসা। ব্যবসায়ী এবং ধনিক সম্প্রদায় নাসেরের সমাজতন্ত্র সন্দেহের চোখে দেখে। বাথ সোস্যালিস্ট পার্টি কথা বলত বেশী, কাজ করত কম। নাসের কথা বলেন কম, কাজ করেন বেশী। পর পর ক'টি অর্থনৈতিক

সংস্কারে ব্যবসায়ী এবং ধনিকগোষ্ঠী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। সিরিয়ার সাধারণ মানুষ নাসেরপন্থী। কিন্তু সৈন্যবাহিনী, রাজনৈতিক নেতারা এবং কায়েমী স্বার্থের জিম্মাদাররা নাসেরবিরোধী। তারা সিরিয়ার স্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়ে আবার আসরে নামল। সুরু হল প্রশাসনিক মন কষাকষি।

ইরাকের বিপ্লবী সরকার দ্বিধা বিভক্ত। জেনারেল কাসেম অস্থিরমতি। স্থানীয় বাথ সোস্যালিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে চলছে প্রাধান্যের লড়াই। কর্ণেল আরেফ মিশর-ইরাক ইউনিয়নের প্রবক্তা। ইরাকীরা নাসেরের সমর্থক। জেনারেল কাসেম পছন্দ করেন না মিশরের জনপ্রিয়তা। নাসেরকে নেতৃত্ব দিতে তিনি রাজী নন। আত্মশ্লাঘায় তিনি ভরপুর। কমিউনিস্ট এবং বাথ সোস্যালিস্টদের তিনি পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলাতে লাগলেন। তাঁর নিজস্ব কোন মতবাদ নেই। ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ তিনি নন। রাজনৈতিক ব্যালান্সের খেলায় কাসেম অনভ্যস্ত। কর্ণেল আরেফকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁকে সরাবার সুযোগ তিনি খুঁজতে লাগলেন। পেতে দেরী হল না। মসৌলে ঘটল নাসেরপন্থী সামরিক অভ্যুত্থান। ব্যর্থ হল কর্ণেল শবাফের বিপ্লব। এই অনর্থের জন্য কর্ণেল আরেফকে দায়ী করলেন জেনারেল কাসেম। আরেফের ভাগ্যে জুটল কারাবাস।

১৯৪৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর। সিরিয় সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা বিদ্রোহ করল। ক্ষমতা হাতে নিল তারা। দামাস্কাসের জনতা বাধা দিতে এগিয়ে এল। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অসমান লড়াইএ বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। নাসের সংযুক্ত আরব রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট। বিদ্রোহ দমন তাঁর নৈতিক কর্তব্য। দামাস্কাসে ছত্রীবাহিনী পাঠাবার হুকুম দিলেন তিনি। কায়রোর বিমান ঘাঁটিতে ছত্রীবাহিনী তৈরী। নাসের উভয় সঙ্কটে পড়লেন। মিশরীয় বাহিনী সিরিয়ায় গেলে স্থানীয়

সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য। আরব মাতবে আরব নিধনে। শেষ মুহূর্তে তিনি হুকুম প্রত্যাহার করলেন। সিরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নিদারুণ মানসিক আঘাত পেলেন নাসের। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৈরী হয়েছিল মিশর-সিরিয়া ফেডারেশন। বড় আশা নিয়ে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খসে পড়ল সিরিয়া। আরব ঐক্যের সূচনাতেই ঘটল অঙ্গচ্ছেদ। বিরক্ত হয়ে নাসের ইয়েমেনকে ফেডারেশন থেকে মুক্তি দিলেন। উল্লসিত হয়ে উঠল জর্ডনের বাদশা হুসেন, ইরাকের কাসেম এবং সৌদী আরবের বাদশা ফয়জল।

মিশরীয় জনগণের কাছে কিছুই গোপন করলেন না নাসের। তিনি স্পষ্টই তাদের বললেন, গোড়াতেই ভুল হয়ে গিয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তির পরিমাপ তিনি করতে পারেন নি। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে পর পর কটি সংস্কার করেছিলেন নাসের। তাঁর আদেশবলে তূলার রপ্তানী বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স এবং ২৭৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রয়াত্ত হয়েছিল। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা দু'শ থেকে একশ একরে এসে দাঁড়াল। সিরিয়ার ধণিকগোষ্ঠী তাতে চটেছিল। তাদের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধল রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ। এ দুয়ের মিলনে ঘটল সামরিক বিদ্রোহ। নাসের বিশ্বাস করতেন, স্বদেশের ধণিকগোষ্ঠী সিরিয়ার বিদ্রোহের পরিপোষক। তিনি নির্মম আঘাত হানলেন। মিশরের এক হাজার ধনী পরিবারকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে এনে ছাড়লেন। তিনি বুঝেছিলেন, এরাও তাঁকে রেহাই দেবে না। সুযোগ পেলে মিশরে তারা প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্র আঁটবে। তাই তাদের মেরুদণ্ড তিনি একেবারে ভেঙ্গে দিলেন।

পুরো ক্ষমতা দখলের পর একটা দিনও নাসেরের স্বস্তিতে কাটেনি। আরব দুনিয়ার অনৈক্য এবং আন্তর্জাতিক ঘাতপ্রতিঘাত

তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সিরিয়ার সঙ্গে মিলনের পর সাড়ে তিন বছর তিনি ঝগড়া করেছেন বাথ সোস্যালিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে। এ দলের সিরিয় নেতারা উগ্রপন্থী। রাষ্ট্রের উপর একচ্ছত্র আধিপাত্য তাদের ছিল না। ইরাকের বাথ সোস্যালিস্ট পার্টি নরমপন্থী। তাদের সামরিক নেতা আরেফ কারাগারে। কাসেমের সঙ্গে মনের মিল খুঁজে পান নি নাসের। আরবের জনতা তাঁকে শ্রদ্ধা করে। জনপ্রিয়তায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। মিশরের বিপ্লবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি নাসেরের স্থান নিতে পারেন। গত ক'বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন, গোটা দেশকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃঢ় কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করাতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেরণা শুকিয়ে যাবে। অসুবিধা অনেক। বিপ্লবকে বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে টেনে নেবার মত কোন তাত্ত্বিক নেতা নাসেরের পার্শ্বরক্ষীদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। দীর্ঘদিন মিশরে চলেছে স্বৈরতন্ত্র। জনসাধারণ হুকুম তামিলে অভ্যস্ত। তাদের রক্ত ঠাণ্ডা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত উত্তাপ সেখানে নেই। কলকারখানা, স্কুল কলেজ এবং হাসপাতাল নির্মাণ সহজ। কিন্তু মানুষ তৈরী বড় কঠিন।

নাসেরের উপর পড়েছে সব দায়িত্ব। তিনি তাত্ত্বিক, সংগঠক এবং রাষ্ট্রনেতা। একজনের হাতে ক্ষমতা মজুত রাখার বিপদ তিনি জানেন। এই প্রশ্ন নিয়েই সুরু হয়েছিল তাঁর সঙ্গে নাগিবের বিবাদ। ক্ষমতা বিকেন্দ্র না করলেই নয়। কোন রাজনৈতিকদল মিশরে নেই। জনসাধারণের মতামত যাচাইএর সব পথ বন্ধ। শ্রেণী সংগ্রামের বদলে নাসের চান শ্রেণী সমন্বয়। এই সমন্বয় আনতে পারে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল। সেই দলে থাকবে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি। তারাই নেবে সম্মিলিত কর্মপন্থা। নাগিবের আমলে তৈরী হয়েছিল লিবারেশন র‍্যালি (মুক্তিসম্মেলন)। তার অপমৃত্যু ঘটেছিল নাগিবের হাতেই। তারপর এল ন্যাশন্যাল

ইউনিয়ন। তার জটিল পদ্ধতি নিতে পারল না জনতা। সিরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই ওটা বকেয়া হয়ে গেল। নাসের তৈরী করলেন জাতীয় চার্টার। এই ঐতিহাসিক দলিল জাতীয় লক্ষ্যের নির্দ্দেশনামা। তাঁর বিশ্বাস, মিশরের জাতীয় চার্টার শুধুমাত্র মিশরেরই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আরবের জনতা তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রে চালু করবে তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে একদিন আরবীয় ঐক্য। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ঐক্য ভঙ্গুর। সিরীয়-মিশরীয় বিচ্ছেদ তার প্রমাণ।

চার্টার অনুমোদনের জন্য নাসের ডাকলেন গণকংগ্রেস। প্রতিনিধিবা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই চান তাঁকে আজীবন প্রেসিডেণ্ট করতে। বাধা দিলেন নাসের। যথারীতি অনুমোদন পেল জাতীয় চার্টার। সুরু হল মিশরে এক অভিনব পরীক্ষা। একটি মাত্র রাজনৈতিকদল—আরব সোস্যালিস্ট ইউনিয়ন গড়ে উঠল। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তারা তৈরী করবে জাতীয় পরিষদ। এই পরিষদই মিশরের সর্বোচ্চ আইনসভা। ছ'বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন প্রেসিডেণ্ট। নির্বাচনে ভোট দান পুরুষদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। মহিলাদের ঐচ্ছিক। যারা ভোট দেবেনা তাদের জরিমানা মিশরীয় এক পাউণ্ড। আরব সোস্যালিস্ট ইউনিয়নের সর্বস্তরের কার্যকরী কমিটিতে অর্দ্ধেক সদস্য হবেন কৃষক এবং শ্রমিক প্রতিনিধি। যারা ট্রেডইউনিয়নের সদস্য তারাই পড়বে শ্রমিকের সংজ্ঞায়। পঁচিশ একর পর্যন্ত জমি যাদের আছে তারাই কৃষক। ফলে স্বল্পবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরা পেল প্রশাসনে অংশ নেবার অধিকার। বাদ পড়ল প্রাক্তন জমিদাররা। এদের ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ ছিল একশ' একর। সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক রূপান্তরিত হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্রে।

নাসের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে ব্যস্ত। আরব দুনিয়ায় চলছে নিদারুণ কর্মচাঞ্চল্য। মিশর-বিরোধী শক্তিগুলো সক্রিয় হয়ে

উঠেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা সিরিয়া এবং ইরাকের চক্ষুশূল। নেতারা হীনমন্যতার রোগে ভুগছেন। তাদের নিজের দেশেই নাসের জনতার নেতা। তাদের মানস জগতের প্রেসিডেন্ট। সৌদী আরব এবং জর্ডন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারে আতঙ্কিত। নাসেরের সমালোচনায় তাদের বেতারকেন্দ্রগুলো সোচ্চার। রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিলেন ইয়েমেনের বাদশা। আরব লীগের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। সিরিয়া বেপরোয়া। তার মনোভাবে অতিষ্ঠ হয়ে নাসের আরব লীগ ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সবাই জানে, মিশর ছাড়া আরব লীগ টিকে থাকতে পাবে না। যেখানে নাসের নেই, সেখানে জনতাও নেই। জর্ডনের পেলেস্টাইনী আরবরা বাদশা হুসেনের স্বৈরাচার সহ্য করতে রাজী নয়। নাসেরের অপমান, তাদের অপমান। বেদুইন বাহিনী না থাকলে জর্ডনের সিংহাসন অনেক আগেই গুড়িয়ে যেত। ইয়েমেনের বাদশার স্বেচ্ছাচারিতা প্রজাদের পাগল করে তুলেছিল। ইংরাজ তাদের প্রধান শত্রু। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার হিম্মত আছে একমাত্র নাসেরের। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে জনসাধারণ ত্যক্ত বিরক্ত। বৃদ্ধ বাদশার মৃত্যু না ঘটলে হয়ত তাঁকে প্রজা-বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হত। নূতন বাদশা ইমাম বদর কিছুটা নরমপন্থী। কিন্তু পিতার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হল তাঁকে। ১৯৪৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লা এল সাল্লাল তাঁর সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করলেন প্রাসাদ। রাতারাতি রাজতন্ত্রী ইয়েমেন পরিণত হল সাধারণতন্ত্রী ইয়েমেনে। ব্রিগেডিয়ার সাল্লাল হাতে নিলেন সর্বময় ক্ষমতা।

ইমাম বদরের কোন পাত্তা নেই। সবাই ভেবেছিলেন, তিনি নিহত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শব কেউ দেখেনি। বিপ্লবী সরকার কিছু বলছেন না। দুদিন পরেই দানা বেধে উঠল জল্পনা-কল্পনা। সৌদী আরবের বেতারকেন্দ্র বারবার ঘোষণা করতে লাগল—বদর

জীবিত। তিনি উপজাতিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর পতাকাতলে রাজতন্ত্রীরা জমায়েত হচ্ছে। সাধারণতন্ত্রীদের পতন অনিবার্য। জর্ডনের বাদশা হুসেন এবং সৌদী আরবের বাদশা ফয়জল পলাতক বাদশা বদরের সহায়। বৃটেন তাদের গোপন সাহায্য দিতে রাজী। গৃহযুদ্ধের পটভূমি তৈরী হল ইয়েমেনে। সাল্লাল সাহায্য চাইলেন নাসেরের কাছে। রাজতন্ত্রের সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের লড়াই। মিশরের পথ পরিষ্কার। সাধারণতন্ত্রীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন নাসের। এ অঞ্চলে রয়েছে বৃটিশ তৈলস্বার্থ। পারস্য উপসাগরের শেখদের নিয়ে গড়তে চায় সে এক ফেডারেশন। আরব জাতীয়তাবাদ তার পরিপন্থী। এডেন নিয়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসককুল বিব্রত। রাষ্ট্রসংঘে বৃটেন অপদস্থ হচ্ছে বারবার। ইয়েমেন সীমান্ত থেকে চলছে হামলা। সাধারণতন্ত্রীরা টিকে থাকলে ফ্যাসাদ বাড়বে। ওদের চেয়ে রাজতন্ত্রীরা অনেক ভাল। ইয়েমেনীরা গৃহযুদ্ধে শক্তিক্ষয় করলে ইংরাজের লাভ। এডেনের উপর চাপ কমবে। সৌদী আরবের মাধ্যমে পাঠাতে লাগল সে রাজতন্ত্রীদের জন্য সমরসম্ভার। মিশরীয় বাহিনীও হাজির হল ইয়েমেনে। পাকিস্তানের আয়ুব খানও নাক গলালেন। বৃটেনের গোপন নির্দেশে তিনিও সৌদী আরবের মাধ্যমে সরবরাহ সুরু করলেন অস্ত্রশস্ত্র। মিশরের অভিযোগ, ভাগ্যান্বেষী শ্বেতাঙ্গরাও এসে জুটেছিল রাজতন্ত্রী শিবিরে। বৃটেন ছিল তাদের রিক্রুটিং সেণ্টার। আমেরিকা প্রথমে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল রিপাব্লিকান সরকারকে। পরে সে ঝুঁকে পড়েছিল রাজতন্ত্রীদের দিকে। দীর্ঘ দিন চলল সংগ্রাম। নাসের জড়িয়ে পড়লেন ইয়েমেনী অন্তর্দ্বন্দ্বে। তিনি প্রমাণ করলেন, আদর্শ ভিত্তিক লড়াইএ যেকোন ঝুঁকি নিতে তিনি তৈরী।

আরব জনতার কাছে নাসের মুকুটহীন সম্রাট। ইরাক এবং সিরিয়া কোণঠাসা। ইয়েমেনী সাধারণতন্ত্রের সক্রিয় সমর্থনে তারা

এগিয়ে আসেনি, এসেছে মিশর। সৌদী আরব মনমরা। তার সাতজন পাইলট বিমানসহ নিয়েছেন নাসেরের আশ্রয়। রাজতন্ত্রীদের পক্ষে তারা যুদ্ধ করতে রাজী নয়। জর্ডন বিমান বহরের কম্যাণ্ডার এবং দুজন পাইলট হাজির হলেন মিশরে। জর্ডন এবং সৌদী আরবের সৈন্যবাহিনীতে দেখা দিল অসন্তোষ। তাদের বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বাদশারা। ১৯৬৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ইরাকে ঘটল আবার সামরিক এবং রাজনৈতিক অভ্যুত্থান। বিদ্রোহীরা ঘেরাও করল কাসেমের বাসভবন। বন্দী করল তাঁকে। সঙ্গীদল সহ নিহত হলেন কাসেম। প্রেসিডেণ্টের পদ নিলেন আরেফ। বাগদাদ বেতারে বাজতে লাগল মিশরীয় সমর সঙ্গীত। আবার গড়ে উঠল মিশরীয়-ইরাক সৌহার্দ্য। এদুটি জাতীয়তাবাদী সরকারের চাপে বেশীদিন টিকতে পারল না সিরিয়ার নাসের-বিদ্বেষী সরকার। এক মাসের মধ্যে তার পতন ঘটল। সিরিয়া, ইরাক, মিশর এবং ইয়েমেন পাশাপাশি এসে দাঁড়াল।

জনসাধারণের মনে লেগেছে আরব ঐক্যের নেশা। নাসের এই ঐক্যের প্রতীক। ইরাকের ইউনিয়নিস্ট সরকার এবং সিরিয়ার বিপ্লবী সরকার দেখলেন ঐক্যের পথে না এগুলে তাদের শাসন বেশীদিন টিকবে না। জনতা নাসেরের ভক্ত। তাঁরা আবার এলেন কায়রোতে। প্রস্তাব—মিশর, ইরাক এবং সিরিয়ার ফেডারেশন। নাসের বাথ পার্টির নেতাদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। ইরাকের আরেফকে তিনি পছন্দ করতেন। কিন্তু সিরিয়ার নেতাদের বরদাস্ত করতে পারতেন না। তবু চাপ প্রবল। ১৯৬৪ সালের ১৭ই এপ্রিল ঘোষিত হল মিশর, ইরাক এবং সিরিয়ার ফেডারেশন। বিশ মাস চলবে অন্তবর্তীকালীন অবস্থা। একজন প্রেসিডেণ্ট, প্রেসিডেন্সী কাউন্সিল এবং মন্ত্রীসভা শাসন করবেন ফেডারেশন। তারপর জনসংখ্যার ভিত্তিতে তিনটি রাষ্ট্রের

প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে উঠবে আইনসভার নিম্নকক্ষ। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সমান্ সংখ্যক সদস্য নিয়ে তৈরী হবে সিনেট। মার্কিন প্যাটার্ণে সংবিধান রচনার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা। পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের আগেই দেখা দিল মনকষাকষি। প্রেসিডেন্ট হবেন কে? নাসের ছাড়া এ পদ কেউ নিতে পারেন না। আরব জনতা তা মানবে না। প্রেসিডেন্টের হাতে বেশী ক্ষমতা দিতে বাথ পার্টি রাজী নয়। নাসের জানেন, ইরাকী এবং সিরিয় সরকারের স্থিতি নেই। যে কোন সময় ওলট পালট সম্ভব। অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কিছুতেই তিনি মিশরকে ছেড়ে দেবেন না। আলজেরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্ণেল বুমাদিয়েন এক প্রতিনিধিদল নিয়ে এলেন সিরিয়া সফরে। জনতা নেমে এল রাস্তায়। তাদের আওয়াজ, মিশর-সিরিয়া এক হও। নাসের জিন্দাবাদ। সিরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার আমিন হাফেজ (বাথ পার্টি) জনতার উপর লেলিয়ে দিলেন পুলিশ। রক্তস্রোত বইল। সারা সিরিয়ায় জারী হল ১৮ ঘণ্টার কারফিউ। মিশর-সিরিয়া-ইরাকের প্রস্তাবিত ফেডারেশন চুক্তির একমাস আগে ঘটেছিল এই ঘটনা। কিন্তু তার জের চলছিল দীর্ঘদিন। নাসের সমর্থকদের উচ্ছেদের জন্য ওঠেপড়ে লাগলেন সিরিয় সরকার। নিরপেক্ষ মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। বাথ পার্টি হল সর্বময় কর্তা। সৈন্যবাহিনীর তরুণ অফিসাররা সহজে হার মানল না। নাসের তাদের বিপ্লবী প্রেরণা। তারা বিদ্রোহ করে বসল। ব্যর্থ হল সামরিক অভ্যুত্থান। ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলিতে প্রাণ দিল ১৩ জন সামরিক অফিসার। ফাঁসী কাঠে ঝুলল ১৪ জন অসামরিক নেতা। এ অভ্যুত্থানে নাসেরের প্রত্যক্ষ হাত ছিল না। সিরিয় সরকার দায়ী করলেন তাঁকে। ইরাকী সরকারও যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। পাল্টা আঘাত হানলেন নাসের। শাণিত হয়ে উঠল কায়রো বেতারের প্রচার। আরবীয় সমাজতন্ত্রের উঁচু মহলে প্রচণ্ড দলাদলি। ভরসা পেলেন

বাদশার দল। তারা নাসের তোষণে বেরিয়ে পড়লেন। জর্ডনের হুসেন এলেন মিশরে। অগ্রজ বলে সম্বোধন করলেন নাসেরকে। ইয়েমেনী সমস্যার সমাধানের জন্য প্রস্তাব পাঠাল সৌদী আরব। আরম্ভের আগেই সমাপ্তি ঘটল সিরিয়া, মিশর এবং ইরাকের ফেডারেশন।

তেইশ

মিশর আফ্রিকা মহাদেশে। প্রতিবেশী এশীয় আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এদের সুখ দুঃখ এবং আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র বিন্দু নাসের। তাদের সংঘবদ্ধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি। বারাবার প্রতিহত হয়েছেন। কিন্তু আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে আর তিনটি আরবরাষ্ট্র—মরোক্কো, আলজেরিয়া এবং টিউনিসিয়া। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে ছিল না মিশরের আত্মিক যোগাযোগ। মাঝখানে লিবিয়া। তার দুটি জন সমৃদ্ধ অঞ্চল ত্রিপোলী এবং সাইরেনেইকা। এদের মধ্যে তিনশ মাইলের ব্যবধান। বিশাল মরুভূমি পৃথক করে রেখেছে তাদের। এদেশের মাধ্যমে পশ্চিমের আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মিশরের ভাবের আদান প্রদান সম্ভব নয়। আর মিশরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে না উঠলে এশীয় আরবরাও আফ্রিকার আরবদের কাছে আসতে পারবে না। এ অঞ্চলে চলেছে ফরাসী শাসন। পশ্চিমী আরবদের কৃষ্টি এবং জীবন যাত্রা ফরাসী প্রভাবিত। এশীয় আরব অঞ্চলে প্রধানতঃ বৃটিশ প্রাধান্য। ফরাসী প্রভাব গৌন। এদু' অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আরবরা ইউরোপীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। একে অন্যকে সাহায্যের সামর্থ ছিল না বললেই চলে। যুগসন্ধিক্ষণে মিশরে

ঘটল নাসেরের বিপ্লব। ইংরাজকে মিশর ছাড়া করলেন তিনি। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক বিপ্লব থেকে নাসেরের বিপ্লবের প্রকৃতি আলাদা। মার্কিন কায়েমী স্বার্থের ইঙ্গিতে সেখানে হতো ওলট পালট। জনসাধারণের বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিল না সরকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে। মিশরের বিপ্লবী তরুণ অফিসাররা জাতীয়তাবাদী। ক্ষমতা দখল তাদের শেষ কথা নয়। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ পেয়েছিল মিশরের সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে। বিপ্লবী সমর নায়কেরা এখানে জনপ্রতিনিধি। প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়েছিল তারা। নাসেরের ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমের আরবেরা দেখতে পেল আশার আলোক। ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র হয়ে উঠল তাদের সংগ্রাম। মরোক্কোর জাতীয়তাবাদী নেতা সাল্লাল এল ফাসি, টিউনিসিয়ার হাবিব বারগুইবা, আলজেরিয়ার ফেরহাত আব্বাস এবং বেনবেলা আশ্রয় নিলেন কায়রোতে। নাসেরের সমর্থন এবং সাহায্য পেতে তাঁদের দেরী হল না। ১৯৫৪ সালে আওরেস পার্বত্য অঞ্চলে আলজেরিয়ার বিপ্লবের ঘটল প্রথম আত্মপ্রকাশ। সুরু থেকেই নাসের পাঠাতে লাগলেন সমরসম্ভার।

টিউনিসিয়া এবং মরোক্কোর স্বাধীনতা সংগ্রামেও মিশর হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। কায়রো বেতারের প্রচার এবং নাসেরের সক্রিয় সাহায্য ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তিকে। ১৯৫৬ সালে টিউনিসিয়া এবং মরোক্কো পেল স্বাধীনতা। দিগন্তে দেখা গেল বিশাল আরবের জাতীয়তাবাদী ঐক্যের সম্ভাবনা। প্রমাদ গণল ইউরোপীয় তৈল স্বার্থের জিম্মাদাররা। সুরু হল বৃটেনের গাত্রদাহ। ১৯৫৮ সালে মরোক্কো এবং টিউনিসিয়া যোগ দিল আরব লীগে। এ সংস্থায় মিশরের প্রভাব স্বীকৃত। ইংরাজের গায়ের জ্বালা বাড়ল। তাদের সংবাদপত্রগুলো ওথেলো নাটকের ইয়াগোর ভূমিকায় নামলেন। নাসের এবং বারগুইবার

মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি দরকার। তারা প্রচার করতে লাগলেন—আরবের ভবিষ্যৎ বারগুইবার হাতে। তিনি দূরদর্শী। নাসেরের মত হঠকারী নন। বৃটিশ পত্রিকাগুলোর বৈদেশিক সংবাদদাতারা ভিড় করলেন তাঁর পাশে। সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে তারা জানিয়ে দিলেন—ব্যক্তি হিসাবে বারগুইবার তুলনা নেই। ব্যক্তিত্বে এবং চিন্তার স্বচ্ছতায় তিনি নাসেরের অনেক উপরে। বৃটিশ কূটবুদ্ধির খপ্পরে পড়লেন বারগুইবা। ভুলে গেলেন তিনি—ক্ষুদ্র টিউনিসিয়া কখনই মিশরের স্থান নিতে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভাবতে লাগলেন নাসেরকে। আরব লীগকে মিশরের প্রভাব মুক্ত করার জন্য তাঁর চেষ্টা চলল। নাসের বিরোধী অভিযান সুরু করল টিউনিসিয়া। কায়রো বেতার বারগুইবার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। দিশাহারা টিউনিসিয়া আরব লীগ ছাড়ল। এখানেও জনতা নাসেরের পক্ষে। বিজার্তা সামরিক ঘাঁটি তখনও ফ্রান্সের দখলে। সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত। তারা ফরাসী সামরিক ঘাঁটির অপসারণ চায়। প্রচণ্ড চাপ পড়ল বারগুইবার উপর। তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় বসতে চাইলেন। ফরাসী সরকার ঘাঁটি ছাড়তে নারাজ। ত্যক্ত বিরক্ত বারগুইবা আক্রমণ করলেন বিজার্তা ঘাঁটি। নির্মম প্রতিশোধ নিল ফরাসীরা। টিউনিসিয়ার পথে রক্ত গঙ্গা বইল। বিজার্তা ঘাঁটি আরবের খুনে ভিজে গেল। এগিয়ে এলেন নাসের। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রামে মেতেছে টিউনিসিয়া। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটান নাসেরের বৈপ্লবিক সাধনা। তিনি ঘোষণা করলেন—টিউনিসিয়ার মুক্তি সংগ্রাম মিশরের সংগ্রাম। তাঁর আহ্বানে আরব দুনিয়া জেগে উঠল। আফ্রো-এশিয়ায় আলোড়ন দেখা দিল। ফরাসী বিজার্তা ছাড়ল। নিজের ভুল বুঝতে পারলেন বারগুইবা। বিজার্তার বিজয় উৎসবে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন নাসেরকে। ১৯৪৪ সালের

ডিসেম্বর মাসে নাসের এলেন টিউনিসিয়ায়। জনতা তাঁকে অভিনন্দন জানাল। চারদিকে আওয়াজ উঠল—নাসের জিন্দাবাদ। কিছুদিন চলল মিশর-টিউনিসিয়ার দহরম-মহরম। প্রেসিডেণ্ট বারগুইবা মিশর সফর করলেন। নাসের দিয়েছেন তাঁকে জাতীয়তাবাদী আরব নেতার স্বীকৃতি। কায়রোতে তিনি প্যালেস্টাইন মুক্তির সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। যৌথ আরব কম্যাণ্ডে দু' ব্যাটেলিয়ান টিউনিসীয় সৈন্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারগুইবা দেশে ফিরলেন। বছর দেড়েক পরেই তাঁর মতিগতির পরিবর্ত্তন দেখা দিল। তিনি ইউরোপীয়দের দিকে ঝুঁকলেন। নিরাশ হলেন নাসের। এক অশুভ মুহূর্ত্তে বারগুইবা ঘোষণা করলেন, প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের জন্য দরকার ইস্রাইলের সঙ্গে আপোষ আলোচনা। নাসের ভাবলেন, প্রেসিডেণ্ট বারগুইবা আরব দুনিয়া থেকে সরে যাচ্ছেন। তিনি পশ্চিমী স্বার্থে আরব সংহতিতে ফাটল ধরাচ্ছেন। আর একবার ঘা খেলেন তিনি। মিশর-টিউনিসিয়ার বন্ধুত্বের উপর জমা হল ঠাণ্ডা বরফ। নাসেরের মানসিক দৃঢ়তা অসাধারণ। কোন অবস্থাতেই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলাতে তিনি রাজী ছিলেন না। যেখানেই চলত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই সেখানেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। মিশরের মুক্তির সুযোগ তিনি দিতে চাইতেন সবাইকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, সমাজতন্ত্র এবং আরব ঐক্য—এই চার স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ। একেই সংক্ষেপে বলা হত নাসেরবাদ। টিউনিসিয়ার বারগুইবা তাঁকে ছেড়েছেন। ক্ষুব্ধ হয়েছেন নাসের। কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি কোনদিন। সঙ্গে আছে মরোক্কো। বাদশা মহম্মদ (পঞ্চম) রক্ষণশীল এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসক। তিনি ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। পেয়েছিলেন নাসেরের অকুণ্ঠ সমর্থন।

টিউনিসিয়ার মতই মরোক্কোর জনসাধারণ ফরাসী শাসনের বিরোধী। মিশর তাদের প্রেরণার উৎস। নাসেরের উপর জনতার অগাধ আস্থা। বাদশা মহম্মদ (পঞ্চম) নিয়েছিলেন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব। মিশরের বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন, ঔপনিবেশিক শক্তির উচ্ছেদ প্রথম। তারপর অর্থনৈতিক সংস্কার। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মধ্যে গড়ে উঠল নাসের-মহম্মদ বন্ধুত্ব। প্রতিষ্ঠিত হল পূবের আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মরোক্কোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বাধীনতা পেল মরোক্কো (১৯৫৬)। দু'বছর পরে যোগ দিল আরবলীগে। পশ্চিমের ইউরোপীয় কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধলেন টিউনিসিয়ার সমাজতন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট বারগুইবা। জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি নিলেন বাদশা মহম্মদ (পঞ্চম)। সমাজতন্ত্রী নাসের কাছে টেনে নিলেন তাঁকে। ১৯৬০ সালে প্রগতিবাদী আফ্রিকান রাষ্ট্র—মিশর, ঘানা, গিনি, মালি এবং মরোক্কো গঠন করল কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী।

মিশর-মরোক্কোর সৌহার্দ্যে ফাটল ধরতে দেরী হল না। আভ্যন্তরীণ সংস্কারে বাদশা মহম্মদের (পঞ্চম) অনিচ্ছা সুনজরে দেখতেন না নাসের। তিনি জানতেন, জনসাধারণের মোহ ভাঙ্গবে। তারা অধীর হয়ে উঠবে। নাসের-মহম্মদ বন্ধুত্বের উপরই তারা একদিন আক্রমণ চালাবে। আরব জনতা মিশরকে আর বিশ্বাস করবে না। অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য বাদশার উপর চাপ দিতে লাগলেন নাসের। বাদশা পছন্দ করতেন না বাইরের এই হস্তক্ষেপ। তিনি ভাবলেন, মরোক্কোর রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র আঁটছে সাধারণতন্ত্রী মিশর। অবস্থা ঘোরাল হয়ে উঠল আলজেরিয়ার স্বাধীনতা লাভের পর।

আলজেরিয়ার বিপ্লব নাসেরের মানস সন্তান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সেখানে সুরু হয়েছিল ভাবপ্রবণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। তার নেতা ছিলেন মেসালি হাজী। গালে বড় বড় দাড়ী, পরনে

আলখেল্লা। দরবেশী চেহারা। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন এই দরবেশী নেতা। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি রাজনৈতিক পয়গম্বর। কোরাণের সঙ্গে তাঁর দাড়ির চুল বিক্রি হত বাজারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঘটল বিরাট পরিবর্ত্তন। ফ্রান্সের মর্যাদা লুটিয়ে পড়েছে ধূলোয়। জার্মানীর এক আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছিল সে। ইন্দোচীনে মুক্তি সংগ্রামীদের হাতে খাচ্ছিল প্রচণ্ড মার। হাজীর তরুণ সমর্থকরা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বক্তৃতা এবং অহিংস আন্দোলনে এসেছিল তাদের অশ্রদ্ধা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা ভাবছিল তারা। দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল হাজীর শিষ্যরা। একদলের নেতা ছিলেন ফেরহাত আব্বাস। হেনরি আলেকের সঙ্গে তিনি পরিচালনা করতেন জাতীয়তাবাদী পত্রিকা—এল আলজের রিপাব্লিকান। পরে নিজস্ব পত্রিকা—লা নেশন আলজেরিনে গড়ে তুলেছিলেন। অহিংস গণ-আন্দোলন এবং শাসকশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা ধাপে ধাপে অগ্রগতি ছিল তাঁর কাম্য। হেনরি আলেক জাতিতে ফরাসী। রাজনৈতিক বিশ্বাসে কমিউনিস্ট। তিনি যোগ দিয়েছিলেন আলজেরিয়ার বিপ্লবী দলে। ফরাসী কারাগারে ভোগ করেছিলেন অকথ্য অত্যাচার। জেল থেকে পাচার করা তাঁর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল ফ্রান্সে। আন্তর্জাতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল আলেকের বই। ফরাসী সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন এই বই। লণ্ডন থেকে তার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। নাম—কোশ্চেন।

বিপ্লবীদলের নেতা ছিলেন বেন বেলা এবং মহম্মদ খাইদার। তাদের সংস্থা সি আর ইউ-এ (কমিটে রেভোলিউসিনারে ডি ইউনিয়ন এ্যাণ্ড ডি এ্যাকসন) আগুন ছড়াত তরুণদের মধ্যে। ১৯৫২ সালে ঘটল মিশরের বিপ্লব। উৎসাহিত হয়ে উঠল আলজেরীয় বিপ্লবীরা। উপযুক্ত প্রস্তুতির আগেই ১৯৫৪ সালে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা ফরাসীদের উপর। ব্যর্থ হল অভ্যুত্থান।

চলল পাইকারী হারে গ্রেপ্তার। বেন বেলা পালালেন মিশরে। নাসের দিলেন তাঁকে আশ্রয়। ধরা পড়লেন নিরপরাধ বেন খেদ্দা। মুক্তির পর যোগ দিলেন তিনি বিপ্লবী দলে। মিশরে ঘটল বেন বেলার পরিবর্ত্তন। নাসেরের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝলেন—প্রস্তুতি, ঐক্য এবং সতর্ক পদক্ষেপ ছাড়া কোন বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না। অস্ত্রের ভাবনা নেই। মিশর জোগাবে সমরসম্ভার।

দেশে ফিরলেন বেন বেলা। বসল বিপ্লবী দলগুলোর যৌথ গোপন বৈঠক। সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ন এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম তাদের চরম লক্ষ্য। নারীপুরুষ নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে। সর্বত্র গড়ে উঠল মুক্তি ফৌজ। ফরাসী সরকার চালালেন নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। আয়ত্তের বাইরে চলে গেল আলজেরিয়া। সারা ছুনিয়ার জনমত জড় হল মুক্তি যোদ্ধাদের পিছনে। ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা হাতে নিলেন ছ্যগল। স্বাক্ষরিত হল এভিয়াঁ চুক্তি। ১৯৪৪ সালের ৩রা জুলাই স্বাধীন হল আলজেরিয়া। বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে কিছুদিন চলল ক্ষমতার লড়াই। সাধারণ নির্বাচনে বেন বেলা পেলেন জনতার রায়। তিনি স্বাধীন আলজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

আলজেরিয়ার সঙ্গে নাসেরের আত্মিকযোগ খুবই স্বাভাবিক। বেন বেলা জঙ্গীবাদী এবং উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রী। তিনি নাসেরের মন্ত্রশিষ্য। আফ্রিকায় মুক্তি আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ল ছুটি রাষ্ট্রে। একটি মিশর এবং অপরটি আলজেরিয়া। মিশর সমরসম্ভারের জোগানদার এবং আলজেরিয়া আফ্রিকার মুক্তি যোদ্ধাদের সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র। ১৯৪৪ সালে মারা গেলেন মরোক্কোর বাদশা মহম্মদ (পঞ্চম)। গদীতে বসলেন তাঁর ছেলে হাসান। পিতার রাজনৈতিক মর্যাদা তিনি পান নি। জর্ডনের বাদশা হুসেনের মত সব সময় ছিল তার গদীর নিরাপত্তার চিন্তা।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র আলেজেরিয়া সমাজবাদী। রাজতন্ত্র উচ্ছেদে সে বদ্ধপরিকর। বেন বেলার সহায় নাসের। মরোক্কোতে বামপন্থী আন্দোলন প্রবল। তাদের প্রেরণা আলজেরিয়া। বাদশা হাসান সন্দেহ করতেন নাসেরকে। মরোক্কোর সঙ্গে ছিল আলজেরিয়ার সীমান্ত বিরোধ। ১৯৪৪ সালে বাধল লড়াই। মধ্যস্থতা করতে চাইলেন নাসের। মরোক্কো কোন কথা শুনতে রাজী নয়। আরব লীগ ছাড়ল সে। মিশরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক চ্ছেদ করলেন বাদশা হাসান। সাড়ে তিনশ মিশরীয় শিক্ষককে তিনি বিদায় দিলেন। নাসের পাঠালেন হু'হাজার মিশরীয় সৈন্য আলজেরিয়ায়। ওরা বেন বেলার পাশে জমায়েত হল। দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে রক্তাক্ত লড়াই করেছে আলজেরিয়ার বিপ্লবীরা। গোটা হুনিয়া জানে তার ইতিহাস। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে উঠেছে বারবার ধিক্কার। স্বাধিকারে বেন বেলা এবং তাঁর সহকর্মীরা বিপ্লবী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত। হীনমন্যতা বোধ ছিল না তাঁদের। অকপটভাবে তাঁরা স্বীকার করতেন মিশরের অবদান এবং নাসেরের প্রেরণা। আলজেরিয়ার কৃষিব্যবস্থা এবং সমস্যা মিশর থেকে আলাদা। বেন বেলা গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি নাসেরপন্থী হয়েও স্বতন্ত্র পথের যাত্রী। নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই সেখানে। নাসের বেন বেলার বন্ধুত্ব তাই গাঢ় এবং গভীর।

মিশরের প্রতিবেশী লিবিয়া। তার মরুভূমির তলায় রয়েছে অঢেল তৈল সম্পদ। বৃদ্ধ ইদ্রিস মধ্যযুগীয় বাদশা। তিনি আবার ধর্মগুরু। মোল্লাতন্ত্রীদের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। নাসেরের নামে সাধারণ মানুষ পাগল। সমাজ সংস্কারের ধারা মন্থর। বৃটেন এবং আমেরিকা বিরাট সামরিক ঘাঁটি গড়েছে এখানে। এ ঘাঁটিগুলো আরব হুনিয়ার আতঙ্ক। পশ্চিমী শক্তির আরবীয় ঘাঁটি নাসেরের অসহ্য। বাদশা ইদ্রিস ভয় করেন নাসেরকে। পশ্চিমী

সামরিক ঘাঁটিগুলো অটুট রাখতে চান তিনি। নাসের বুঝেছিলেন, যতদিন পশ্চিম এশিয়ায় ইউরোপীয় সামরিক ঘাঁটি থাকবে ততদিন জাতীয়তাবাদ নিরাপদ নয়। তৈল স্বার্থ রক্ষায় ষড়যন্ত্র আঁটবে পশ্চিমী কায়েমী স্বার্থের চক্রীরা। তাদের সঙ্গে যোগ দেবে স্থানীয় ধনী সম্প্রদায়। প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাবে জাতীয়তাবাদী সরকারগুলো। লিবিয়া থেকে পশ্চিমী সামরিক ঘাঁটি হঠাও– আওয়াজ তুললেন নাসের। দিশাহারা হয়ে পড়লেন বাদশা ইদ্রিস এবং তাঁর সরকার। জনমত উত্তাল। সামরিক ঘাঁটি চুক্তি সংশোধনের দাবী জানালেন বাদশা ইদ্রিস। বৃটেন এবং আমেরিকা প্রমাদ গণল। বাদশার উপর তাদের গভীর আস্থা। তাঁর জীবিতকালে হয়ত কোন ওলট পালট হবে না। পুরনো চুক্তির উপর কিছুটা চুনকাম করে দিলেই হয়ত ল্যাঠা চুকে যাবে। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ। তাঁর অবর্তমানে তৈল সম্পদের কি গতি হবে? ভাবতে লাগল বৃটেন এবং আমেরিকা।

নাসেরের বিপ্লব যুগান্তকারী ঘটনা। তার সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার কথা কেউ ভাবতে পারেনি। নাসের নিজেও নয়। হঠাৎ দেখা গেল, আগুন জ্বলেছে আরব দুনিয়ায়। আফ্রো-এশিয়ার বিপ্লবী চেতনায় জোয়ার এসেছে। বদ্ধ জলার বাধ ভেঙ্গেছে। পশ্চিম এশিয়া উদ্দাম। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্যতিব্যস্ত। কায়েমী স্বার্থের বনিয়াদে লাগছে বারবার প্রচণ্ড আঘাত। চলেছে ভাঙাগড়া। আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম পেয়েছে দুরন্ত প্রেরণা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাসের। হাত তাঁর প্রসারিত। মুক্তিযোদ্ধাদের সাদর আহ্বানের ইঙ্গিত। মিশরের মুক্তি আফ্রো-এশিয়ার মুক্তি। এশিয়া মুক্ত। আফ্রিকা অবহেলিত। তার মুক্তি সংগ্রামে মদত দেবার নৈতিক দায়িত্ব মিশরের। কারণ মিশর এশিয়ায় নয়, আফ্রিকায়। সমাজতন্ত্র জাতিভেদ মানে না। নিগ্রো-আরব অভিন্ন। তাদের শত্রু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ।

মিশরের স্বপ্ন আরব ঐক্য। আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নিগ্রো নেতাদের লক্ষ্য আফ্রিকার সংহতি। উভয়ের প্রগতির অন্তরায় সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিক শাসন। নাসেরের জন্য নির্দিষ্ট দ্বৈত ভূমিকা। একাধারে তিনি আরবীয় ঐক্যের প্রতীক, অপর দিকে আফ্রিকার সংহতির মদৎদাতা। এ দু'য়ের সমন্বয় তাঁর রাজনৈতিক সাধনা। আফ্রিকার সমস্যা আলাদা। বৃটিশ এবং ফরাসী প্রাধান্য সর্বত্র স্পষ্ট। দু একটি দেশ ছাড়া কেউ স্বাধীন নয়। যারা স্বাধীন তারাও আবার পশ্চিমের লেজুড়। বৈদেশিক শাসনে শিক্ষিতের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়েনি। ভাষার বৈচিত্র্য ঐক্যের প্রতিবন্ধক। ইংরাজী এবং ফরাসী না জানা নেতাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান দুঃসাধ্য। বৃটিশ এবং ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃতির ঢং পৃথক। শম্বুক গতিতে স্থানীয় প্রশাসনের পরিবর্তন ইংরাজের নীতি। ফ্রান্সের আইনসভা এবং প্রশাসনের সঙ্গে উপনিবেশগুলোকে বেধে রাখা ফরাসী সরকারের কাম্য। প্রথম যুগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল দুটি আলাদা পথে। বৃটিশ শাসিত উপনিবেশগুলোর জাতীয়তাবাদী নেতারা চেয়ে থাকতেন স্থানীয় আইনসভাগুলোর দিকে। সেখানে গিয়ে তারা করবেন শাসন সংস্কার আন্দোলন। ফরাসী উপনিবেশগুলোর স্থানীয় নেতাদের নজর ছিল প্যারিসের উপর। ওখানে তাঁরা সংসদীয় বক্তৃতায় সুপথে আনবেন ফরাসী সরকারকে।

প্যান আফ্রিকান আন্দোলন পুরনো। এর গোড়া পত্তন হয়েছিল আমেরিকায়। পুরনো দিনের মার্কিন নিগ্রো নেতারা ভাবতেন—নিগ্রোদের মাতৃভূমি আফ্রিকা। ক্রীতদাসের বন্ধন নিয়ে অসহায় নিগ্রোরা এসেছিল আমেরিকায়। তাদের বন্ধন দশার অবসান ঘটেছে। মাতৃভূমি আফ্রিকায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে তারা সুরু করবে স্বাধীন জীবন যাত্রা। আনবে সারা আফ্রিকার মুক্তি। খৃষ্টান মিশনারী, মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এক প্রভাবশালী

অংশ এবং বৃটেন ছিল তাদের সমর্থক। মার্কিনী নিগ্রোদের বসবাসের জন্য বৃটিশ সরকার ছেড়ে দিয়েছিলেন সিয়েরালিওন। বৃটেনের উদ্দেশ্য, বসতি বিরল সিয়েরালিওনে বসতি সৃষ্টি। তাদের সাহায্যে কৃষি এবং খনিজ সম্পদ আহরণ। মিশনারীরা চেয়েছিলেন, এ অঞ্চলকে ঘাঁটি করে গোটা আফ্রিকায় খৃষ্টধর্মের প্রচার। মার্কিনীরা ভেবেছিলেন, স্বাধীন নিগ্রোরা ভবিষ্যতে আমেরিকায় নিত্যনূতন সমস্যা সৃষ্টি করবে। তারা শ্বেতাঙ্গের সমান অধিকারের দাবী জানাবে। কলকারখানার যুগে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন বেশী থাকবে না। আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওরা আফ্রিকায় চলে গেলেই শান্তি। জাহাজ ভর্তি মার্কিন নিগ্রো নেমেছিল সিয়েরালিওনে। দলে দলে মরেছিল তারা। প্যান আফ্রিকান আন্দোলনের প্রকৃতির ধারা পরিবর্তিত হয়েছিল পরে। মার্কিন নিগ্রোরা ধরেছিল উল্টো পথ। তারা ভাবতে শিখেছিল —শ্বেতাঙ্গদের মতই আমেরিকা তাদের নূতন মাতৃভূমি। মার্কিন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ নিগ্রো। নিগ্রোরা আমেরিকাতেই থাকবে। নাগরিক অধিকারের জন্য লড়াই করবে। আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে রাখবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

প্যান আফ্রিকান আন্দোলন দীর্ঘদিন কোন রাজনৈতিক রূপ নিতে পারে নি খাস আফ্রিকায়। কল্পনাবিলাসী ধারণা হিসাবেই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ওটা ছিল সীমাবদ্ধ। ১৯৪৫ সালে ম্যানচেষ্টারে বসল প্যান আফ্রিকান সম্মেলন। জর্জ পাদমোর নক্রুমা এবং জমু কেনিয়াত্তা জড়িয়ে পড়লেন তাতে। তাঁরা বুঝতে পারলেন, আফ্রিকার ঘুম ভাঙ্গাতে হলে প্রায়োজন বুদ্ধিজীবী নিগ্রোদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। শতাব্দীর ক্রীতদাসত্ব এবং পরাধীনতা তাদের সমাজ জীবনে এনেছিল নিদারুণ নৈরাজ্য। পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ গিয়েছিল কমে।

সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ওয়েস্টইণ্ডিজের নিগ্রো সম্প্রদায়। ক্রীতদাস হিসাবে শ্বেতাঙ্গরা তাদের এনেছিল এ দ্বীপপুঞ্জে। খামারে কাজ করত তারা। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীদের মধ্যে বিয়ে সাদী পছন্দ করত না। অবাধ জারজ সন্তান সৃষ্টিতে উৎসাহ পেত ক্রীতদাসরা। পারিবারিক জীবন বলতে কিছু ছিল না। ইচ্ছা করলেই শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেত পারত যে কোন মেয়েকে। কোন প্রতিকার নেই। শ্বেতাঙ্গরা ভাবত, সভ্য তুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী ক্রীতাদাসদের মধ্যে পারিবারিক জীবন গড়ে উঠলেই তারা পাবে সমাজের নূতন মূল্যবোধ। পরিণামে গড়ে উঠবে মানুষের মৌল অধিকারের আন্দোলন। সম্ভাব্য অনাসৃষ্টির উৎসমুখ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল তারা।

আফ্রিকার নিগ্রোরা ছিল পশ্চিমের এই সর্বনাশা ছোঁয়াচ মুক্ত। কিন্তু হীনমন্যতার অভিশাপ থেকে রেহাই পায়নি কোন দিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ঘটেছিল প্রভুশক্তির বিপর্যয়। জাপানের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ। মিত্র-শক্তির সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একযোগে লড়েছে নিগ্রো সৈন্যরা বিভিন্ন রণাঙ্গণে। পৃথিবীর হালচাল দেখেছে নিজেদের চোখে। তারা বুঝেছে, ইংরাজ এবং ফরাসী সর্বশক্তিমান নয়। তাদেরও ঘায়েল করা সম্ভব। যুদ্ধের পর একে একে স্বাধীন হচ্ছিল এশীয়ার বৃটিশ উপনিবেশগুলো। তাদের সংক্রমণ লেগেছিল আফ্রিকার দেহে। নিগ্রো নেতারা অধীর হয়ে পড়ছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমেই চরমপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছিল। প্রথমে ইংরাজ পরে ফরাসীরা বুঝতে পেরেছিল, ঝড়ো হাওয়া বইতে দেরী নেই।

আফ্রিকায় নবযুগের সৃষ্টির করেছিলেন জমুকেনিয়াত্তা। বাইবেল হাতে বৃটিশ মিশনারীরা এসেছিল কেনিয়ায়। তাদের

আড়ালে অনুপ্রবেশ করেছিল শ্বেতাঙ্গ বহিরাগতরা। ঔপনিবেশিক শাসকদের যোগসাজসে ওরা বাসা বেধেছিল হাইল্যাণ্ডে। বিরাট উর্বরভূমি ছিল তাদের দখলে। কৃষ্ণাঙ্গদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। স্থানীয় অধিবাসীদের ঠেলে দিয়েছিল ওরা সংরক্ষিত এলাকায়। জনসংখ্যার অনুপাতে এই অনুর্বর এলাকা ছোট। দেশে কোন শিল্প নেই। ওদের রুজিরোজগারের সুযোগ সীমিত। কিকিয়ু সম্প্রদায় অন্যান্যের তুলনায় উন্নত। তারা বুঝতে পেরেছিল, ইংরাজের খামারে সস্তায় শ্রমিকের জোগান দেবার জন্যই শাসককুল তাদের অর্দ্ধাণাশনে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। জমির ক্ষুধা তাদের প্রবল। ঔপনিবেশিক শাসন বিরাট প্রতিবন্ধক। উর্বর-হাইল্যাণ্ডে যাবার জো নেই। ওটা ইউরোপীয়ানদের দখলে। কফির চাষ লাভজনক। আইন অনুযায়ী স্থানীয় চাষীরা এ ফসল ফলাতে পারে না। কফির চাষে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার। যৌবনে জমুকেনিয়াত্তা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিদেশী অনাচারের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদের জন্য একজন সহকর্মী নিয়ে গিয়েছিলেন লণ্ডনে। পথে ঘটেছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জাহাজে ডেকের যাত্রী তারা। অন্যান্য প্রায় সবাই ইউরোপীয়। বিকেলে দুজনে বসে গল্পগুজব করতেন। যাত্রীরা তাদের সঙ্গে কথা বলত না। কেউ চেয়েও দেখত না। ক'দিন কেটেছিল এভাবে। একদিন এক পাদ্রী চটল তাদের উপর। জমু কেনিয়াত্তা বুঝতে পারলেন না কি অপরাধ তারা করেছেন। পাদ্রীর কথায় তিনি জানলেন, তাদের বেয়াদপি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের দেখে তারা সেলাম ঠুকছেন না। সবিনয়ে কেনিয়াত্তা বললেন, সারাদিন শ্বেতাঙ্গরা ডেকে ঘুরাফেরা করছেন। তাদের প্রত্যেককে সেলাম ঠুকতে গেলে হাত ব্যথা হবে। পাদ্রী অভিযোগ করলেন জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছেন কৃষ্ণাঙ্গযাত্রী দু'জন। তার কিছু করার নেই। কেনিয়াত্তা পরে

খবর নিয়েছিলেন এই পাদ্রীর। তিনি জাতিতে বৃটিশ। বৃত্তি—কেনিয়ায় যিশুর প্রেমের বাণী প্রচার।

জমু কেনিয়াত্তা বুঝেছিলেন, খৃষ্টান মিশনারীদের শিক্ষা নিগ্রো যুবকদের মানসিক অধঃপতন ঘটাচ্ছে। জাতির ধারা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। লণ্ডন থেকে ফিরেই তিনি সুরু করেছিলেন জাতীয়তাবাদী শিক্ষা আন্দোলন। ১৯৩১ সালে আবার পাড়ি জমালেন বৃটেনে। একটানা পনের বছর কাটল সেখানে। ঘুরলেন সারা ইউরোপ। নৃতত্ত্বে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী নিলেন লণ্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস থেকে। ১৯৪৩ সালে বিয়ে করলেন একজন ইংরাজ মহিলাকে। বিয়ের সর্ত—কেনিয়ার ডাক এলে তিনি চলে যাবেন। নিগ্রো-স্বার্থবিরোধী কোন প্ররোচনা বরদাস্ত করবেন না। ১৯৪৫ পালে ম্যানচেষ্টারে জর্জ পাদমোর, নক্রুমা এবং অন্যান্যের সঙ্গে তিনি করলেন প্যান আফ্রিকান আন্দোলনের রাজনৈতিক গোড়া পত্তন।

জর্জ পাদমোর ছিলেন অসাধারণ তাত্ত্বিক। বৃটিশ শ্রমিকদলের সক্রিয় সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন বহুদিন। কৃষ্ণমেননের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তার নিবিড় বন্ধুত্ব। শ্রদ্ধা করতেন গান্ধী—রবীন্দ্রনাথকে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের প্রশ্নে মতান্তর ঘটেছিল শ্রমিকদলের সঙ্গে। এ সময় শ্রমিকদলে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। যুক্তফ্রণ্টের যুগ। কমিউনিস্ট পার্টি বলত—প্রথমে দরকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান। তারপর বৃটেনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। উপনিবেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় মদৎদান শ্রমিকদলের নৈতিক কর্তব্য। শ্রমিকনেতাদের ছিল উল্টো যুক্তি—নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথমে বৃটেনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তারপর উপনিবেশগুলোকে মুক্তিদান। পাদমোর যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ায়। স্ট্যালিনের গোড়ামী এবং নিষ্ঠুরতা

তাঁর ভাল লাগে নি। ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি কমিউনিস্ট পার্টি। লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডে থাকতেন। লিখেছিলেন ঐতিহাসিক গ্রন্থ—প্যান আফ্রিকানিজ্‌ম অর কমিউনিজম। আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসন, শোষন এবং অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যাবে সেখানে। জমু্‌ কেনিয়াত্তাও নিশ্চেষ্ট বসে ছিলেন না। তিনি লিখলেন—ফেইচিং মাউণ্ট কেনিয়া। কেনিয়ার সমাজ জীবনের নিজস্ব মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন এই অসাধারণ বাগ্মী নেতা।

১৯৪৬ সালে জমু্‌ কেনিয়াত্তা ফিরে এলেন কেনিয়ায়। তাঁকে বিশ্বাস করত না ঔপনিবেশিক কর্তারা। ভূমি আন্দোলন দানা বেধে উঠল। জাতীয় জাগরণ চরমে পৌছল। ১৯৫২ সালে স্বুরু হল কৃষক বিদ্রোহ। বৃটিশ প্রচারকরা তার নাম দিল মাও মাও আন্দোলন। সাত বছরের কারাবাস হল কেনিয়াত্তার। চারদিকে চলল অকথ্য নিপীড়ন। আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন নাসের। তাঁর প্রচারযন্ত্র কায়রো বেতার মাও মাওদের সমর্থনে ছড়াতে লাগল আগুন। বৃটিশ প্রচারে যা বর্বর মাও মাও আন্দোলন, কায়রোর প্রচারে তা কৃষক বিদ্রোহ। ক্ষমতা লাভের পর প্রায় দশ বছর নাসের দিয়েছেন আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অকুণ্ঠ মদৎ। পলাতক নিগ্রো নেতারা আশ্রয় নিয়েছেন মিশরে। তাদের অভ্যুত্থানে তিনি জোগিয়েছেন অর্থ এবং অস্ত্র। কায়রোতে গড়ে উঠছে নির্বাসিত অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। মিশরের আনুকুল্যে বিপ্লবী নেতারা একযোগে প্রকাশ করেছেন আল-রবিতাত-আল-আফ্রিকিয়া পত্রিকা। পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমহারিক, স্বহিলী, লিঙ্গালা, সেসোথো, নিয়াঞ্জা, সোমালী এবং ইংরাজী ভাষায় প্রচার চালিয়েছে কায়রো বেতার। ফরাসী, ফুলানী, ইংরাজী এবং হৌসা ভাষায় পশ্চিম আফ্রিকার মুক্তিকামীদের প্রেরণা জোগিয়েছে কায়রো বেতার কেন্দ্রের ভয়েস অফ আফ্রিকা।

চব্বিশ

১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ স্বাধীন হল ঘানা। রাষ্ট্রের হাল ধরলেন নক্রুমা। অনেক ক্ষেত্রেই এই জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে ছিল নাসেরের মনের মিল। উভয়েই সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। নক্রুমা মনে করতেন, ঘানার স্বাধীনতা আফ্রিকার মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ। মিশরের দায়িত্ব কিছুটা কমল। স্বেচ্ছায় ঘানা এই দায়িত্বের খানিকটা অংশ নিজের উপর টেনে নিল। নাসের বাস্তববাদী। নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা তিনি বুঝতেন। আরবদের মনে যেভাবে তিনি রেখাপাত করতে পারতেন, নিগ্রোদের মনে সে-ভাবে রেখাপাত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভাষা এবং জাতিগত ব্যবধানের অবসান সহজসাধ্য নয়। আরব হুনিয়ায় নাসের জনতার নেতা। নিগ্রোদের মধ্যে তিনি জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রথম সারির একজন। নাসের নিগ্রো জনগণের অকৃত্রিম সুহৃদ। নেতা তাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রত্যক্ষ পরিচালকমণ্ডলী। নক্রুমা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্যান আফ্রিনিজম্ তাঁর জীবনের মূল সূত্র। আফ্রিকায় বৃটিশ শাসন অবসানের জন্য তাঁর বিরামহীন সংগ্রাম বৃটেনে তুলেছিল প্রচণ্ড আলোড়ন। সংবাদপত্রগুলো ক্ষেপে উঠেছিল। তাদের চোখে তিনি হলেন দ্বিতীয় নাসের। বৃটেনের আক্রমণ ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল নাসের-নক্রুমার বন্ধুত্ব।

একে একে স্বাধীন হতে লাগল বৃটিশ শাসিত পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো। মুক্তির ঢেউ লাগলো ফরাসী এলাকায়। ফ্রান্সের সঙ্গে প্রশাসনিক মিলনের বদলে জাতীয়তাবাদী নেতারা চাইলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯৫৮ সালে হ্যগল নিলেন ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা। তাঁর সামনে রয়েছে আলেজিরার অভিজ্ঞতা। এই সমস্যার

সমাধানের জন্য তিনি এসেছিলেন প্রশাসনের পুরোভাগে। দ্যগল ঘোষণা করলেন—আফ্রিকার ফরাসী শাসিত অঞ্চলগুলো ফরাসী সাংবিধানিক আওতায় স্বায়ত্তশাসন কিম্বা পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে পারবে। ফরাসী সাংবিধানিক আওতায় থাকলে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং ছোটখাট দুচারটি বিষয় ছাড়া বাকী সবগুলোর নিয়ন্ত্রণের ভার তারা পাবে। ১৯৫৯ সালে হল গণভোট। বিদ্রোহ করলেন গিনির সমাজতন্ত্রী নেতা সেকো তোরে। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানালেন। গণভোটে জিতলেন। গিনির স্বাধীনতা স্বীকার করল ফ্রান্স। বন্ধ হল ফরাসী সাহায্য। ঘানা এবং পূর্ব ইউরোপ তার পাশে এসে দাঁড়াল। আফ্রিকায় দেখা দিল তিন প্রগতিবাদী নেতা—নাসের, নক্রুমা এবং সেকো তোরে। প্যান আফ্রিকান আন্দোলনের সঙ্গে মিশল সমাজতন্ত্র। তাদের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ—দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসন, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ এবং কঙ্গো।

বেলজিয়ান শাসন চলছিল কঙ্গোতে। কৃষি এবং খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ এই দেশ বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং আমেরিকার পুঁজিপতিদের শোষনের লীলাভূমি। গোটা দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে পশ্চিমী কোম্পানী ইউনিয়ন মিনিয়েরে। জনসাধারণ শিক্ষাদীক্ষা বর্জিত। আঞ্চলিক এবং খণ্ড জাতীয় সঙ্কীর্ণতায় তারা বিভক্ত। জাতীয়তাবাদী নেতা বলতে কেউ ছিলেন না। খণ্ড জাতীয় ভিত্তিক তাদের রাজনীতি। বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর রাখার উপায় ছিল না। ঔপনিবেশিক বেলজিয়ান শাসকগোষ্ঠী তা পছন্দ করতেন না। আফ্রিকার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ,গতি তাদের নজর এড়ায়নি। কায়েমী-স্বার্থ বজায় রাখতে হলে দরকার স্থানীয় অধিবাসীদের প্রশাসনের সুযোগ দান। শিক্ষায় অনগ্রসর কঙ্গোতে প্রশাসন সংস্কারের অসুবিধা অনেক। স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকেরা শোষণেই ছিলেন ব্যস্ত। শিক্ষা থেকে জনতাকে তারা রেখেছিলেন

বহুদূরে। কঙ্গো বহির্দুনিয়ার কাছে অজ্ঞাত। ১৯৫৮ সালে নক্রুমা আক্রায় ডাকলেন আফ্রিকান গণসম্মেলন। সেখানে এলেন প্যাট্রিস লুমুম্বা। অদ্ভুত তাঁর বাচনভঙ্গী। ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন কঙ্গো লুমুম্বার স্বপ্ন। সবার দৃষ্টি পড়ল এই তরুণ নেতার উপর। কঙ্গো প্যান আফ্রিকান আন্দোলনের অঙ্গ।

১৯৬০ সালের ৩০শে জুন বেলজিয়ান শাসন থেকে মুক্তি পেল কঙ্গো। প্রেসিডেন্ট হলেন খণ্ডজাতীয় নেতা জোসেফ কাসাভুবু এবং প্রধানমন্ত্রী জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা। এ দুজনের মতবাদের পার্থক্য বিরাট। কাসাভুবুর রাজনীতিতে ছিল আঞ্চলিক স্বার্থের প্রাধান্য। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থার সমর্থক। লুমুম্বা এককেন্দ্রিক শাসনের পক্ষপাতী। তাঁর ধারণা, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ছাড়া বিচ্ছিন্ন কঙ্গোকে একসূত্রে বাঁধা যাবে না। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দেশকে গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। লুমুম্বার বাগ্মীতা এবং জনপ্রিয়তার সামনে প্রথমে কাসাভুবু দাঁড়াতে পারেননি। তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ভিতরে ভিতরে বিচ্ছিন্নতার ফন্দী আঁটছিলেন। লুমুম্বার জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বেলজিয়ানদের মনঃপূত হয়নি। তাদের ধারণা হয়েছিল, অদূর ভবিষ্যতে জাগ্রত আফ্রিকার অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ঢেউ আসবে কঙ্গোতে। তাদের কায়েমীস্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়বে। তারাও শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসার ফিকির খুঁজছিল।

স্বাধীনতার পর কঙ্গোলীজ সৈন্যরা দেখল তাদের মাথার উপর রয়েছে বেলজিয়ান সামরিক অফিসার। শ্বেতাঙ্গরা পরিচালনা করছে অসামরিক দপ্তর। তারা বিদ্রোহের আগুন জ্বালল। লুমুম্বা অসহায়। স্বাধীনতার পর মাত্র সপ্তাহখানের মধ্যে প্রশাসনিক ওলটপালট তার পক্ষে সম্ভব নয়। সারা দেশ খুঁজলে পাওয়া যায় না একজন গ্র্যাজুয়েট। দেশ শাসন করবেন কাদের নিয়ে?

বেলজিয়ানরা পঙ্গু করে রেখেছে এই দেশ। পুরনো দিনে হাজার হাজার কঙ্গোলীজ নরনারীকে তারা ক্রীতদাস হিসাবে বাইরে বেচেছে। শ্বেতাঙ্গের খামারে কাজে ফাঁকি দেবার অজুহাতে পাইকারী হারে পিটিয়ে মেরেছে। তার বেশীকিছু শ্বেতাঙ্গী প্রভুরা জনগণকে দিয়ে যায়নি।

বিদ্রোহের নেশায় কঙ্গোলীজ সৈন্যরা হত্যা করল তাদের বেলজিয়ান অফিসারদের। চারদিকে চলল শ্বেতাঙ্গবিরোধী বিক্ষোভ। বেলজিয়াম নামাল ছত্রীবাহিনী। স্বাধীন রাষ্ট্রে ঘটল বকেয়া মনিবদের সামরিক হস্তক্ষেপ। কঙ্গোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাবিকাঠি কাতাঙ্গার হাতে। এই প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন শোম্বে। তাঁর পিছনে দাঁড়াল বেলজিয়াম। টাকা ঢালতে লাগল কঙ্গোর খনি এবং কৃষিসম্পদের মালিক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদাররা। লুমুম্বা রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাইলেন। সৈন্যদল নিয়ে বিমান থেকে লিওপোল্ডভিলে নামলেন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামার শীল্ড। প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। তাঁর হাবভাবে মনে হল, তিনি আইন সম্মত সরকারকে সাহায্য করতে আসেননি, এসেছেন কঙ্গো বিজয় অভিযানে। প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু আবার ফেডারেশনের ধূয়া তুললেন। সুরু হল লুমুম্বা-কাসাভুবুর মন কষাকষি। একে অন্যকে গদীচ্যুত করলেন। আইন সভায় সংখ্যাধিক্যের সমর্থন লাভ লুমুম্বার পক্ষে কঠিন নয়। চীফ অফ স্টাফ মোবুটুর সঙ্গে ঘটল কাসাভুবুর গোপন আঁতাত। মোবুটুর পিছনে ছিল শ্বেতাঙ্গ চক্রীদল। কাসাভুবু এবং লুমুম্বাকে গদীচ্যুত করে তিনিই দখল করতে চাইলেন সর্বময় কর্তৃত্ব। সরকারী ভাণ্ডার শূন্য। সৈন্যরা বেতন পাচ্ছে না। তারা মোবুটুর প্ররোচনায় বিদ্রোহ ঘোষণার উপক্রম করল। লুমুম্বা একা ঢুকলেন লিওপোল্ডভিলের সৈন্য ব্যারাকে। তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং বক্তৃতায় শান্ত হল সৈন্যদল। বিজয়ীর বেশে

তিনি ফিরে এলেন। বস্তাভর্তি টাকা নিয়ে মোবুটু গেলেন সৈন্য ব্যারাকে। বকেয়া বেতন শোধ করে আগাম দু'মাসের বেতন দিয়ে দিলেন তাদের। সৈন্যবাহিনী দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল লুমুম্বার সমর্থক এবং অন্যদল মোবুটুর। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী নীরব দর্শক এবং নিরপেক্ষ। মিশর, ভারত, ঘানা, গিনি প্রভৃতি প্রগতিবাদী আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলো দাবী জানাল— লুমুম্বাকে সাহায্য দান রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর নৈতিক কর্তব্য। কারণ তিনি কঙ্গোর বৈধ প্রধানমন্ত্রী। স্বস্তিপরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী এই সরকারই সাহায্য লাভের অধিকারী। সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ড অনড়। আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি পশ্চিমী শক্তিজোট তাঁর সহায়। তিনি মোবুটুকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিতে লাগলেন। কোথা থেকে মোবুটু এত টাকা পাচ্ছিলেন তা কারও অজ্ঞাত ছিল না। ঘানার সৈন্যদল গিয়েছিল কঙ্গোতে। তাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল হেনরী আলেকজাণ্ডার। জাতিতে বৃটিশ। স্বাধীনতার পর নক্রুমা তাঁকে চাকুরীতে বহাল রেখেছিলেন। এই জেনারেলটি তাঁর নিজের দায়িত্বে লমুম্বা সমর্থক কঙ্গোলীজ সৈন্যদের অস্ত্র কেড়ে নিলেন। মোবুটুর সমর্থকদের হাতে রইল অস্ত্র। তারা পার্লামেণ্ট ভবন দখল করল। লিওপোল্ডভিল বিদ্রোহীদের হাতে চলে গেছে। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর প্রহরায় দিন কাটাচ্ছেন লুমুম্বা। ওরিয়েণ্ট এবং কিভু প্রদেশে তার শক্তঘাঁটি। সেখানে রয়েছেন এ্যাণ্টনী গিজেঙ্গা। একবার এ অঞ্চলে পৌঁছতে পারলে লুমুম্বা নিরাপদ। এখান থেকেই অভিযান চালিয়ে তিনি উদ্ধার করতে পারবেন লিওপোল্ডভিল। স্ট্যান্‌লিভিলের দিকে রওনা হলেন লুমুম্বা। তাঁর এই গোপন যাত্রার কথা জানল মোবুটু। আরম্ভ হল সন্ধান। ধরা পড়লেন মোবুটুর সৈন্যদের হাতে। প্রহার জর্জরিত বন্দী লুমুম্বা ফিরে এলেন লিওপোল্ডভিলে। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী হস্তক্ষেপ করল না।

ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন নাসের। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন ঘানার নক্রুমা। ভারতের নেহরু চঞ্চল। রাষ্ট্রসংঘে চলল প্রচণ্ড আলোড়ন। সোভিয়েট রাশিয়া কঠোর ভাষায় আক্রমণ করল হ্যামারশীল্ডকে। বৃটেন এবং ফ্রান্সের কদর্য নগ্নরূপ বেরিয়ে পড়ল। তারা আফ্রো-এশিয়ার সব চেষ্টা বানচাল করার পাঁয়তারা কষতে লাগল। কঙ্গোর বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখলেন কাতাঙ্গার শোম্বে এবং লিওপোল্ডভিলের মোবুটু—কাসাভুবুর সঙ্গে।

১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে বসল কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন। ঘানা, গিনি, মালি, মরোক্কো এবং সংযুক্ত আরব রিপাব্লিকের রাষ্ট্রপ্রধানরা যোগ দিলেন তাতে। আলজেরিয়ার অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রধান, লিবিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কায়রোর সিংহলী রাষ্ট্রদূতও বাদ গেলেন না। আফ্রিকায় পশ্চিমী ষড়যন্ত্র গভীর। কায়েমী স্বার্থ তারা সহজে ছাড়বে না। এই মহাদেশের যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্র কঙ্গোর অবস্থায় পড়তে পারে। তাদের সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দরকার। প্রগতিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সংহতি ভিন্ন প্রত্যাশিত সাহায্যদান সম্ভব নয়। সম্মেলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন নাসের, সেকো তোরে এবং নক্রুমা। যৌথ সামরিক কম্যাণ্ড গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন তারা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য তৈরী হল গোটা কয় কমিটি। সামনে কঙ্গো সঙ্কট। সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন প্রগতিবাদী আফ্রিকার নায়কেরা। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী নিদারুণ প্রতিবন্ধক। লুমুম্বার আমন্ত্রণে এবং তাঁকে সাহায্যের জন্য তারা গেছে কঙ্গোতে। সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ড বৃটিশ, ফ্রান্স এবং আমেরিকার হাতের পুতুল। তাঁর চক্রান্তে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী হল লুমুম্বা উচ্ছেদের প্রধান হাতিয়ার। হাতদুটি পিঠমোড়া দিয়ে বাধা। মুখটি ফোলা। কপালে ক্ষত চিহ্ন। দৃষ্টি উদভ্রান্ত। ঘাড়ধরে লুমুম্বাকে টেনে নিয়ে এল মোবুটুর সৈন্যরা। একটি

বিমানে উঠাল তাঁকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী। ঘানার বৃটিশ সেনাপতি আলেকজাণ্ডার সবচেয়ে সিনিয়র। তার কড়া নির্দ্দেশ—কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। ঘানার তরুণ সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিল চাঞ্চল্য। লুমুম্বাকে রক্ষার জন্য তাদের পাঠান হয়েছে কঙ্গোয়। আর তাদের চোখের সামনেই ঘাতকেরা নিয়ে যাচ্ছে নক্রুমার বন্ধুকে। লুমুম্বাকে পাঠান হল কাতাঙ্গায়। তিনি শোম্বের বন্দী। শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটিয়া সৈন্যদের দখলে এই অঞ্চল। টাকা জোগায় পশ্চিমী স্বার্থচক্র। এদের মুরুব্বী ফ্রান্স, বৃটেন, বেলজিয়াম এবং আমেরিকা। কাতাঙ্গার বিচ্ছিন্নতাকামী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অবসান ঘটাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রসংঘের। সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ডের উপর রয়েছে এই ম্যানডেট। অথচ কঙ্গোতে লেখা হচ্ছে উলট পুরাণ। বেআইনী ক্ষমতার দখলদার মোবুটু এবং শোম্বের সঙ্গে চলছে রাষ্ট্রসংঘের স্থানীয় পরিচালকদের পরোক্ষ আঁতাত। হ্যামারশীল্ড তার প্রবক্তা। নাসের, নক্রুমা এবং সেকো তোরে লুমুম্বা উদ্ধারের জন্য ছটফট করছেন। তারা বলপ্রয়োগেও রাজী। স্বস্তিপরিষদে উঠেছে প্রচণ্ড ঝড়। বৃটেন এবং ফ্রান্স প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। তাদের কথা—কাতাঙ্গার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ চলবে না। শোম্বোকে বুঝিয়ে সুজিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় আনতে হবে। ওদিকে শোম্বে যাতে কোন বোঝা পড়ায় না আসেন তার জন্য চলছে অবিরাম উস্কানী।

লুমুম্বার কোন খবর নেই। সারা তুনিয়া উদ্বিগ্ন। কঙ্গোতে কর্মরত ঘানার সৈন্যদলের একাংশ বিদ্রোহ করল তাদের বৃটিশ সেনাপতির বিরুদ্ধে। জেনারেল আলেকজাণ্ডার শৃঙ্খলার নামে কঠোর শাস্তি দিলেন বিদ্রোহীদের। নক্রুমা নিজের হাত নিজে কামড়াতে লাগলেন। প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি পরে। কঙ্গোর নাটক শেষ হয়েছে। ঘানার সৈন্যদল ফিরে এসেছে স্বদেশে।

তাদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। ১৯৪৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি সরাসরি বরখাস্ত করলেন জেনারেল হেনরী আলেকজাণ্ডারকে। সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব নিলেন নিজের হাতে। বৃটিশ সরকারকে জানিয়ে দিলেন—ঘানার সৈন্যদলে কোন বৃটিশ অফিসারের আর দরকার নেই। বিলেতি পত্রিকাগুলো প্রচার সুরু করলেন—নক্রুমা কমিউনিস্ট।

১৯৪৪ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী। জাতীয়তাবাদী আফ্রিকার মহাদুর্দ্দিন। প্যান আফ্রিকান আন্দোলনের উপর নিদারুণ আঘাত। কাতাঙ্গা থেকে ঘোষণা করা হল লুমুম্বা নিহত। জেল থেকে পালাবার সময় রক্ষীরা তাঁকে গুলি করে মেরেছে। বি.বি.সির সংবাদে প্রতিধ্বনিত হল এ সংবাদ। আনন্দে অধীর হয়ে উঠল রক্ষণশীল মহল। বৃটিশ ফ্যাসিস্তরা বিজয় উৎসবে মাতল। লুমুম্বার উপর তাদের প্রচণ্ড আক্রোশ। কঙ্গোতে শ্বেতাঙ্গের গায়ে হাত দিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ। এ অপমানের প্রতিশোধ চাচ্ছিল তারা। কঙ্গোর সঙ্কটের সময় আমেরিকা যাবার পথে লণ্ডনের রিজ হোটেলে উঠেছিলেন লুমুম্বা। তাঁকে প্রহারের তালে ছিল শ্বেতাঙ্গরা। ঘানার হাইকমিশনার দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে। হোটেলের ফটকে লুমুম্বা ভ্রমে তাঁর উপরই চড়াও হয়েছিল বৃটিশ ফ্যাসিস্তরা। লুমুম্বা নিহত। চরম প্রতিশোধ নিয়েছে ভাড়াটিয়া শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা এবং তাদের দোসর দেশদ্রোহী শোম্বে।

সারা দুনিয়া উত্তাল। গর্জে উঠল আফ্রো-এশিয়া। বৃটেনের উপর জড় হতে লাগল অজস্র ধিক্কার। আমেরিকা স্তম্ভিত। তার ধারণা লুমুম্বা সাধারণ মানুষ। আফ্রিকায় খণ্ড জাতীয় বিরোধ এবং হত্যাকাণ্ড লেগেই আছে। তারমধ্যে লুমুম্বা ডুবে যাবেন। কিন্তু এই হত্যায় যে এত বড় আন্তর্জাতিক অলোড়ন সৃষ্টি হবে তা মার্কিন নেতাদের কল্পনায় আসেনি। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন নাসের।

কায়রো থেকে তিনি যেন শুনতে পেলেন লুমুম্বার পত্নীর বুকফাটা কান্না। তাঁর পিতৃহীন শিশুদের আর্তনাদ। কঙ্গোতে জল্লাদদের রাজত্ব। লুমুম্বার ছেলেমেয়েরা সেখানে নিরাপদ নয়। তাদের কায়রোতে নিয়ে আসার নির্দ্দেশ দিলেন নাসের। তাঁর প্রতিশ্রুতি —যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন ততদিন লুমুম্বার সন্তানরা নিরাশ্রয় হবে না। নিজের সন্তানের মত মানুষ করবেন তাদের। লুমুম্বার ছেলেমেয়েরা এসেছিলেন কায়রোতে। কঙ্গোর শান্তি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তারা ছিলেন সেখানে--নাসেরের কাছে। পেয়েছিলেন তাহিয়া খাজামের বুক ভরা স্নেহ।

জেল থেকে পালাবার সময় রক্ষীর গুলিতে লুমুম্বার মৃত্যুর কাহিনী বিশ্বাস করেনি কেউ। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কাতাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিলে। একটি নির্জন ঘরে আটক ছিলেন তিনি। তাঁর হত্যার পরিকল্পনা আগে থেকেই পাকাপাকি করে রেখেছিলেন শোম্বে। স্থানীয় বৃটিশ কন্সাল হয়ত জানতেন এই ষড়যন্ত্রের কথা। সম্ভবত তাঁরও ছিল গোপন সম্মতি। রাত্রে একজন ভাড়াটিয়া শ্বেতাঙ্গ সৈন্য এবং জনাকয় কাতাঙ্গী অফিসার নিয়ে শোম্বে ঢুকলেন লুমুম্বার কক্ষে। শ্বেতাঙ্গ ঘাতকের হাতে পিস্তল। চমকে উঠলেন লুমুম্বা। তিনি প্রার্থনার সময় চাইলেন। হাটু গেড়ে বসলেন। উন্মাদের মত গুলি চালাল শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটিয়া। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন লুমুম্বা। রক্তে ভিজে গেল সারা ঘর। তাঁর দেহ কোথায় সমাহিত হল তা জানতেও পারল না বাইরের দুনিয়া। যেদিন তিনি এলিজাবেথভিলে পৌঁছেছিলেন সেদিন রাত্রেই ঘটেছিল এই হত্যাকাণ্ড। পাঁচ দিন পরে প্রচারিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যু সংবাদ।

রাষ্ট্রসংঘে তুমুল উত্তেজনা। আফ্রো-এশীয় এবং পূর্ব ইউরোপের প্রতিনিধিরা রাগে ফেটে পড়ছিলেন। সেক্রেটারী জেনারেল

হ্যামারশীল্ডের উপর আস্থা নেই কারও। শুধুমাত্র বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং তাঁদের বশংবদ রাষ্ট্রগুলো তাঁর সহায়। কাতাঙ্গায় জড় হচ্ছে ফরাসী, বেলজিয়ান, বৃটিশ, শ্বেতাঙ্গ রোডেশিয়ান, জার্মান এবং দক্ষিণ আফ্রিকান ভাড়াটিয়া সৈন্য। স্থানীয় শ্বেতাঙ্গদের হাতে রয়েছে আগ্নেয় অস্ত্র। ইউনিয়ন মিনিয়েরের কারখানায় তৈরী হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর উপর নির্দ্দেশ—বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈন্যদের দেশছাড়া করা, কাতাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটান এবং আইন ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে কাতাঙ্গায় ঢুকতে দেবেন না শোম্বে। আপোষ আলোচনায় আসবেন না তিনি। এলেও বারবার প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গবেন। কাতাঙ্গার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে বৃটেন এবং তার রক্ষণশীল পত্রিকাগুলোর ঘোরতর আপত্তি। ফ্রান্স তাদের দোসর। সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব পিছন থেকে বানচাল করা বৃটিশ-ফরাসীর যৌথ পরিকল্পনা। লুমুম্বার একনিষ্ঠ সমর্থক এ্যান্টনী গিজেঙ্গা। স্ট্যান্‌লিভিলে গঠন করলেন স্বাধীন সরকার। বৃটিশ পত্রিকাগুলো ক্ষেপে উঠল। তাদের দাবী—সশস্ত্র অভিযানের দ্বারা গিজেঙ্গাকে পর্য্যুদস্ত করতে হবে। তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় না আনলে কঙ্গোর ঐক্য অসম্ভব। ১৩ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সঙ্গে ঘটল কাতাঙ্গার সশস্ত্র বিদ্রোহীদের প্রথম সংঘর্ষ। সল্‌সবেরী থেকে শ্বেতাঙ্গ পাইলটরা বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করল। রোডেশিয়ান ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রী স্যার রয় ওয়েলেনস্কী রাষ্ট্রসংঘের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর। ২৪শে নবেম্বর হ্যামারশীল্ড অগস্ত্য যাত্রা করলেন লিওপোল্ডভিল থেকে। তাঁর বিমান চলছিল রোডেশিয়ার পথে। অস্ত্র সম্বরণের ব্যবস্থার জন্যই নাকি সুরু হয়েছিল তাঁর এই শান্তি অভিযান। উত্তর রোডেশিয়ার আকাশে ঘটল বিমান দুর্ঘটনা। রহস্যজনকভাবে

মারা গেলেন হ্যামারশীল্ড। উথাণ্ট হলেন রাষ্ট্রসংঘের আস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারী।

শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটিয়া সৈন্যদের নিয়ে মহাবিপদে পড়লেন কঙ্গোর রাষ্ট্রসংঘ প্রতিনিধিরা। ওরা রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছিল। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছিল। নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে হত্যা করছিল। যারা কাতাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার বিরোধী তাদের উপরই ঝাপিয়ে পড়ছিল তারা। ভাড়াটিয়া সৈন্যদলে আছে বৃটিশ নাগরিক। একথা প্রথম স্বীকার করেনি বৃটেন। হাতেনাতে ধরা পড়ল ক'জন বৃটিশ ভাড়াটিয়া। তাদের মধ্যে একজন বৃটিশ রক্ষণশীল দলের এম-পির ভাই। অমনি সুর পাল্টালেন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং বৃটিশ পত্রিকাগুলো। কৃষ্ণাঙ্গের আদালতে শ্বেতাঙ্গের বিচার ইউরোপের অপমান। কৃষ্ণাঙ্গের কারাগার সভ্য শ্বেতাঙ্গদের বাসোপযুগী নয়। রাষ্ট্রসংঘের কার্য্যকর ক্ষমতা শ্বেতাঙ্গদের হাতে। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী ভাড়াটিয়াদের ধরে সীমান্ত পার করে দিত। অন্যপথে তারা আবার কঙ্গোতে ঢুকত। ক'দিন চলল এই লুকোচুরি খেলা। রাষ্ট্রসংঘের আইরিশ প্রতিনিধি ডঃ কোনরক্রুইজ ওব্রায়েন ছিলেন কঙ্গোতে। তিনি অসামরিক দপ্তরের অন্যতম কর্মকর্তা। স্বাধীনচেতা ওব্রায়েন। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব যথাযত রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি পড়লেন বৃটিশ নেকড়েদের মুখে। তাদের ষড়যন্ত্রে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তিনি। নক্রুমা ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁকে ঘানার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রাষ্ট্রসংঘে আফ্রো-এশিয়ার চাপ প্রবল। উথাণ্ট কঠোর হয়ে উঠলেন। হ্যামারশীল্ড নেই। গুরুতর প্রতিবন্ধক অপসারিত। আমেরিকার মতিগতি পাল্টাচ্ছে। সে বুঝেছে, আফ্রো-এশিয়ার প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে চিনকোলোবয়ের উরেনিয়াম এবং রেডিয়াম খনির উপর তার একছত্র অধিকার বেশীদিন থাকবে না।

পারমাণবিক যুগে এ দুটি জিনিসের বড় দরকার। মার্কিন স্বার্থে ইউনিয়ন মিনিয়েরে পরিচালনা করত এ খনি। লুমুম্বার ভীতি আর নেই। আফ্রো-এশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ায় সে উৎসুক। ২৪শে নভেম্বর বসল স্বস্তিপরিষদের বৈঠক। গৃহীত হল প্রস্তাব— কঙ্গো থেকে বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈন্য তাড়াতে হবে। কাতাঙ্গার বিচ্ছিন্নতা চলবে না। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী বল প্রয়োগ করবে। বৃটেন এবং ফ্রান্স ভোটদানে বিরত রইল।

বৃটিশ মহলে পড়ে গেল মরাকান্না। উচ্চগ্রামে সুর ধরলেন টাইমস। এলিজাবেথভিল থেকে সানডে টেলিগ্রাফের বৈদেশিক সংবাদদাতা ডগলাস ব্রাউন লিখলেন (২৬শে নভেম্বর)—বর্ণসমন্বয়ের প্রতীক এইসব নিঃস্বার্থ সৈন্য (ভাড়াটিয়া) আদর্শের জন্য নিজেদের রক্ত দিতে প্রস্তুত। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তারা সংগ্রাম করছে। সারা দেশ আফ্রো-এশিয়ার বর্ণবিদ্বের বিষে জর্জরিত। ওরা যদি জেতে তবে তৈরী হবে আফ্রিকা-ইউরোপের মিলন সেতু। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসলীলার বিবরণ পাঠাতে লাগলেন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকরা। বৃটিশ পত্রিকাগুলো ছাপছিলেন রোমাঞ্চকর বিবরণ। ইউরোপীয় সৈন্যদের সমর কুশলতার উপর অনেকের আবার গভীর আস্থা। তাদের ধারণা, কাতাঙ্গার শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে লড়াইএ রাষ্ট্রসংঘের আফ্রো-এশীয় বাহিনী পেরে উঠবে না। ওদের হাতে আছে রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গী বিমান। স্থানীয় সরকারের গোপন যোগসাজসে এগুলো ব্যবহৃত হয় কঙ্গোতে। প্রকাশ্যে স্বীকার করে না কেউ। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর মাথার উপরে নেই বিমানছত্র। জঙ্গী বিমানের বোমা বর্ষণের মুখে একেবারেই অসহায়। কাতাঙ্গাকে শায়েস্তা করতে হলে চাই জঙ্গী বিমান। নাসের দিতে পারেন জঙ্গী বিমান। তাঁর একদল সৈন্য রয়েছে কঙ্গোতে। প্রতিবেশী ইস্রাইল আগ্রাসী। নিজের রাষ্ট্র অরক্ষিত রেখে জঙ্গী বিমান বাইরে পাঠান তাঁর পক্ষে

সম্ভব নয়। ইথিউপিয়ার আছে ছোট বিমানবহর। তার পাইলটরা মার্কিনী। তাদের উপর আস্থা রাখা বিপজ্জনক। ভারত জঙ্গী বিমান দিতে রাজী। বিমানগুলো বৃটেনে তৈরী। বৃটিশ মার্কা বোমা দরকার। অন্য বোমায় কাজ চলবে না। উথাণ্ট বৃটেনের কাছে বোমা চাইলেন। কাতাঙ্গার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য কোন বোমা বৃটিশ সরকার দেবেন না। সবশেষে কঙ্গোতে এল সুইডিস জঙ্গী বিমান। প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত।

এদিকে কাতাঙ্গায় উঠেছে সাজসাজ রব। রাস্তায় রাস্তায় তৈরী হচ্ছে ব্যারিকেড। বীরের বেশে বেরিয়ে পড়েছে ভাড়াটিয়ারা। অসামরিক শ্বেতাঙ্গরা কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ইউনিয়ন মিনিয়েরের সদর দপ্তর পরিণত হয়েছে সামরিক ঘাঁটিতে। গোটা এলিজাবেথভিল সমর উত্তেজনায় কাঁপছে। ভাড়াটিয়া শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর। তার ধারণা—লালচে মুখ এবং কটা চোখের পাকলানী দেখলেই রাষ্ট্রসংঘের কৃষ্ণাঙ্গ বাহিনী যুদ্ধ ছেড়ে চম্পট দেবে। কিছুটা বাধা আসবে ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে। শ্বেতাঙ্গ সুইডিস সৈন্যরা ওদের সঙ্গে আছে। তাতে ক্ষতি নেই। নিগ্রোদের জন্য শ্বেতাঙ্গ —শ্বেতাঙ্গের রক্তপাত করবে না। নিয়ম রক্ষার জন্য হয়ত তারা যুদ্ধের ভান করবে। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অভিযানের আগেই আক্রমণের পরিকল্পনা আঁটল কাতাঙ্গার ভাড়াটিয়া সৈন্যদল। দেরী করার সময় নেই। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী জেনারেল সেক্রেটরী হয়েছেন উথাণ্ট। তাঁর হাত আগের চেয়ে বেশি জোরদার। বৃটেনকে তিনি আর বেশি আমল দিচ্ছেন না। আমেরিকার পরিবর্তিত নীতি রাষ্ট্রসংঘকে সক্রিয় করে তুলেছে। বৃটেন পড়েছে বেকায়দায়। শুরু হল কাতাঙ্গা অভিযান। এলিজাবেথভিলে পৌছাল রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী। ভারতীয় সৈন্যরা নিজেদের সেনাপতিদের নির্দেশে লড়াই করবে। শ্বেতাঙ্গ সেনাপতিদের মুরুব্বিয়ানা সেখানে

চলবে না। ঘানার সৈন্যাধ্যক্ষ বৃটিশ জেনারেল আলেকজাণ্ডারের কীর্তির কথা মনে ছিল সবার। রাষ্ট্র সংঘ বাহিনীতে সিনিয়রিটির সুযোগের অপব্যবহার করেছিলেন তিনি। সুইডিস এবং ভারতীয় ডোগরা রেজিমেণ্টের একটি দল ঢুকল এলিজাবেথভিলে। ইউনিয়ন মিনিয়েরের বাড়ীর ছাদে ছিল্ একদল শ্বেতাঙ্গ। তারা গুলি বর্ষণ করল। অনেকের ধারণা, প্রথম গুলি এসেছিল বৃটিশ কন্সালের বাড়ী থেকে। আরম্ভ হল প্রচণ্ড লড়াই! স্থানীয় পোস্ট অফিস ভবনে ভাড়াটিয়ারা গড়েছিল সামরিক ঘাঁটি। কথা ছিল, সুইডিস সৈন্যদল সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে এগুবে। তাদের আড়ালে মার্চ করবে ভারতীয় সৈন্যরা। ভাড়াটিয়াদের অবিরাম গুলি বর্ষণের মুখে থমকে দাঁড়াল সাজোয়া গাড়ীগুলো। সুইডিসরা এগুচ্ছে না। অধীর হয়ে পড়ল ভারতীয় সৈন্যরা। সাঁজোয়া গাড়ীর আড়াল ছেড়ে পোস্ট অফিসের দিকে দৌড়াল তারা। ফটকে প্রবল বাধা। জমে উঠল হাতাহাতি লড়াই। একদিকে শ্বেতাঙ্গ এবং অপরদিকে ভারতীয়। ভাড়াটিয়ারা প্রথম পেল মারের স্বাদ। পিছু হটল তারা, একতলায় ঢুকল ভারতীয়েরা। পলায়ন পথ বন্ধ। ভাড়াটিয়ারা ছুটল উপরের তলায়। পিছু ধাওয়া করল ডোগরা সৈন্যরা। সিঁড়িতে সিঁড়িতে চলল লড়াই। তারপর ছাদে। ভাড়াটিয়ারা আত্মসমর্পণ করল। ওরা মারতে এসেছিল, মরতে আসেনি। মরার পালা সুরু হতেই বর্ণসাম্য প্রতিষ্ঠার (সানডে টেলিগ্রাফের মতে) আকাঙ্ক্ষা গেল উবে। সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ জনতা অস্ত্র ফেলে ক'ঘণ্টার মধ্যেই সাজল অসামরিক ভদ্রলোক। কিন্তু কোথায় শোম্বে? তাঁকে দরকার। তাঁর বাড়ী ঘেরাও করল রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী। শোম্বে নেই। তিনি পলাতক। পরে জানা গেল, বৃটিশ কন্সালের বাড়ীতে তিনি লুকিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে পাচার করা হয়েছে সল্‌সবেরীতে। বৃটেন আর্তনাদ করে উঠল। ভারতীয় বর্বরতার কাহিনী প্রচার

করতে লাগল রক্ষণশীল পত্রিকাগুলো এবং বি-বি-সি। বৃটিশ সরকার অবিলম্বে অস্ত্র সম্বরণের দাবী জানালেন। বললেন—গায়ের জোরে কঙ্গোর রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। আমেরিকা সরে দাঁড়িয়েছে। বৃটেনের কথা কে শোনে? সাফ জবাব মিলল—উদ্দেশ্য সিদ্ধির আগে রাষ্ট্রসংঘ-বাহিনী অস্ত্র সম্বরণ করবে না। দু চার সপ্তাহ ধরে চলল কাতাঙ্গার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটখাট সংঘর্ষ। বিদেশীদের কাছে ভারতীয় সৈন্যরা গোর্খা। ডোগরারাও তাদের চোখে গোর্খা। ভাড়াটিয়া এবং কাতাঙ্গীদের মধ্যে গোর্খা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। কাতাঙ্গার দ্বিতীয় বড় সহর জ্যাডৎভিল। ভারতীয় সৈন্যরা সেখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই কাতাঙ্গী বাহিনী এবং তাদের ভাড়াটিয়া শ্বেতাঙ্গ সেনাপতিরা অস্ত্র শস্ত্র ফেলে জঙ্গলে লুকাল। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে এলিজাবেথভিলে ফিরে এলেন শোম্বে। তার আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ। নাসেরের মন দুঃখে ভরা। রাষ্ট্রসংঘের এ অভিযান যদি আগে আরম্ভ হত তবে লুমুম্বা বাঁচতেন। আফ্রিকায় একটি নূতন জ্যোতিষ্কের পূর্ণ আবির্ভাব ঘটত।

পঁচিশ

কঙ্গোর আঘাত গা-সহা হয়ে গেছে। নাসের এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী বাস্তববাদী। প্রগতিবাদী আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো নিয়ে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে গড়ে উঠেছিল কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী। জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সত্যিকারের রূপায়ণ ঘটেছিল সেখানে। এরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কঙ্গোর দুর্গতি যদি অপর কোন স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রে আসে তবে

সংঘবদ্ধ সামরিক হস্তক্ষেপও ছিল তাদের কল্পনা। তারজন্য যৌথ সামরিক কম্যাণ্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এত করেও তারা লুমুম্বার কঙ্গোকে বাঁচাতে পারেনি। শোম্বে পর্যুদস্ত। কিন্তু ক্ষমতা চলে গেছে মোবুটু—কাসাভুবুর হাতে। কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী পরাজিত। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের ইঙ্গিতে নরমপন্থীরা তৈরী করেছিল মোনরোভিয়া জোট। লাইবেরিয়া, ক্যামারুণ, নাইজেরিয়া এবং টোগো ডেকেছিল সম্মেলন। ১৯৪৪ সালের মে মাসে লাইবেরিয়ার রাজধানী মোনরোভায় বসেছিল তাদের বৈঠক। কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী বর্জন করেছিল এ সম্মেলন। দুটি জোটের লক্ষ্য আলাদা। কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক। জোট নিরপেক্ষতা তাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। মোনরোভা জোট পশ্চিম ঘেষা। প্রাক্তন ইউরোপীয় প্রভুশক্তির সঙ্গে তাদের অর্থনীতি আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। তারা চায় পশ্চিমের ঘনিষ্ট সহযোগিতা। কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠীর ধারণা, মোনরোভা জোট পশ্চিমের নব সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ঘাঁটি।

কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠীর প্রভাবশালী শরিক সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক, ঘানা, গিনি এবং মালি। নেতারা মনেপ্রাণে বিপ্লবী। সমাজজীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে তাঁরা বদ্ধ পরিকর। সংস্কারের গতি সেখানে দ্রুত। সাধারণ মানুষ আশাবাদী। মোনরোভা জোটের যারা নায়ক তারা মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের প্রতিনিধি। জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের কম। শ্বেতাঙ্গ শাসকরা চলে গেছে। তাদের স্থান নিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ শাসকরা। শ্বেতাঙ্গের মতই সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে তারা। জনগণ উপেক্ষিত। স্বাধীনতার পর তাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। লাইবেরিয়ার বিরাট বিরাট রবারের বাগিচা মার্কিন পুঁজিপতিদের হাতে। নাম মাত্র দামে কিনেছিল তারা জমি। চুক্তি অনুযায়ী লাইবেরিয়ার সরকার

শ্রমিক সরবরাহে বাধ্য। দীর্ঘদিন ধরে চলছে সেখানে ক্রীতদাস প্রথা। অসহায় নরনারী পেটের দায়ে এবং সরকারী জুলুমে দলে দলে ভিড় করে মার্কিন বাগিচায়। একবার ঢুকলে বেরুবার পথ থাকে না। আজীবন চলে ক্রীতদাসত্ব। বিংশ শতাব্দীতেও এ প্রথার অবসান ঘটেনি সেখানে। স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা তাদের কাছে সমান। যেসব দেশের জনসাধারণ সভ্য জীবন যাত্রার উপাদান থেকে বঞ্চিত সে-সব দেশে রাজনৈতিক অগ্রগতি বিলম্বিত হতে বাধ্য। মোনরোভা জোটের অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক প্রবাহ গতানুগতিক। মাথাভারী প্রশাসন ব্যবস্থা। জনসাধারণ নিস্পৃহ। খণ্ডজাতীয় কিম্বা আঞ্চলিক বিরোধের সময় কেবল তারা সক্রিয়। আত্মসর্বস্ব নেতারা তাতেই খুশী। ভোটের সময় তারা যান গ্রামাঞ্চলে। প্রতিশ্রুতির পাহাড় জমে ওঠে। তারপর সব ঠাণ্ডা। নেতাদের দেখা মেলে না।

দৃষ্টি ভঙ্গীর পার্থক্য থাকা সত্বেও একটা বিষয়ে আফ্রিকান নেতাদের মধ্যে আছে ঐক্যমত। তারা শ্বেতাঙ্গের মর্যাদা পান না। ইউরোপে বর্ণবৈষম্যের শিকার কৃষ্ণাঙ্গরা। জমু কেনিয়াত্তার মত নেতাকেও প্রহার করতে বৃটিশ ফ্যাসিস্তরা দ্বিধাবোধ করে না। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে লণ্ডন গিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট জমু কেনিয়াত্তা। আবাস নিয়েছিলেন হাইড পার্কের অদূরে হিলটন হোটেলে। সেখানে তাঁকে কিল ঘুষি মেরেছিল জনাকয় শ্বেতাঙ্গ দুর্বৃত্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা বর্ণ-বৈষম্যের বলি। পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোতে চলছে কৃষ্ণাঙ্গর উপর শ্বেতাঙ্গ বর্বরতা। পশ্চিমী ঘেষা কালো সাহেবদের ভাগ্যেও জোটে না ইউরোপে তাদের পদাধিকারের উপযুক্ত মর্যাদা। শ্বেতাঙ্গের জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রবণতা সারা আফ্রিকায়। রাজনৈতিক দলাদলি, খণ্ড জাতীয় মারামারি এবং

আঞ্চলিক স্বার্থবোধের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের অন্তর্ভুক্ত। শ্বেতাঙ্গের বর্ণবিদ্বেষ এবং তাদের প্রভুত্বের মনোভাব আফ্রিকাকে করছে সংঘবদ্ধ। এই আবেগকে কাজে লাগাতে উৎসুক কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী। এদের উদ্যোগেই ১৯৪৪ সালে আদ্দিস আবাবায় বসল আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলন। মোনরোভা জোটের শরিকেরাও করল সহযোগিতা। জন্ম নিল আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা। তৈরী হল স্থায়ী দপ্তর।

নাসের বয়সে নবীন, কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। গত ক'বছর ধরে আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক টানা পোড়েন চলছে তাঁর চোখের সামনে। বিরাট জনপ্রিয়তা নিয়েও তার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তিনি। ঝট্‌পট্ গড়ে উঠেছিল মিশর-সিরিয়া ইয়েমেন ফেডারেশন। তা ভেঙ্গে যেতেও দেরী হয়নি। আফ্রিকার সমস্যা জটিল। বিলম্বিত পথ পরিক্রমা ভিন্ন এ মহাদেশের রাজনৈতিক ঐক্য এবং সাংবিধানিক ফেডারেশন গঠন সম্ভব নয়। ১৯৪৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হল আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সম্মেলন। ঘানার নক্রুমা অপেক্ষা করতে রাজী নন। তিনি চান অবিলম্বে গোটা আফ্রিকার সাংবিধানিক ঐক্য। নাসের বাধা দিলেন না তাঁকে। আফ্রিকার আন্দোলনে তিনি সহযোগী, আর আরবের ঐক্য চেতনায় তিনি নেতা। নাসেরের দৃষ্টিভঙ্গী সংগঠনমুখী। দলে দলে নিগ্রো ছাত্রেরা আসত মিশরে। সেখানে তারা পেত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা এবং সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেরণা। দেশে ফিরে তারাই প্রচার করত নাসেরের ধ্যান ধারণা। অনেক ক্ষেত্রে মতের অমিল থাকলেও নাসের ঘানার নক্রুমা এবং গিনির সেকো তোরের অভিন্ন সুহৃদ। ওরা প্রগতিবাদী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সমাজতান্ত্রিক। তাঁর বিশ্বাস—জনমানসে আফ্রিকান ঐক্যবোধের প্রবাহ আনবে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা।

আফ্রিকার ঐক্য সংস্থার কায়রো সম্মেলনে ধরা পড়ল নিগ্রো এবং আরব নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। ইস্রাইলী সমস্যায় তাঁরা একাত্ম হতে পারলেন না। আরবদের কাছে, বিশেষ করে নাসেরের সামনে ইস্রাইল জ্বলন্ত বিভীষিকা। পশ্চিমের কৃপাপুষ্ট এ বাধা আরবের সমাজ জীবনে এনেছে নিদারুণ দুর্দশা। হাজার হাজার আরব নরনারী গৃহহারা। অবিরাম সীমান্ত সংঘর্ষে মিশর ব্যতিব্যস্ত। তার আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রতি পদে পদে ব্যাহত। অস্ত্রসজ্জায় খরচ হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। পশ্চিম এশিয়ার তৈলস্বার্থ প্রধানতঃ বৃটেন এবং আমেরিকার হাতে। ইস্রাইলকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের দরকার। তা না হলে মিশরের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সবাইকে ছাপিয়ে উঠবে। তার জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার চাপে পশ্চিমী তৈলস্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়বে। আফ্রিকার নিগ্রো নেতাদের অন্তর্দাহ আরবের মত এত তীব্র নয়। ইস্রাইলের সঙ্গে চলছে না তাদের জীবন মরণ সংগ্রাম। অনেক নিগ্রো রাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক। ইস্রাইলের কারিগরী শিক্ষা উন্নত। আর্থিক সামর্থ্য বেশী। নিগ্রো রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্যদানে সে উদার। নাসেরের সামর্থ সীমিত। তাঁর বিপ্লবী আদর্শে রক্ষণশীল নিগ্রো রাষ্ট্রগুলো আতঙ্কিত। ইস্রাইলী বিরোধিতায় আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে তারা কুণ্ঠিত। ব্যতিক্রম শুধু নক্রুমা এবং সেকো তোরে। তাঁরা বুঝতে পারেন নাসেরকে। অন্যেরা শুধু দূর থেকে নমস্কার জানান। ক্ষোভ নেই নাসেরের। তিনি বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে অভ্যস্ত। প্রতিদান পাওয়া না গেলেও তিনি নিগ্রোদের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যদানে সদা প্রস্তুত। দক্ষিণ অফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন এবং পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গের লড়াইএ তাঁর সক্রিয় অবদান সবার চেয়ে বেশী। বিপ্লবীদের জন্য তিনি পাঠাচ্ছিলেন

অস্ত্র। নক্রুমা করছিলেন সেগুলো বিলি বণ্টন। শ্বেতাঙ্গের বন্ধন থেকে কৃষ্ণাঙ্গের মুক্তি আন্দোলন জোরদার করার জন্য আদ্দিস আবাবায় গঠিত হয়েছিল মুক্তি কমিটি। নাসের ছিলেন তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই সংস্থায় তাঁর আথিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল সবার উপরে।

কায়রো সম্মেলন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই টনক নড়েছিল পশ্চিমের। বৃটিশ এবং ফরাসী পত্রিকাগুলো নিগ্রোদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল বিগতদিনের আরবদের ক্রীতদাস ব্যবসা। নিগ্রো এবং আরবদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির প্রয়াসে তারা নেমেছিলেন আসরে। ক্রীতদাসের ব্যবসায় ইউরোপীয়রাও কম যায়নি। একথা বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি শ্বেতাঙ্গ প্রচারক দল। ব্যর্থ হয়েছিল তাদের কসরত। নাসের প্রমাণ করেছিলেন, অতীত ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে বর্তমান। সেখানে নিগ্রো-আরব সমধর্মী। নিগ্রো নেতারা ঘুরে দেখেছিলেন গোটা মিশর। শত বাধা বিপত্তির মধ্যে তার অগ্রগতি থেমে যায়নি। চমক লেগেছিল তাদের মনে। আসোয়ান বাঁধ পেয়েছিল অকুণ্ঠ প্রশংসা। নাসেরের একদলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির কার্যকরিতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল না কারও। আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক দলাদলিতে ক্ষত বিক্ষত। লুমুম্বার পরিণাম মাত্র সেদিনের ঘটনা। নক্রুমা অনেক আগেই চালু করেছিলেন এক দলীয় পদ্ধতি। জমু কেনিয়াত্তা কেনিয়ায় পা দিয়েই বললেন—নাসেরের একদলীয় পদ্ধতি নেবে কেনিয়া। অন্যান্য দলের অস্তিত্ব থাকবে না। একদলের মাধ্যমেই গড়ে উঠবে আন্তর্দলীয় সংহতি। এই ভাবধারার জোয়ার লেগেছিল আফ্রিকায়।

নীলনদের বহু জল ঘোলা করেছে পশ্চিম ইউরোপ। পরে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আমেরিকা। নরমে গরমে পরিচালিত

হয়ে থাকে মার্কিন পশ্চিম এশীয় নীতি। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ লড়াইএর পর মিশরীয় জনসাধারণ বন্ধু হিসাবে দেখত আমেরিকাকে। তাদের আন্তরিকতা কাজে লাগাতে পারলেন না মার্কিন কর্তৃপক্ষ। বৃটিশ এবং ফরাসীর যৌথ অর্থনৈতিক অবরোধের প্রাচীর উঠেছিল মিশরের চারদিকে। আমেরিকা হাত মেলাল তাদের সঙ্গে। ঠাণ্ডা লড়াই ঢুকল আরব দুনিয়ায়। বাঁচার তাগিদে নাসের ঝুঁকে পড়লেন পূর্ব ইউরোপের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল নাসের কমিউনিস্ট। মিশরে তৈরী হচ্ছে কমিউনিস্ট ঘাঁটি। নাসেরবিরোধী শক্তিগুলো আবার মাথা তুলল। তাদের মদত দিতে লাগল ফ্রান্স, বৃটেন এবং আমেরিকা। সুযোগ সন্ধানী পশ্চিম জার্মানীর ব্যবসায়ীরা অনুপ্রবেশ করল মিশরের বাজারে। পূর্ব ইউরোপ দাঁড়াল এসে নাসেরের পাশে। প্রগতিবাদী আরব তরুণেরা মার্কিন পণ্য বর্জনের হুমকী দিতে লাগল। তৈলের রয়েলটি বাড়াবার দাবী উঠল চারদিকে। তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথাও ভাবতে লাগল অনেকে। হঠাৎ আবিষ্কার করল আমেরিকা—নাসের কমিউনিস্ট নন। তিনি জাতীয়তাবাদী। পশ্চিম এশিয়ায কমিউনিস্ট প্রসার রোধের শক্ত ঘাঁটি মিশর। কেনেডি হলেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। নাসেরকে বুঝতে পারতেন তিনি। মিশর পেল অকৃপণ মার্কিন সাহায্য। অসময়ে তাঁর মৃত্যু না হলে হয়ত মার্কিন-মিশরীয় সম্পর্কের অবনতি ঘটত না। প্রেসিডেণ্ট জনসন অদূরদর্শী। মার্কিনী ইহুদীদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত। তাঁর আমলে আমেরিকা ধরল উল্টো পথ। সাহায্যের মাধ্যমে নাসেরের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে চাইলেন কায়রোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

ঘটনাটি সামান্য। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী। কঙ্গোর ঘটনার পর আঠার মাস স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন শোম্বে। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্পেন তাঁকে দিয়েছিল আশ্রয়। তিনি ফিরে

গেছেন কঙ্গোতে। নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর গদী। শহীদ লুমুম্বার শক্ত ঘাঁটি স্ট্যানলীভিল করেছে বিদ্রোহ। নাসের দিচ্ছেন বিদ্রোহীদের অস্ত্র সাহায্য। আর আমেরিকা নামিয়েছে সেখানে বেলজিয়ান ছত্রীসৈন্য। মিশর পাচ্ছে পি এল চারশ' আশীর ঋণ। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভাবছেন, আমেরিকা কিনে ফেলেছে নাসেরের মাথা। তিনি কায়রোতে নবাগত। ভাল করে চিনতে পারেননি নাসেরকে। মিশরীয় সরবরাহ মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর হল কথা কাটাকাটি। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ। তাদের ধারণা পি এল চারশ' আশীর চাপে মিশরকে বাগে আনার চেষ্টা করছে আমেরিকা। ১৯৪৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পোর্ট সৈয়দে এক বিরাট জনসভায় নাসের দিলেন জনমতের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তিনি বললেন—মিশর স্ট্যানলীভিলের বিদ্রোহীদের সাহায্য দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত হয়ত তা পছন্দ করবেন না। মনের দুঃখ চেপে রাখা সম্ভব না হলে ভূমধ্যসাগরে তিনি ডুবে মরতে পারেন। তার জলে না কুলোলে লোহিত সাগরের নোনা জল তাঁর জন্য জমা থাকবে।

মার্কিন মুলুকে পড়ে গেল হুলুস্থূল। ইহুদী সম্প্রদায় সক্রিয়। প্রতিনিধিসভা মিশরে মার্কিন সাহায্য বন্ধের সুপারিশ করল। নাসের অচঞ্চল। আদর্শের বিনিময়ে তিনি আমেরিকার সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় রাজী নন। তাতে যদি মিশর অর্ধাশনেও থাকে তাও ভাল। প্রেসিডেণ্ট জনসন এবং তাঁর পররাষ্ট্র দপ্তর প্রমাদ গণলেন। তাদের পশ্চিম এশীয় নীতি ব্যর্থ হতে চলেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব সেখানে জোরদার হয়ে উঠবে। যেসব দেশ মার্কিন সাহায্য পায় সেসব দেশের জনগণের মধ্যে দেখা দেবে আমেরিকা বিরোধী প্রতিক্রিয়া। প্রত্যাহৃত হল প্রতিনিধি সভার সুপারিশ। মিশরে মার্কিন সাহায্য অব্যাহত রইল। জাতি হিসাবে বৃটিশ দাম্ভিক। মার খেয়ে মার হজম

করতে ওস্তাদ। পশ্চিম এশিয়ার বাজার হাতছাড়া। সেখানে ঢুকেছে পশ্চিম জার্মানী। আরব দুনিয়ায় বৃটিশ মোটর গাড়ীর চাহিদা গেছে কমে। বড় বড় মার্কিন গাড়ী চলছে সেখানে। মিশরে দোকান সাজাতে চায় বৃটিশ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু নাসেরকে তোয়াজ করতে সরম লাগে। এডেন সমস্যা গলার কাঁটা। এ কাঁটা না তোলা পর্যন্ত এগুনো যাবে না। ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে রাজতন্ত্রীরা পাচ্ছে বৃটিশ সাহায্য। নাসেরের মন বিরক্তিতে ভরা। বৃটিশ পত্রিকাগুলো নাছোড়বান্দা। কেচ্ছা প্রকাশে তাদের জুড়ি নেই। তারা প্রচার করছেন, ইংরাজ চলে যাবার পর মিশরের সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটেছে বিপর্যয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার গেছে কমে। ইংরাজী শব্দের সঠিক উচ্চারণ এখন ওরা করতে পারে না। খাবার টেবিলে কাঁটা চামচ ধরতেও অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। নাসের নিজে অনুতপ্ত। কিন্তু বিদ্রূপের ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করতে পারছেন না। বৃটেনের উচিত, মিশরকে অভয় দেওয়া। অভয় দেবার জন্য ১৯৫৫ সালে কায়রো সফর করতে চেয়েছিলেন একজন বৃটিশ মন্ত্রী। নাসের সরাসরি বাতিল করেছিলেন তাঁর প্রস্তাব। এডেন সমস্যার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তিনি বৃটেনের সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় রাজী নন।

সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে মিশর কৃতজ্ঞ। ১৯৫৫ সালের আগে এশিয়ার এই দুর্বল রাষ্ট্রটি ছিল বকেয়া বৃটিশ অস্ত্রের পিঁজরেপোল। আধুনিক অস্ত্র তার ভাগ্যে জুটত না। প্রতিবেশী ইস্রাইল। তার মোকাবিলার জন্য অস্ত্র ভিক্ষায় সে ধর্ণা দিয়েছিল বৃটেন এবং আমেরিকার দরজায়। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল মিশর। সঙ্কট মুহূর্তে সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপ দিয়েছিল তাকে অস্ত্র। পশ্চিম ইউরোপের একচেটিয়া অস্ত্র ব্যবসা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন নাসের। তাঁর পররাষ্ট্র নীতি ধরেছিল স্বতন্ত্র পথ। পশ্চিম ইউরোপকে তোয়াক্কা করার কোন দরকার

ছিল না। সুয়েজ লড়াইএর পর পশ্চিমীরা করল তাঁকে অর্থ নৈতিক বয়কট। সব সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। এগিয়ে এল সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপ। তারা কিনতে লাগল মিশরীয় তুলো। রক্ষা পেল লক্ষ লক্ষ চাষী। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর আনুকুল্যে চলল শিল্পায়ন। আসোয়ান বাঁধের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ করল সোভিয়েট রাশিয়া।

১৯৫৫ সালের মে মাসে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ এলেন মিশর সফরে। তিনি ঘোষণা করলেন, আরও দশ কোটি পাউণ্ড (মিশরীয়) ঋণ মিশরকে দেবে সোভিয়েট রাশিয়া। দু'লক্ষ একর মরুভূমির জমিতে সেচের ব্যবস্থা করবে সে। সোভিয়েট রাশিয়ার সহানুভূতি মনে রেখেছিলেন নাসের। পশ্চিম ইউরোপ তাঁকে গলা টিপে মারতে চেয়েছিল। তাদের হাত সরিয়ে নিয়েছেন ক্রুশ্চভ। আসোয়ান বাঁধের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আবেগ ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, ক্রুশ্চভ এবং সোভিয়েট জনসাধারণ মিশরের দুর্দিনে যে সাহায্য তাকে দিয়েছেন জনগণ কোন অবস্থাতেই তা ভুলবেন না। নাসেরের এই ঘোষণার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। জনগণের আন্তরিকতায় ক্রুশ্চভ নিজে অভিভুত। ষোল দিন তিনি কাটিয়েছিলেন মিশরে। কাছে থেকে দেখেছিলেন নাসেরকে। বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর মতবাদ। ক্রুশ্চভ ভাবতেন, মিশরের জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়। এ পর্যায় শেষ হতে চলেছে। দ্বিতীয় পর্যায় হয়ত শীগ্রই সুরু হবে। আরব দুনিয়ায় শক্তিশালী কোন কনিউনিস্ট পার্টি. নেই। যারা ছিল তারা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ইরাকে কাসেমের পতন এবং বাথ পার্টির অভ্যুত্থান, সিরিয়ায় আরেফের ক্ষমতা গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতা ধরা পড়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়া গোড়া তাত্ত্বিক পথ ছেড়ে ধরেছিল বাস্তব পথ। নাসেরের প্রভাব জনগণের মধ্যে

সুপ্রতিষ্ঠিত। কমিউনিজমের ভয় তাঁর নেই। সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে তিনি ঢেলে সাজাচ্ছেন অর্থনৈতিক কাঠামো। জেল থেকে মুক্তি দিচ্ছেন কমিউনিস্ট নেতাদের। তাদের টেনে নিচ্ছেন নিজের আওতায়। ক্রুশ্চভ যখন মিশরে এসেছিলেন তখন সব কমিউনিস্টই মুক্ত। কারাগারে আটক ছিলেন না কেউ। জাতীয়তাবাদ এবং কমিউনিজমের মৌল পার্থক্য নাসের-ক্রুশ্চভ সৌহার্দ্যে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এই ছু'নেতার মনের মিলও ছিল অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট। মিশর এবং সোভিয়েট রাশিয়া সমভাবেই সাম্রাজ্যবাদ ও নব সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। পররাষ্ট্র থেকে সামরিক ঘাঁটি অপসারণের দাবী উভয়ের। পশ্চিম এশিয়ায় ইউরোপীয় কায়েমী স্বার্থের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন নাসের। তিনি এনেছিলেন প্রগতিবাদের বন্যা। পশ্চিমী স্বার্থের সঙ্গে আরব রক্ষণশীলদের স্বার্থ একসূত্রে বাধা। নাসের তাদের আতঙ্ক। কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এলে প্রথম পর্যায়ে তারা যা করত তার অনেকখানিই করে ফেলেছিলেন নাসের।

বৃটেন এবং ফ্রান্সের অভিযোগ—নাসেরের পররাষ্ট্রনীতি সোভিয়েট-ঘেষা। এ ধারণা কমবেশী আমেরিকার মনেও ছিল। রক্ষণশীলতার বড় শত্রু প্রগতিবাদ। পশ্চিম ইউরোপ কায়েমী স্বার্থের জিম্মাদার। তারা দীর্ঘদিন শাসন এবং শোষণ করেছে পশ্চিম এশিয়া। এখনও স্থানীয় সামন্ততন্ত্রীদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের গাঁটছড়া বাধা। সেখানে আঘাত এলেই পশ্চিমের দেহে ছড়িয়ে পড়ে ব্যথা। পশ্চিম ইউরোপের মত সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্য ফেলে রেখে যায়নি সোভিয়েট রাশিয়া। জনসাধারণ তাকে দেখেছে সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে। আর ফ্রান্স এবং বৃটেনকে শোষক হিসাবে। এ অবস্থায় নাসেরের পররাষ্ট্রনীতি পূর্ব ইউরোপঘেষা হতে বাধ্য। তাতে জোটনিরপেক্ষতার অপহ্নব হয়নি।

অনন্যসাধারণ নেতা ক্রুশ্চভ। দূরের মানুষকে তিনি আপন

করতে পারতেন সহজে। মিশরের জনতার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে মিশেছিলেন। আরব উদ্বাস্তুদের মর্মব্যথা অনুভব করেছিলেন নিজের অন্তরে। ধিক্কার দিয়েছিলেন ইস্রাইলকে। আর এই ইস্রাইলেরই মদতদাতা পশ্চিমী জোট। সোভিয়েট রাশিয়াকে নিকটবন্ধু ভাবা মিশরীয় জনসাধারণের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। নাসেরের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিকটসম্পর্ক। ক্ষমতা থেকে ক্রুশ্চভের আকস্মিক পতনে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন নাসের। সোভিয়েট সাহায্য তাঁর দরকার। নূতন সোভিয়েট শাসকরা কি নীতি নেবেন সে—সম্পর্কে মনে ছিল সংশয়। ফিল্ড মার্শাল আমেরকে তিনি পাঠালেন মস্কোতে। ফিরে এসে আমের জানালেন—সোভিয়েট নেতারা কথার খেলাপ করবেন না। মিশরে তাদের সাহায্য অব্যাহত থাকবে। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট উপপ্রধানমন্ত্রী আলেকজাণ্ডার শেলেপিন এলেন কায়রোতে। নূতন করে তিনি দিয়ে গেলেন সোভিয়েট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। আশ্বস্থ হলেন নাসের।

ফ্যাসাদ বাধাল পশ্চিম জার্মানী। তার সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠছিল। সাংস্কৃতিক আদান প্রদান চলছিল তাদের মধ্যে। জার্মান বিজ্ঞানীরা কাজ করছিলেন মিশরে। বাজারে জার্মান পণ্যের ঘাটতি ছিল না। ১৯৫৫ সালে হঠাৎ একদিন খবর বেরুল গোপনে পশ্চিম জার্মানী অস্ত্র সরবরাহ করছে ইস্রাইলে। আরবদের মধ্যে দেখা দিল চাঞ্চল্য। নাসের প্রতারিত। বন সরকার অপরাধী। তাঁরা বললেন—আমেরিকার গোপন নির্দেশে জার্মান অস্ত্র যাচ্ছিল ইস্রাইলে। ভবিষ্যতে এমন কাজ আর পশ্চিম জার্মানী করবে না। তাঁদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন নাসের। তিনি প্রতিশোধ নিলেন। পূর্ব জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট ওয়াল্টার উলব্রিক্‌টকে মিশরে আমন্ত্রণ করলেন তিনি। তাঁকে দিলেন রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা। চটে গিয়ে ইস্রাইলকে কূটনৈতিক

স্বীকৃতি দিল পশ্চিম জার্মানী। নাসের তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। টিউনিসিয়া, মরোক্কো এবং লিবিয়া বাদে আর সব আরব রাষ্ট্র বর্জন করল পশ্চিম জার্মানীকে। তার সঙ্গে রইল না তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক। টাকার জোরে এতদিন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে চোখ রাঙাচ্ছিল পশ্চিম জার্মানী। যারা পূর্ব জার্মানীকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবে তারা পাবে না জার্মান সাহায্য। বন সরকার অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন এই নীতি। নাসের দিলেন তাদের প্রচণ্ড মার। তিনিই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে। আরব রাষ্ট্রগুলো তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল। ছেঁড়া সুতো জোড়া দেবার জন্য জার্মান কূটনীতি-বিদ্‌রা ঘুরতে লাগলেন মিশরের দরজায়। ব্যবসা মাটি হতে বসেছে। তার পুনরুদ্ধার চাই। আরব জনতা অনেকদিন পর নবরূপে দেখল নাসেরকে। তিনি বিপ্লবী এবং গোটা আরবের নেতা। জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার হিম্মত রাখেন একমাত্র তিনি। আবার তাদের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল—যুগ যুগ জীও নাসের।

ছাব্বিশ

নবজন্ম লাভের প্রথম লগ্নে মিশর তাকিয়েছিল ভারতের দিকে। বৃটিশ-বন্ধনমুক্ত এই দেশ দিয়েছিল তাকে প্রেরণা। মহাত্মা গান্ধীর নাম জানত সবাই। তাঁর রাজনীতি ধর্মের সঙ্গে বাধা। ধর্মকে রাজনীতি থেকে তফাতে রেখেছিলেন নাসের। ঐশ্লামিক রাষ্ট্র মিশর। কিন্তু কার্যকলাপে সে ধর্ম নিরপেক্ষ। তার আন্তর্জাতিক ধারণা ভারতের কাছ থেকে নেওয়া। যাঁরা নাসেরকে দুনিয়ার সামনে প্রথম টেনে এনেছিলেন নেহরু তাঁদের অন্যতম। বান্দুংএ নাসের পেয়েছিলেন

আত্মবিশ্বাস। আন্তরিকতা তাঁর চরিত্রের প্রধান সম্পদ। সাম্রাজ্য-বাদের ঘোরতর শত্রু তিনি।* এর উচ্ছেদে নেহেরুর চেয়ে নাসের বেশী সক্রিয়। অহিংসার ধার ধারতেন না তিনি। যেখানেই চলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই সেখানেই তিনি ঝাপিয়ে পড়তেন। বিদ্রোহীদের অস্ত্র সাহায্য দিতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোর মুক্তি যোদ্ধাদের অর্থ এবং অস্ত্র দিতে তিনি ভুল করেন নি। জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির প্রাণদাতা নেহরু। পরবর্ত্তীকালে তার আশ্রয়দাতা নাসের এবং টিটো। ১৯৫৬ সালে সুয়েজের লড়াইএর সময় ভারতের অবদান ভোলেনি মিশর। ভারত তার নিকট, আর ঐশ্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান ছিল বহু দূরে। গোয়ায় পুলিশ অভিযানের সময় পাকিস্তানী রাষ্ট্র নায়করা ভারতের বিরূপ সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। বৃটেনের সবচেয়ে পুরনো বন্ধু পর্তুগাল। ভারতে পর্তুগীজদের দুর্দ্দশায় বৃটিশ পত্রিকাগুলো পাগল। ওরা নেহরুর মুণ্ডপাত করছিলেন। নাসের বলেছিলেন—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া নেই। সুয়েজখালে একটি পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজও ঢুকতে দেওয়া হবে না। ১৯৫৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ইসলাম বিপন্নের ধূয়া তুলেছিলেন আয়ুব খান। জর্ডন, সৌদী আরব, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্র সংঘবদ্ধ হচ্ছিল ভারতের বিরুদ্ধে। মিশর অচঞ্চল। নাসের জানতেন, তাকে বাদ দিয়ে এ্যাডভেঞ্চারের সাহস কোন আরব রাষ্ট্রের নেই। জনতা রুখে দাঁড়াবে। আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জনাকয় উৎসাহী পাক-ভারত লড়াই প্রসঙ্গ তুলতে চেয়েছিল আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনে। নাসের তাদের বাধা দিয়ে বলেছিলেন—কাশ্মীর আফ্রিকায় নয়। তাঁর সামনে ছিল তিনটি ভাবধারা—আরব ঐক্য, আফ্রিকান ঐক্য এবং ইসলাম। নাসেরের কাছে ইসলাম ব্যক্তিগত ধর্মবোধ। ধর্মের ভিত্তিতে ঐশ্লামিক রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সাম্প্রতিক-

কালের ঐতিহাসিক নজির তার জ্বলন্ত সাক্ষী। ভারতের বিরুদ্ধে ঐশ্লামিক জোট বাধার চেষ্টা বারবার করেছে পাকিস্তান। পেয়েছে সে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন। পশ্চিমী কায়েমী স্বার্থবাদীরা দিয়েছে আশীর্বাদ। ধর্মের গোড়ামী যত বাড়বে সমাজতান্ত্রিক অভিযানের তীব্রতা তত কমবে। নাসের জানতেন এই সত্য। মিশরকে দূরে রেখেছিলেন তিনি ধর্মীয় জোট থেকে। ইসলামী জোট শুধুমাত্র ভারতেরই শত্রু নয়, বিপ্লবী মিশরেরও জাতবৈরী। যতদিন মিশর প্রগতিবাদের আদর্শে অটুট থাকবে ততদিন ঐশ্লামিক জোট ভারতের ক্ষতি করতে পারবে না। মুসলিম দুনিয়ায় ধর্ম নিরপক্ষতার অতন্ত্র প্রহরী মিশর। নাসের তার স্রষ্টা।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর দশ বারো বছরে বহু বাধা বিপত্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন নাসের। আরব জগতে চলেছে অবিরাম ভাঙ্গাগড়া। আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপ পাল্টিয়েছে। মার্কিন সোভিয়েটের ঠাণ্ডা লড়াইএর তীব্রতা কমেছে। সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নশীল জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর আদর আপ্যায়নের জোয়ারে ভাটা পড়েছে। পারস্পারিক সম্পর্কের নব মূল্যায়ণ ঘটছে। এশিয়ায় জেগে উঠেছে কমিউনিস্ট চীন। আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার দিকে তার হাত প্রসারিত। সেও চায় বিপ্লব। জাতীয়তাবাদী নেতাদের উচ্ছেদ তার বিপ্লবের লক্ষ্য। আফ্রিকায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ, রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ফ্যাসিস্ত শাসন এবং উন্নয়নশীল নরমপন্থী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগমনের মন্থরতা জনসাধারণের মনে আনছে বিক্ষোভ। এই রন্ধ্রপথে ঢুকছে চীনেরভাবধারা। গোটা দুনিয়া এখন মোটামোটি তিনভাগে বিভক্ত—মার্কিন গোষ্ঠী, সোভিয়েট গোষ্ঠী এবং চীন। জোট নিরপেক্ষদের কোন জোট নেই। তারা ভূপরিক্রমার পারস্পারিক সঙ্গী মাত্র। বিপদের দিনে এরা পরস্পরের হাত ধরে, আবার বিপদ কেটে গেলেই যে যার পথ বেছে নেয়। এই পরিবর্তনের

মধ্যে ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে কায়রোতে বসেছিল ৪৬টি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সম্মেলন। আগের জুলুস তাদের নেই। আন্তর্জাতিক সমস্যায় বিশ্লেষণেও এদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অতি স্পষ্ট। ভারতের কাছে চীন এবং পাকিস্তান একটা বিরাট সমস্যা। এরা আগ্রাসী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রবল বাধা। প্রতি বছর প্রচুর অর্থ খরচ করছে ভারত তার অস্ত্রসজ্জায়। দু'সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে সৈন্যদল। সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চলছে অবিরাম প্রস্তুতি। যদি সীমান্ত বিরোধ না থাকত তবে অস্ত্রসজ্জার অর্থের এক বিরাট অংশ ব্যবহৃত হতে পারত জাতীয় উন্নয়নে। কিন্তু অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো থেকে চীন এবং পাকিস্তান বহুদূরে। এদুটি দেশ সম্পর্কে ভারতের মত তীব্র অনুভূতি তাদের সেই। অপর দিকে ইস্রাইল গোটা আরবের দুষমন। মিশর দুবার তার হাতে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। ভবিষ্যতে যদি লড়াই বাধে তবে মিশরের উপরই আসবে প্রথম আঘাত। নাসেরের উৎকণ্ঠার ভাগীদার নয় অনেক জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বাস্তব স্বীকার না করে উপায় নেই। নাসের তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

আদর্শভিত্তিক আরব ঐক্য গড়ে উঠতে সময় লাগবে। ইস্রাইলী বিরোধিতার মধ্যে যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা চলছে তা নেতিবাচক। ভিতরে ভিতরে অনৈক্য প্রবল। এতদিন ছিল দুটি মাত্র রাজনৈতিক বিভাগ। একটি পশ্চিমী সমর্থনপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং অপরটি প্রগতিবাদী। দ্বিতীয় ধারার নায়ক নাসের। যুব শক্তি ছিল তাঁর অকৃত্রিম সমর্থক। এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তৃতীয় শক্তি। নিতে চাচ্ছে চরমপন্থা। চরমপন্থীদের প্রসার ঘটাচ্ছে ইস্রাইলের বৈরিতা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাসের। তাঁর দায়িত্ব সবার চেয়ে বেশী। যুদ্ধের ঝুঁকি সহজে নিতে তিনি রাজী নন। অন্য কোন আরব রাষ্ট্রকে গ্রাহ্য করে না ইস্রাইল। সামনে একমাত্র শক্তি মিশর। তাকে ঘায়েল করতে পারলেই আরববিজয় প্রায় সম্পূর্ণ।

চরমপন্থীরা নাসেরকে টানছে সংঘর্ষের পথে। প্রতিক্রিয়াশীলরা মজা দেখতে উৎসুক। নাসের চাচ্ছেন ইস্রাইল বিরোধী আরব রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়। তিনি জানতেন, দুদিন আগেই হোক, আর পরেই হোক ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন মিশরের নেতৃত্বে যৌথ আরব কম্যাণ্ড গঠন। পশ্চিমী শক্তিজোটের ইস্রাইলী নীতি তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। পশ্চিম এশিয়ায় তৈলস্বার্থ রক্ষার জন্য তারা এই রাষ্ট্রটিকে জীইয়ে রাখবে। তাকে শক্তিশালী করে তুলবে। গোটা আরবের সঙ্গে ক্ষুদ্র ইস্রাইলের শক্তিসাম্য বজায় রাখতে তারা সচেষ্ট থাকবে। বিশ লক্ষ ইস্রাইলী পশ্চিমের কাছ থেকে যে অস্ত্র পায় আরব রাষ্ট্রগুলোর পাঁচকোটি অধিবাসী তার বেশী অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে না। ইস্রাইলের যান্ত্রিক নিপুণতা আরবদের নেই। তুলনায় তারা দুর্বল। মিশরের ভরসা সোভিয়েট রাশিয়া। কমিউনিস্ট সাহায্য ছাড়া এক পা এগুবার ক্ষমতা তার নেই। আরবদের মধ্যে অনেকে আবার সোভিয়েট বিরোধী। অবস্থাটা এলোমেলো। টিউনিসিয়ার বারগুইবার বিপ্লবী আগুন নিভে গেছে। তিনি এখন পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে দহরম মহরমে ব্যস্ত। আলজেরিয়ার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে বারগুইবার মন কষাকষি। টিউনিস সৈন্য-বাহিনীতে নাসের সমর্থকরা প্রায় নিশ্চিহ্ন। বির্জাতা সঙ্কট অনেক আগেই কেটে গেছে। দক্ষিণাঞ্চলের আরব সমর্থনের তাঁর দরকার নেই। বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা পশ্চিমের নবালোক প্রাপ্ত বারগুইবার প্রধান সহযোগী। প্যালেস্টাইন বহুদূরে। ইস্রাইলের সঙ্গে বিবাদে তার অনিচ্ছা। তিনি চান আরব-ইস্রাইল শান্তি। ভরসা আলজেরিয়া। সঙ্কটের দিনে সে আসবেই।

মিশরীর জনতার উপর নাসেরের অগাধ আস্থা। তিনি তাদের জীবনের মূল্যবোধ ফিরিয়ে এনেছেন। জমিদার শ্রেণীকে প্রায়

নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন। কৃষকরা পাচ্ছে জমির অধিকার। আসোয়ান বাঁধ সৃষ্টি করেছে নূতন সম্ভাবনা। দ্রুত তালে হচ্ছে শিল্পের প্রসার। শিশু এবং কিশোর কিশোরীরা পাচ্ছে বিনা-বেতনে শিক্ষা। বাইরের কাজে হাত দিয়েছে মেয়েরা। স্কুল কলেজে তাদের ভীড় বাড়ছে। গণজীবনে শতাব্দীর মৃত্যু-স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়েছেন নাসের। তাঁর প্রগতির ধারা হয়ত মন্থর। তিনি নিজেও অখুশি। নাসের চান দ্রুত গতিবেগ। কিন্তু রক্তপাতে তাঁর অনীহা। মিশরের প্রগতি রক্তপাতহীন। তার সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য আরব দুনিয়ার প্রেরণা। আর ব্যর্থতা সম্ভাব্য আরব ঐক্যের ভিত্তির বিলোপ।

মিশরের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নাসের। মন দেওয়া কঠিন। অর্থনৈতিক অগ্রগমনের পথে পা বাড়লেই ইস্রাইলী সীমান্তে বেজে ওঠে রণদামামা। তাঁর সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য যেন ইস্রাইলের জন্ম। সবদিক গুছিয়ে নিচ্ছেন নাসের। সম্প্রতি শরীরটাও তার ভাল যাচ্ছিল না। ১৯৫৫ সাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অক্টোবর মাস চলছে। হঠাৎ খবর পেলেন আলজেরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। বেন বেলার খবর নেই। ক্ষমতা দখল করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্ণেল বুমেদিয়েন। অবাক হলেন নাসের। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রামের রক্তাক্ত ছবি। সাত বছর চলেছিলো প্রচণ্ড লড়াই। ফ্রন্ট লিবারেশন ন্যাশন্যালের (এফ এল এন) পতাকাতলে জড় হয়েছিল লক্ষ লক্ষ নরনারী। বিপ্লবীদের হাতে মরেছে প্রায় আঠার হাজার ফরাসী সৈন্য। আর ফরাসীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে দু'লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধা। এফ এল এন বিপ্লবীদলগুলোর যুক্তফ্রন্ট। বেন বেলা তার অন্যতম প্রধান নেতা। মিশরে নাসেরের আশ্রয়ে কাটিয়েছেন বহুদিন। আল-জেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করতেন তিনি। বারগুইবার মত স্মৃতিভ্রংশ ঘটেনি। ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইএর দিনে পরস্পরের হাত ধরে চলেছিলেন মরোক্কো, টিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতারা। মিশর ছিল তাদের অস্ত্র এবং অর্থের জোগানদার। স্বাধীনতার পর সব ওলট পালট হয়ে গেছে। অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের সঙ্গে ঘটছে বিচ্ছেদ। ব্যক্তিগত ক্ষমতার মোহ তাদের পেয়ে বসেছে। আদর্শ সংঘাতের আড়ালে নেতারা গোপন রাখছেন তাঁদের নিজস্ব স্বার্থবোধ। সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ আফ্রো-এশিয়ার সম্ভস্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর বিঘোষিত লক্ষ্য। নাসেরের ধারণা, ইস্রাইল পশ্চিমী সাম্রাজ্য-বাদীদের এশীয় ঘাঁটি। এর বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম। মরোক্কো এবং টিউনিসিয়া উদাসীন। লেবানন আত্মকেন্দ্রিক। আলজেরিয়ার নায়ক বেন বেলা অপসারিত। মনে হল, তাঁর বাহু যেন শিথিল হয়ে আসছে। আলজেরিয়ার নূতন নায়ক বুমেদিয়েন কি করবেন তা তাঁর জানা নেই। নাসেরের সন্দেহ বাড়ছে। এভিয়াঁ চুক্তির পর আলজেরিয়ার নরম এবং চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে চলছিল ক্ষমতার লড়াই। সাময়িক শাসন পরিচালনার সুযোগ নিয়ে চীফ অফ স্টাফ বুমেদিয়েনকে পদচ্যুত করেছিলেন চরমপন্থীরা। কায়রো থেকে মরোক্কোতে হাজির হলেন চরমপন্থী বেন বেলা। বুমেদিয়েনকে সঙ্গে নিয়ে মার্চ করলেন আলজেরিয়ার পথে। দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার তৈরী হল স্বাধীন আলজেরিয়ায়। রক্তপাতের সূত্রপাতেই থেমে গেল গৃহযুদ্ধ। বেন বেলা পেলেন ক্ষমতা। বুমেদিয়েন তাঁর ডান হাত। আজ এই বুমেদিয়েন করলেন বিদ্রোহ। রাজনীতিতে বিশ্বাসের স্থান নেই।

বেন বেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য আলজেরিয়ায় নিজস্ব দূত পাঠিয়েছিলেন নাসের। কোন খবর মেলেনি তাঁর। সামরিক অভ্যুত্থানের রাত্রিতে তিনচারজন সশস্ত্র সৈনিক ঢুকেছিল বেন বেলার কক্ষে। পর পর গোটা কয় গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল।

একজনকে কম্বল ঢাকা দিয়ে তোলা হয়েছিল গাড়ীতে। অনেকের ধারণা, ওটা ছিল বেন বেলার দেহ। আবার কারও কারও অভিমত, তিনি বন্দী। বুমেদিয়েন কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। নাসেরের দূত কায়রো ফিরে কি রিপোর্ট দিয়েছেন তাও জনসাধারণ জানে না। নাসেরের নীরবতা দেখে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, বেন বেলা নিহত। তিনি জীবিত থাকলে অবশ্যই তাঁর মুক্তির দাবী উঠত। আর সে দাবী অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

বুমেদিয়েন বয়সে নবীন। বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা তাঁরও কম নেই। ইচ্ছা থাকলেও আলজেরিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব ঘটানো মুস্কিল। সাত বছর মুক্তির লড়াই করেছে তারা। জনসাধারণ রাজনৈতিক সচেতন। বাঁকা পা দিলে জনতার বিচারদণ্ড নেমে আসবে নেতাদের উপর। মনে পড়ল আলজেরিয়ার একটি ঘটনার কথা। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাস। স্বাধীনতার পরমুহূর্তে চলেছে নেতাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। বেন বেলার বাহিনী এগিয়ে চলেছে। তাকে বাধা দিতে তৈরী হচ্ছে বেন কাসেম করিমের সৈন্যদল। ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের চরম মুহূর্ত আসন্ন। দুদল মুখোমুখি হলেই চলবে গোলাগুলি। তাদের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ছ'সাত মাইল। দূরদূরান্ত থেকে ধেয়ে এল হাজার হাজার নরনারী। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে উঠল মানুষের প্রাচীর। মাটিতে শুয়ে আছে জনতা। তারা রক্তপাত হতে দেবে না। বাঁচাবে বিপ্লব। অত্যাচারী ফরাসী শাসকরা দেশ ছেড়েছে। তাদের সম্পত্তি পড়ে আছে আলজেরিয়ায়। গৃহযুদ্ধের রন্ধ্রপথে আবার ফিরে আসবে তারা। সাত বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের ফসল কেড়ে নেবে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। ভ্রাতৃহনন নয়, আপোষ—জনতার দাবী। বিশ হাজার ট্রেডইউনিয়ন নেতা দিলেন চরমপত্র। নেতারা সিধে পথে না এলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সারা আলজেরিয়ায় চলবে হরতাল। বিবদমান নেতারা অসহায়।

দেশবাসীর শবের উপর দিয়ে চলতে পারে না যুদ্ধচক্র। প্রণাম জানালেন তাঁরা সত্যাগ্রহীদের। আলজেরিয়া রেহাই পেল গৃহযুদ্ধের সঙ্কট থেকে।

নাসের ভাবছেন আর একটি দিনের কথা। ১৯৫৫ সালের ২০ শে জানুয়ারী। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসেছে। নির্বাচিত হবেন মিশরের প্রেসিডেন্ট। ভোট দেবেন শুধু জাতীয় পরিষদের সদস্যরা। জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড উন্মাদনা। পায়ে হেঁটে, ট্রেনে এবং গাড়ীতে কাতারে কাতারে কায়রোতে চলেছে জনতা। স্কুল কলেজ, কারখানা, অফিস এবং আদালত সব শূন্য। সবাই ছুটছে কায়রোর পথে। তিন দিন ধরে চলছে মানুষের মিছিল। জাতীয় পরিষদ ভবনের চারদিক ঘিরে বসে রয়েছে অধীর নরানরী। সবার দাবী আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকবেন নাসের। সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ছ'বছর। সাধারণ মানুষ তা বুঝতে চায় না। কেবল আওয়াজ তোলেঃ আজীবন প্রেসিডেন্ট-নাসের। বিশে জানুয়ারী বেরুল ভোটের ফলাফল। নাসের ৩৫৫ ভোটে ছ'বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত। মোট ৩৬০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিলেন অনুপস্থিত। বিরুদ্ধে ভোট পড়েনি একটিও। গায়ের জোরে ঠেলে আনেননি তিনি সাধারণ মানুষগুলোকে কায়রোর রাস্তায়। তারা এসেছিল অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়। এই সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষই নাসেরের বন্ধু। তাদের দিয়েছেন তিনি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, আর প্রতিদানে পেয়েছেন অকুণ্ঠ আস্থা। মিশরের সম্ভাব্য বিপদে ওরাই প্রতিরক্ষার সুদৃঢ় প্রাচীর।

ব্যতিক্রম মুসলিম ব্রাদারহুড। মিশরে এ সংস্থা বেআইনী। কিন্তু তাদের গোপন তৎপরতা একেবারে থেমে যায়নি। ধনী এবং অভিজাত সম্প্রদায় মোল্লাতন্ত্রীদের সমর্থক। ওরা জোগায় তাদের টাকা। নাসের সবার আতঙ্ক। জমিদারদের তিনি খতম করেছেন। ১৯৫৫ সালের ডিক্রী প্রকৃতপক্ষে ছিল তাদের মৃত্যুবাণ। আইনের

ফাঁকি বার করতে এসব লোক ওস্তাদ। ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির উর্দ্ধসীমা একশ' একর।. অনেকে বেনামী জমি রেখেছিল নিজেদের হাতে। কর ফাঁকি চলছিল অবাধে। চাষীরা জানাচ্ছিল নালিশ। তদন্তে ধরা পড়ল সব। আবার চরম আঘাত হানার সঙ্কল্প নিলেন নাসের। সৌদী আরব এবং স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের যোগসাজসে প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্র আঁটল মুসলিম ব্রাদারহুড। চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেল। ধরা পড়ল ষড়যন্ত্রীরা। তিনজনের হল প্রাণদণ্ড। চক্রীদের মধ্যে একজন ছিল পাকিস্তানী। সে পালাল। এই ধর্মান্ধ কিছুদিন আত্মগোপন করেছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে ।পরে পাক-সরকারের সাহায্যে পাড়ি জমিয়েছিল সুইটজারল্যাণ্ডে।

আমেরিকার কাছে নাসের একটি সমস্যা। মার্কিন গম আসে মিশরে। কিন্তু মার্কিন তোয়াজ করেন না নাসের। হুমকী দিলে জোটে পাল্টা হুমকী। পশ্চিম এশিয়ায় তাদের তৈলস্বার্থের নিরাপত্তা এই লোকটির হাতে। তাঁর ইঙ্গিতে পাইপ লাইনগুলো যে কোন সময় উড়ে যেতে পারে। তাছাড়া মিশরীয় উপকূল দরিয়ায় পাওয়া গেছে তৈলের সন্ধান। সিনাই অঞ্চলের তৈল আহরণ চলছে। এ সময় নাসেরকে চটানও বিপদ। তাঁকে চটালে সঙ্গে সঙ্গে চটবে আফ্রো-এশিয়ার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো। কায়রোতে দপ্তর খুলল ভিয়েতকং। আমেরিকা আর সংযত থাকতে পারল না। কূটনৈতিক আলোড়ন দেখা দিল সর্বত্র। নাসের বুঝলেন, মার্কিন সরবরাহ বন্ধ হতে দেরী নেই। ক'মাস পরে সত্যিই বন্ধ হল মার্কিন গম। তার বদলে মিশরে আসতে লাগল সোভিয়েট গম। নূতন করে মস্কোর বন্ধুত্বের প্রমাণ পেলেন নাসের।

পাকিস্তান বাধতে চায় ঐশ্লামিক জোট। ইরান, তুরস্ক এবং সৌদী আরব তার সঙ্গী। পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ

করতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প। তুরস্ক, ইরান এবং সৌদী আরব নাসেরের প্রগতিবাদী আন্দোলনে ভীত। তাদের লক্ষ্য নাসেরকে কোনঠাসা করা। ঐশ্লামিক জোট তাই দরকার। বৃটেন এবং আমেরিকা ঐশ্লামিক জোটের সমর্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোই ভবিষ্যতে হবে তাদের স্বার্থের সতর্ক প্রহরী। নাসেরর উপর তুরস্কের উষ্মার আরও একটা কারণ ছিল। সাইপ্রাসে তুর্কী সিপ্রিয়টরা সংখ্যালঘু। গ্রীক সিপ্রিয়টরা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চালাচ্ছিল লড়াই। মরছিল তারা দলে দলে। অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছিল তারা। আর্চবিশপ মাকারিউস নির্বাসিত। গোটা সাইপ্রাসে জ্বলছে আগুন। তুর্কী সিপ্রিয়টরা সহযোগিতা করছিল বৃটিশের সঙ্গে। তারা চাচ্ছিল দেশ বিভাগ। তুরস্ক উস্কাচ্ছিল তাদের। পাকিস্তান সাইপ্রাসের তুর্কী সিপ্রিয়টদের সমর্থক। পিণ্ডির নায়করাও চাচ্ছিলেন সাইপ্রাস বিভাগ। নাসের অনড়। তিনি বললেন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ অন্যায়। আর্চবিশপ মাকারিউস জাতীয় নেতা। জাতীয়তাবাদী গ্রীক সিপ্রিয়টদের বন্ধু মিশর। ভয়ানক চটেছিল তুরস্ক। তার সঙ্গে লাফাচ্ছিল পাকিস্তান। সাইপ্রাস স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু গোলমাল মেটেনি। গ্রীক সিপ্রিয়ট এবং তুর্কী সিপ্রিয়টদের মধ্যে চলছে অসহযোগ। সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রায় অচল। রাজনীতিতে ধর্ম ঢুকাতে চায় প্রতিক্রিয়াশীলরা। তাদের দুরন্ত বাধা নাসের। মিশর ঐশ্লামিক রাষ্ট্র। কিন্তু তার কাছের বন্ধু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। ঐশ্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান বহু দূরে। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে নাসের এলেন ভারত সফরে। তিন দিন ছিলেন দিল্লীতে। দেখলেন ভারত-মিশর সৌহার্দ্যের নিদর্শন—জনগণের আন্তরিক প্রীতি। স্বাক্ষরিত হল মিশর-ভারত-যুগোশ্লাভিয়া মৈত্রী চুক্তি। আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগমনে তারা হবে পরস্পরের সহযোগী।

কায়রো ফিরেই নাসের বুঝতে পারলেন, ইস্রাইলী সীমান্তে

কালো মেঘ জমছে। তেল আবিব ক্রমেই মারমুখি হয়ে উঠছে। সীমান্ত সংঘর্ষ নূতন নয়। আরব গেরিলারা হানা দেয় ইস্রাইলী এলাকায়। ইস্রাইলীরা চালায় পাল্টা হানা। ছারখার হয় আরব জনপদ। ইস্রাইলী এলাকার আরবরা গেরিলাদের বন্ধু। কোন গেরিলাকে তারা আশ্রয় দিয়েছে—এ সন্দেহ হলেই ইহুদীরা ঝাঁপিয়ে পড়ত আরব পাড়ায়। মাটির সঙ্গে মিশে যেত গোটা পাড়া। উদ্বাস্তুদের ঝেটিয়ে সীমান্ত পার করে দিত তারা। জর্ডন সীমান্তে গেরিলাদের ঘাঁটি। এগুলো ধ্বংসের চেষ্টায় বিরাম ছিল না ইস্রাইলীদের। সিরিয়া এবং সিনাই সীমান্ত থেকে ও আরবরা ব্যতিব্যস্ত রাখত ইস্রাইলকে। প্যালিস্টাইনীরা অধীর। তাদের মাতৃভূমি ইস্রাইলী দখলে। নিজেরা মিশর, জর্ডন এবং সিরিয়ায় পরবাসী। ওদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা নেই। নাসের নিরুপায়। চরমপন্থীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ইস্রাইল বিরোধী জনমত প্রবল। ওদের ঠাণ্ডা রাখতে হলে হানাদারীতে মদত দেওয়া খুবই দরকার। দ্রুত তালে চলছে ইস্রাইলের অস্ত্রসজ্জা। আমেরিকা দিয়েছে তাকে বিভিন্ন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র। দু'শ জঙ্গী বিমান এবং আটশ'ট্যাঙ্ক হাতে পেয়েছে ইস্রাইল। জঙ্গীবিমানগুলোর অধিকাংশই ফরাসী মিরাজ এবং মিস্টারস। ট্যাঙ্কগুলোর প্রায় সবই সেঞ্চুরিয়ান। মিশরও আনছে সোভিয়েট জঙ্গীবিমান, ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। প্রায় ছ'মাস ধরে চলছে উভয় পক্ষের অস্ত্র সজ্জা। সিরিয়ার সঙ্গে নাসের সম্পাদন করলেন সামরিক চুক্তি (৪ঠা নভেম্বর, [redacted])। ১৩ই নভেম্বর ইস্রাইলী বাহিনী জর্ডন সীমান্তে দিল প্রচণ্ড হানা। ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ী ব্যবহার করল তারা। চার হাজার নরনারীর জনপদ সামু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। [redacted] সালের এপ্রিল মাসে সিরিয়া সীমান্তে চলল ইস্রাইলী ব্যাপক আক্রমণ। আকাশে সুরু হল বিমানের লড়াই। ইস্রাইলী চীফ অফ স্টাফ জেনারেল রবিন ঘোষণা করলেন,

ইস্রাইলী বাহিনী প্রয়োজন বোধে দামাস্কাসে হানা দেবে। আটাসী সরকার উচ্ছেদ করে তারা ফিরে আসবে। ইস্রাইলী প্রধানমন্ত্রী লেভী এস্কোল আরও কড়া হুশিয়ারী দিলেন। নাসের বুঝতে পারলেন—ঝড় আসন্ন। আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী সিদকী সোলেমনকে তিনি পাঠালেন দামস্কাসে। সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য লড়াই এড়াবার জন্য সুরু করলেন কূটনৈতিক তৎপরতা। আমেরিকা বলল, যুদ্ধ আরম্ভের কোন ইচ্ছা ইস্রাইলের নেই। সুয়েজের অপমান ভুলতে পারেনি বৃটেন। তার দাবী—সুয়েজ খালে ইস্রাইলী জাহাজের অবাধ গতির স্বাধীনতা চাই। আকাবা উপসাগরের উপর মিশরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হবে না। পশ্চিম এশিয়ায় বারুদের স্তূপ তৈরী। সবার মনে প্রশ্ন—কে প্রথম তাতে দেবে আগুনের পরশ।

সাতাশ

১৯৫৬ সালে সুয়েজ-লড়াইএর পর সিনাই সীমান্তে (মিশরীয় এলাকায়) মোতায়েন ছিল রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী। আকাবা প্রণালীর প্রবেশমুখে শার্ম এল শেখ। ওটা তাদের অধিকারে। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীতে ছিল ৯৭৮ জন ভারতীয়, ৭৯৫ জন কানাডীয়, ৫৭৯ জন যুগোশ্লাভ, ৫৩০ জন সুইডিশ, ৪৩০ জন ব্রাজিলীয়, ৬১ জন নরওয়েজীয় এবং ২ জন ডেনিস সৈন্য। ওদের পরিচালক ভারতীয় জেনারেল রিখি। সিনাই সীমান্তের ওপাড়ে ইস্রাইলী এলাকায় রাষ্ট্রসংঘের কোন পর্যবেক্ষকবাহিনী ছিলনা। ইস্রাইলী সরকার তাদের সেখানে মোতায়েন হতে দেন নি। রাষ্ট্রসংঘের তখনকার সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ড চুক্তি করেছিলেন নাসেরের সঙ্গে। মিশর দাবী জানালেই মিশরীয় এলাকা থেকে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী প্রত্যাহৃত হবে। ১৯৫৬ সালের ১২ই নভেম্বর মিশরীয়

প্রচার দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল কর্ণেল হাতেম স্পষ্ট ভাষায় চুক্তির সর্ত সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কোন মহল থেকেই তার কোন প্রতিবাদ ওঠে নি। এ ব্যবস্থায় আরবেরা খুশী ছিল না। মিশরীয় এবং ইস্রাইলী—দুটো এলাকাতেই রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অবস্থান দরকার। বিশেষ করে, ইস্রাইল আক্রমণকারী। তার এলাকাতেই রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর মোতায়েনের বেশী প্রয়োজন। ব্যবস্থাটা এক তরফা। সিনাই সীমান্তে ইস্রাইলী সামরিক তৎপরতার উপর নজর রাখবার কোন উপায় নেই।

১৯৫৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পাওয়া গেল, ইস্রাইল সিরীয় সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে। সৈন্য জড় করে ইস্রাইল এক জায়গায়, আর আক্রমণ চালায় অন্যত্র। এটা ওদের সাধারণ সমর কৌশল। ১৯৫৬ সালে সিনাই আক্রমণের আগে তারা প্রচণ্ড হানা দিয়েছিল জর্ডনে। মিশরীদের বিভ্রান্ত করার ওটা একটা ফন্দী। ইস্রাইলী চীপ অফ স্টাফ আগে ভাগেই হুমকী দিয়ে রেখেছিলেন—ইস্রাইলী বাহিনী দামাস্কাস আক্রমণ করবে। সেখানে আটাসী সরকারের পতন ঘটাবে। নাসের ঝুঁকি নিলেন না। তিনি সিনাই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের হুকুম দিলেন। যুদ্ধের চেয়ে হুমকীটাই ছিল তাঁর কাছে বড় কথা। সিরিয়ার সঙ্গে রয়েছে মিশরের সামরিক চুক্তি। সিরিয়া আক্রান্ত হলে মিশর তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে বাধ্য। নাসের ভাবলেন, সিনাই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করলে সিরীয় সীমান্তের ইস্রাইলী বাহিনীর একাংশ সিনাইএ চলে আসবে। ফলে সিরিয়ার উপর ইস্রাইলী চাপ কমবে। যুদ্ধ হয়ত এড়ান যাবে। জেরুজালেমের ইস্রাইলী এলাকা যুদ্ধমুক্ত অঞ্চল। ১৫ই মে ইস্রাইলী—স্বাধীনতা বার্ষিকী। এখানেই ইস্রাইলীরা করল সাঁজোয়া এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্যারেড। আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনল মিশর। কিন্তু তার কথা শোনে কে? পরিবেশ গরম হয়ে উঠল।

১৯৫৫ সালের ১৬ই মে। মিশরীয় চীফ অফ স্টাফ জেনারেল ফৌজী তার করলেন রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল রিখিকে। তিনি স্পষ্টই বললেন—ইস্রাইলীদের মনোভাব সুবিধে নয়। ওরা হয়ত আক্রমণের পাঁয়তারা কষছে। যে কোন সময় সিনাই সীমান্ত জ্বলে উঠতে পারে। সংঘর্ষ বাধলে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর নিরাপত্তা থাকবে না। এ অবস্থায় মিশরীয় এলাকা থেকে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অপসারণ যুক্তিযুক্ত। ওরা সাময়িকভাবে গাজায় চলে যেতে পারে। জেনারেল রিখি দেরী করলেন না। রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল সেক্রেটারী উথাণ্টকে জানালেন মিশরের অনুরোধের কথা। পরের দিন উথাণ্ট ডেকে পাঠালেন,, রাষ্ট্রসংঘের মিশরীয় প্রতিনিধি এল কোণিকে। তাঁকে বললেন—রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর আংশিক অপসারণ সম্ভব নয়। গোটা বাহিনীকেই মিশর থেকে সরিয়ে আনতে হবে। উথাণ্টের প্রস্তাব মেনে নিলেন নাসের। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর কাছে মিশর ত্যাগের নির্দেশ এল। ১৯শে মে গাজায় হল একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রসংঘের পতাকা গুটিয়ে নিলেন জেনারেল রিখি। বিদেশী সৈন্যরা ছাড়ল মিশর।

এ ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া উথাণ্টের সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। ভারত সরকার স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন—মিশরের অমতে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী রাখার অর্থ মিশরের সার্বভৌম মর্যাদার অবমাননা। ভারত তাতে সায় দেবে না। ভারতীয় বাহিনী মিশর ত্যাগ করবে। যুগোশ্লাভিয়াও ভারতীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিল। বৃটেনের রক্ষণশীল দল উত্তেজিত হয়ে উঠল। বৃটিশ সংবাদপত্র-গুলোর বৃহত্তম অংশ দাবী জানালেন—রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী গায়ের জোরে মিশরে থাকবে। নাসেরের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতে কিছু যায় আসে না। তারা প্রকাশ করলেন, হ্যামারশীল্ডের ব্যক্তিগত গোপন রিপোর্ট। তাতে তিনি বলেছেন—শান্তিপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী মিশর সীমান্তে থাকবে। নাসের নিজেও

নাকি তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন।। উথাণ্ট বললেন—হ্যামারশীল্ডের ব্যক্তিগত মতামত রাষ্ট্রসংঘের গ্রহণযোগ্য দলিল নয়। ওটা বিশ্বসভার নথীভুক্ত হয়নি। প্রকাশ্য চুক্তিই শেষ কথা। তার বয়ান স্পষ্ট। মিশরের সম্মতির ভিত্তেতেই রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী মিশরে থাকবে। গায়ের জোরে সেখানে থাকার কোন অধিকার তাদের নেই। সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ দিল ইস্রাইল। মিশরীয় বাহিনীর ডেপুটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ফিল্ড মার্শাল আমের ঘুরে এলেন সীমান্ত এলাকা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জোরাল সমর্থন জানালেন নাসেরকে। পটপরিবর্তন হতে লাগল দ্রুত গতিতে।

১৯৫৫ সালের ২২শে মে সোমবার। তিরাণ প্রণালীতে এবং আকাবা উপসাগরে ইস্রাইলী জাহাজের গতিবিধি নিষিদ্ধ করল মিশর। নাসের বললেন— এই উপকূল দরিয়ায় মিশরের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত ঘটনা। ইস্রাইল যদি যুদ্ধ বাধাতে চায় তবে প্রতিরোধ চলবে।

তেইশে মে মঙ্গলবার। প্রধানমন্ত্রী এস্কোল ঘোষণা করলেন—তিরাণ প্রণালীতে ইস্রাইলী জাহাজের গতিবিধিতে বাধা দিলে যুদ্ধ অনিবার্য। প্রেসিডেণ্ট জনসন উদ্বিগ্ন। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তিনি যোগযোগ করলেন। তার মতে তিরাণ প্রণালীতে এবং আকাবা উপসাগরে অবরোধ সৃষ্টি বেআইনী। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের অভিমত স্পষ্ট—মিশরের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বৈধ। বৃটিশ রক্ষণশীল দল নাসেরের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। এডোয়ার্ড হীথ হেষ্টিংসের এক জনসভায় বললেন—স্বস্তি পরিষদ কিম্বা সাধারণ পরিষদকে না জানিয়ে মিশর থেকে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী অপসারণ অন্যায়। উথাণ্ট অবৈধ কাজ করেছেন। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে আবার মিশরে পাঠাতে হবে। স্যার আলেক ডগলাস হিউম দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী উইলসনের সঙ্গে। তিনি দাবী জানালেন, অবিলম্বে তিরাণ প্রণালী এবং আকাবা উপসাগরে বৃটিশ

জাহাজের অবাধ গতিবিধির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শ্রমিক সরকার মন ঠিক করতে পারছিলেন না। মিশরের কাজে তাঁদের সমর্থন নেই, কিন্তু সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহনেরও সাহস সেই। আমেরিকা না এগুলে তাঁরা এগুবেন না। ভূমধ্য সাগরের বৃটিশ নৌবহরকে তৈরী থাকার নির্দ্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী উইলসন। পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী জর্জ টমসন রওনা হলেন ওয়াশিংটনে। রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্ট এলেন কায়রোতে। দেখা করলেন নাসেরের সঙ্গে। চারদিকে চলল কূটনৈতিক তৎপরতা।

চব্বিশে মে বুধবার। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন ডিগবাজী খেলেন। তিনি রক্ষণশীলদের পথ ধরলেন। মারগেটে এক শ্রমিক সমাবেশে উইলসন ঘোষণা করলেন—তিরাণ প্রণালী আন্তর্জাতিক জল পথ। এখানে সব জাতির জাহাজের অবাধ চলাচলের অধিকার আছে। অন্যান্যের সঙ্গে একযোগে বৃটেন তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। বৃটিশ জনমত চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাদের ইস্রাইলী দরদ উথলে পড়ল। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ অভিযানের সময় যে চেষ্টায় ইডেন ব্যর্থ হয়েছিলেন, উইলসন তার সার্থক রূপ দিতে আসরে নামলেন।

বৃটেনের যুক্তি : আকাবা উপসাগরের উত্তর প্রান্তে এইলাত বন্দর। এই বন্দরের মাধ্যমে ইস্রাইল আমদানী করে তার তৈল। উপসাগরের উত্তরে মিশর এবং পূর্বে সৌদী আরব। উত্তর উপকূলে রয়েছে জর্ডন এবং ইস্রাইল। আকাবা উপসাগর একশ' মাইল লম্বা। ষোল থেকে বিশ মাইল চওড়া। ভূভাগ থেকে এ দরিয়ায় ঢুকতে হলে যেতে হয় সঙ্কীর্ণ তিরাণ প্রণালীর মধ্য দিয়ে। এ প্রণালীর প্রবেশ মুখে রয়েছে ছোট ছোট ক'টি দ্বীপ। দ্বীপগুলোতে মিশর গড়েছে সামরিক ঘাঁটি। ওরা নিয়ন্ত্রণ করে এই জলপথ। একটি জাতির বেঁচে থাকার উপায় যে জলপথের উপর নির্ভরশীল সে জলপথে অন্যের

একছত্র অধিকার থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইন এ সম্পর্কে স্পষ্ট। টেনে আনা হল, দার্দানেলস এবং বসফরাসের নজির। কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের যোগাযোগ রক্ষার জন্য এ দুটো জলপথ দরকার।. অবাধ জাহাজ চলাচলের অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন চলছিল রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের মন কষাকষি। সম্পাদিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৩৬ সালের মনট্রেক্স কনভেনসন অনুযায়ী এদুটো জলপথে সব জাতির জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার স্বীকৃত। তিরাণ প্রণালী এবং আকাবা উপসাগর এ ধরনের আন্তর্জাতিক বিধির আওতায় পড়ে। বৃটিশ পত্রিকাগুলো মনট্রেক্স কনভেনসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আপৎকালে তুরস্কের নিরাপত্তার তাগিদে তুর্কী সরকার এদুটো জলপথে ভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করার অধিকারী।

মিশরের যুক্তিঃ আকাবা উপসাগরের ইস্রাইলী উপকূল গায়ের জোরে অধিকৃত। ওটা রাষ্ট্রসংঘের ১৯৪৭ সালের প্যালেস্টাইন বিভাগ পরিকল্পনার বিরোধী। এইলাত বন্দর ইস্রাইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে পায়নি। বলপ্রয়োগে দখল করেছে। আকাবা উপসাগরের প্রবেশমুখ নয় মাইলের চেয়ে কম চওড়া। উপকূল দরিয়ায় সার্বভৌমত্বের পরিধি বার মাইল। এই হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিধি। মিশরের সঙ্গে ইস্রাইলের যুদ্ধাবস্থা বর্তমান। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিরাণ প্রণালী দিয়ে কোন ইস্রাইলী জাহাজ চলাচল করতে দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধও কেউ তোলেনি। ১৯৫৬ সালের পর ইস্রাইল এ প্রণালী ব্যবহার করছে। ১৯৫৬ সালে মিশরে ইস্রাইলী অভিযান রাষ্ট্রসংঘের সমর্থন পায়নি। আক্রমণকারীকে লুটের মাল ভোগ করতে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ বার বার অগ্রাহ্য করেছে ইস্রাইল। ১৯৫৭ সালে তার এলাকায় সে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী মোতায়েন হতে দেয়নি।

প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর আক্রমণ চালাবার অপরাধে ছ'বার ইস্রাইল স্বস্তিপরিষদে ধিকৃত হয়েছে। জোর যার মুলুক তার নীতিতে সে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই তার লোক ঠকান ভাওতা।

ইস্রাইলের সহযোগী বৃটেন এবং আমেরিকা। আকাবা উপসাগরে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা দৃঢ়সঙ্কল্প। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগেরও পক্ষপাতী। কিন্তু অবরোধ সম্পূর্ণ। চারিদিকে মাইন পাতা হয়েছে। মিশরীয় বিমান, নৌবহর এবং উপকূলের গোলন্দাজ বাহিনী তৈরী। স্বস্তি-পরিষদের বৈঠক বসল। সোভিয়েট রাশিয়া দাবী জানাল—ভূমধ্যসাগর থেকে বৃটিশ এবং মার্কিন নৌবহর সরিয়ে নিতে হবে। আম্মান বেতার ঘোষণা করল, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য জর্ডন সরকার সৌদী আরবীয় এবং ইরাকী বাহিনীকে জর্ডন প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন।

পঁচিশে মে বৃহস্পতিবার। সোভিয়েট সমর্থন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতির আশায় একদল প্রতিনিধি নিয়ে মিশরীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী পৌঁছলেন মস্কোয়। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রেচকো। প্রেসিডেন্ট জনসন ছুটলেন কানাডায়। পিয়ারসনের সঙ্গে হল তার দীর্ঘ আলোচনা। ইস্রাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইবন এলেন ওয়াশিংটনে। দেখা করলেন প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে। স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁকে ১৯৫৭ সালের কথা। সুয়েজের ঘটনার পর অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকীর মুখে ইস্রাইল ছেড়েছিল শার্ম এল শেখ এবং পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—আকাবা উপসারে ইস্রাইলী জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন থাকবে। জনসন ইহুদী প্রেমিক। তাদের ভোটের জন্য তিনি লালায়িত। ইঙ্গ-ফরাসীর সুয়েজ অভিযানের সময় তিনি ছিলেন মার্কিন নীতির কঠোর সমালোচক। প্রেসিডেন্ট জনসন

আগেভাগেই স্বীকার করেছেন যে, তিরাণ প্রণালী এবং আকাবা উপসাগর আন্তর্জাতিক জলপথ। সেখানে মিশরের অবরোধ সৃষ্টি বেআইনী। এখন কথার নড়চড় করা মুস্কিল। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি বিবাদেও তাঁর অনিচ্ছা। কিছুতেই মস্কোর অনুকূল মত পাওয়া যাচ্ছে না। উইলসন-জনসনের যৌথ পরিকল্পনা—সব জাতির জাহাজ একযোগে আকাবা উপসাগরে ঢুকবে। তারা বাস্তব অবস্থায় মোকাবিলা করবে। এ পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য জনসন দশ-পনের দিনের সময় চাইলেন। তেল আবিবে ফিরলেন ইবন।

মার্কিন-বৃটিশ যৌথ পরিকল্পনায় দেখা দিল সঙ্কট। অপর কোন রাষ্ট্র গায়ে পড়ে আরবদের সঙ্গে বিরোধ বাধাতে রাজী নয়। তিরাণ প্রণালীতে কনভয়ে জাহাজ পাঠাতে তারা অনিচ্ছুক। পশ্চিম এশিয়ায় তাদের তৈলস্বার্থ নেই। বৃটেন এবং আমেরিকার জন্য অনর্থক ঝক্‌মারি পোহাতে তারা যাবে কেন? উইলসন-জনসন শূন্যে সৌধ নির্মাণে মন দিলেন। ইস্রাইলী পতাকা উড়িয়ে তিরাণ প্রণালীতে ঢুকবে একটি জাহাজ। তার গন্তব্যস্থল এইলাত বন্দর। তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে বৃটিশ এবং মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ। মিশরীয় বাহিনী গোলাবর্ষণ করলে পাল্টা গোলা বর্ষিত হবে। প্রয়োজন হলে তারা শার্ম এল শেখ ঘাঁটি ধ্বংস করবে।

ছাব্বিশে মে শুক্রবার। নাসের বললেন—মিশরের এক নম্বর শত্রু আমেরিকা। তার সমর্থনেই ইস্রাইল বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বৃটেন প্রকৃতপক্ষে মার্কিন লেজুড়। প্রেসিডেণ্ট জনসনের নির্দেশ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী উইলসন এক পাও এগুতে পারেন না। ইঙ্গ-মার্কিন মহলে চলল তুমুল উত্তেজনা। প্রেসিডেণ্ট জনসন ডেকে পাঠালেন মিশরীয় রাষ্ট্রদূতকে। তাঁকে তিনি সতর্ক করলেন। বললেন—মিশর যেন আগে যুদ্ধারম্ভ না করে। রাত্রি সাড়ে তিনটায় কায়রোর সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন নাসেরের।

সঙ্গে এনেছিলেন মস্কোর এক জরুরী চিঠি। মিশর আগে যুদ্ধে নামুক সোভিয়েট নেতারা তা চান না। তাঁদের হাতে ছিল সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের গোপন রিপোর্ট। মিশরীয় বাহিনীর সমর প্রস্তুতি ক্রুটিপূর্ণ। বৈমানিকরা আকাশে চব্বিশঘণ্টা টহল দিচ্ছে না। যুদ্ধের মানসিকতা তাদের মধ্যে নেই। বাইরে তৈরী হচ্ছে যুদ্ধের আবহাওয়া। সেনাপতিরা রয়েছেন শান্তিকালীন পরিবেশের মধ্যে। বিমান ঘাঁটিগুলোতে সাজিয়ে রাখা নকল বিমানগুলোর নকলত্ব ধরে ফেলতে বেশী সময় লাগে না। আসল বিমানগুলোর নিরাপত্তার উপর কারও নজর নেই। বোমা ফেলে এগুলোকে গুড়িয়ে দেওয়া খুবই সহজ। এ অবস্থায় মিশরের তরফ থেকে যুদ্ধারম্ভ বিপদজনক। বরং ওটা এড়ানই যুক্তিযুক্ত।

সাতাশে মে শনিবার। উথাণ্ট স্বস্তিপরিষদে তাঁর মিশর সফরের রিপোর্ট দিলেন। তিনি বললেন—ইস্রাইলের বিরুদ্ধে মিশর প্রথম আক্রমণ চালাবে না। নাসের তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালের আগের সীমারেখায় ফিরে যেতে ইস্রাইলকে নির্দেশ দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। এ নির্দেশ পালনে ইস্রাইলকে বাধ্য করাই মিশরের লক্ষ্য। উথাণ্টের বক্তব্য শুনে বৃটিশ প্রতিনিধির কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। মার্কিন প্রতিনিধি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। মিশরীয় জনগণের মধ্যে উত্তেজনার তেমন কোন লক্ষণ নেই। তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। সৈন্যরা জড় হয়েছে সিনাইএর অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে। নাসেরের মৌখিক আক্রমণ চলছে বৃটেন এবং আমেরিকার উপর। ইস্রাইলে চলছে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি। বিপদ সঙ্কেত স্পষ্ট। জেনারেল দেয়ান হয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আরব রাষ্ট্রগুলো চঞ্চল। ইরাকী মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—মিশরের উপর ইস্রাইলী আক্রমণে বৃটেন এবং আমেরিকা মদত দিলে তাদের তৈল সরবরাহ বন্ধ করা হবে। কুওয়েট বাজেয়াপ্ত করবে ইঙ্গ-মার্কিন তৈল অধিকার।

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো পড়ল মহা-বিপদে। পশ্চিম এশিয়ার তৈল ছাড়া পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষ করে বৃটেন বাঁচতে পারে না। তাদের তৈলের শতকরা ৬০ ভাগ আসে সুয়েজখাল দিয়ে।

আটাশে মে রবিবার। এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাসের ঘোষণা করলেন—সম্ভাব্য মিশরীয় ইস্রাইলী লড়াইএ পশ্চিমী শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ অসহনীয়। এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলে সুয়েজ খাল বন্ধ হয়ে যাবে। মিশরের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে তিরাণ প্রণালী উপর। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন রাষ্ট্র এ অধিকারে পররাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে পারে না। মিশরীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী চারদিন মস্কো সফরের পর ফিরে এসেছেন কায়রোতে। কোসিগিন, গ্রোমিকো এবং মার্শাল গ্রেচকোর সঙ্গে হয়েছে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা। নাসেরকে দিলেন তিনি মস্কো সফরের বিবরণ। সোভিয়েট নেতারা সঙ্কট এড়াবার উপদেশ দিয়েছেন তাঁকে। মিশরীয় গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মকুশলতায় নাসেরের মনে এসেছে সন্দেহ। শত্রুর শক্তির পরিমাপ তারা হয়ত ঠিকমত করতে পারে নি। জাকারিয়া মহীউদ্দিনকে তিনি পাঠাতে চাইলেন ওয়াশিংটনে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ সম্মতি দিলেন প্রস্তাবে। মনে হল, মেঘ যেন কেটে যাবে। নাসের একটা বোঝাপড়ায় উৎসুক। কিন্তু ইস্রাইল? তাকে সামলাবার দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না। বৃটেন তাকে ক্রমাগত উস্কাচ্ছে। জনসনের উপর ভরসা রাখা মুস্কিল। শান্তিচেষ্টায় দোষ নেই—ভাবলেন নাসের।

উনত্রিশে মে সোমবার। নিউইয়র্কে বসল স্বস্তি পরিষদের জরুরী বৈঠক। আমেরিকার প্রস্তাব—সাময়িকভাবে তিরাণ প্রণালীর ভিতর দিয়ে সব জাতির জাহাজের অবাধ চলাচলের অধিকার থাকবে। তারপর ধীরে সুস্থে সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা যাবে। মিশরের ভয়ানক আপত্তি। তার বক্তব্য স্পষ্ট। তিরাণের উপর সার্বভৌম অধিকার সে ছাড়বে না। এদিকে

মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের পঞ্চাশটি জাহাজ ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে টহল দিচ্ছে। বৃটিশ নৌবহরও তৈরী। মল্টায় আবার কর্মতৎপরতা দেখা যাচ্ছে। বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজ ভিক্‌টোরিয়াস মল্টার বন্দরে অপেক্ষা করছে। গাজা সীমান্তে ইস্রাইলী সৈন্যরা জমায়েত হচ্ছে। সেখানে ইতস্তত সংঘর্ষ চলছে। ইস্রাইলী প্রধানমন্ত্রী এস্কোল বললেন, বৃটেন এবং আমেরিকা তিরাণ প্রণালীতে অবাধ জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছে। তাদের চেষ্টার পরিণতি হয়ত হু'চার দিনের মধ্যে জানা যাবে। স্বস্তি পরিষদে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হল না। সোভিয়েট রাশিয়ার জোরালো দাবী—ভূমধ্যসাগর থেকে বৃটিশ এবং মার্কিন নৌবহরের অপসারণ দরকার। তারাই অবস্থা ঘোরাল করে তুলছে। মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেল না। বিনা ভোটাভুটিতে ওটা বাতিল হল। আলজেরিয়া ঘোষণা করল, মিশরকে সাহায্যের জন্য সে সৈন্য পাঠাবে। রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা নাসেরের হাতে তুলে দিল মিশরীয় জাতীয় পরিষদ। তিনি এখন ডিক্রিবলে দেশশাসন করতে পারবেন। আইনসভার অনুমোদনের দরকার পড়বে না। নাসের বললেন—আমরা ইস্রাইলের বিরুদ্ধে শুধু লড়াই করছি না। যে পশ্চিমী শক্তিজোট তার স্রষ্টা তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে নেমেছি। ওরাই ইস্রাইলকে আরব ঠেঙ্গাবার লগুড় হিসাবে ব্যবহার করছে।

তিরিশে মে মঙ্গলবার। সোভিয়েট রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে দশটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল। বসফরাস প্রণালীর মধ্য দিয়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ পার করতে হলে তুর্কী সরকারকে আট দিনের আগাম নোটিশ দেওয়া দরকার। এটা মনট্রেক্স কনভেনসনের বিধি। মস্কো তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা যথারীতি জানিয়ে দিলেন আংকোরাকে। একটি মার্কিন জাহাজ লাইবেরিয়ান পতাকা উড়িয়ে হাজির হল তিরাণ প্রণালীর প্রবেশ-মুখে। জাহাজটি যাবে এইলাত বন্দরে। মিশরীয় গোলন্দাজরা

ছাড়ল হুশিয়ারী গোলা। মার্কিন জাহাজ ফিরে গেল। বোধ হয়, মার্কিন ক্যাপ্টেন পরখ করতে চেয়েছিলেন মিশরের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। মিশর কিম্বা আমেরিকা এ নিয়ে কোন কূটনৈতিক উচ্চবাচ্য করল না। তারা এমন ভাব দেখাল, যেন কোন ঘটনাই ঘটে নি।

জেরুজালেমে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন ইস্রাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইবন। তিনি বললেন—ইস্রাইল যে কোন মীমাংসায় রাজী—। তবে তার প্রধান সর্ত হবে তিরাণে সব জাতির জাহাজ চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা। ইঙ্গমার্কিন চেষ্টার ফলাফল দেখার জন্য দু এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবে ইস্রাইল। তারপর সে নিজের পথ নিজে বেছে নেবে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন পড়েছেন মহাফাপরে। গায়ের জোরে তিরাণ প্রণালীতে প্রবেশের পরিকল্পনায় অন্য কোন রাষ্ট্র সায় দিচ্ছে না। তাঁর রাষ্ট্রদূতরা বৃটিশ আবেদনপত্রে সই জোগাড় করতে পারছেন না। সোভিয়েট রাশিয়া ভূমধ্য সাগরে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাচ্ছে। আমেরিকা উদ্বিগ্ন। রাত্রে উইলসনের ভাল ঘুম হচ্ছে না। রক্ষণশীল দলের চাপ প্রবল। শ্রমিকদলের বামপন্থী অংশের পিছুটান তীব্র। ১৯৫৬ সালের ইডেনী অবস্থায় দোলা খাচ্ছেন উইলসন।

জর্ডনের বাদশা হুসেন হঠাৎ এলেন কায়রোতে। ছ'ঘণ্টা তিনি ছিলেন সেখানে। ফিরে যাবার আগে সই করে গেলেন জর্ডন-মিশর সামরিক চুক্তি। যৌথবাহিনী পরিচালনা করবেন মিশরীয় জেনারেল। ইরাকী বাহিনী ঢুকল জর্ডনে। তাদের অভ্যর্থনা জানালেন জর্ডন সরকার। সৌদী আরব ঘোষণা করল, তার সৈন্যদল মার্চ করছে জর্ডনের পথে। প্যালেস্টাইনী গেরিলারা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। সিরিয়ায় উঠেছে সাজ সাজ রব। পশ্চিম জার্মানী ইস্রাইলে বিশ হাজার গ্যাসমুখোশ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্তটা পুরনো। মিশরের প্রতিবাদের মুখে ওটা এতদিন কার্যকর হয়নি। হঠাৎ মানবতা বোধ চাঙ্গা হয়ে উঠল বন

সরকারের। মানবতার খাতিরেই তারা স্থগিত রাখা সিদ্ধান্ত আবার চালু করতে চাচ্ছেন। নাসের বুঝলেন, পশ্চিম জার্মানীর চাল। সবাই জানে, আরব-ইস্রাইল লড়াইএ মিশর গ্যাস ব্যবহার করবে না। তার অস্ত্রাগারে বিষ গ্যাস নেই। গ্যাস মুখোশের আড়ালে ইস্রাইলে যাবে অস্ত্রশস্ত্র। অতীতে মার্কিন ইঙ্গিতে পশ্চিম জার্মানী গোপনে পাঠিয়েছে ইস্রাইলে সমরসম্ভার। ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এমন কাণ্ড সে আর করবে না। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র ছিঁড়ে ফেলেছিল পশ্চিম জর্মানীর সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাসের। প্রেসিডেন্ট জনসনের ইস্রাইলী প্রীতি গভীর। সরাসরি তিনি আসতে চান না ষড়যন্ত্রের মুখে। এলে সোভিয়েট রাশিয়া চটবে। পশ্চিম জার্মানীর বকলমে তিনি পালন করছেন মার্কিন কর্ত্তব্য। বৃটেনের আসল লক্ষ্য সুয়েজ। এখানে সে চায় নাসেরের সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্কুচন। তিরাণ প্রণালী তার ভূমিকা। জর্ডন-মিশর সামরিক চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইস্রাইলী সমর পরিকল্পনার প্রকৃতি গেল পাল্টে। জর্ডনের ভূভাগ ঢুকে গিয়েছে ইস্রাইলের ভিতরে। এখান থেকে হয়ত আসবে আক্রমণ। ষ্ট্র্যাটেজির দিক থেকে এটা আরবদের পক্ষে সুবিধাজনক। ইস্রাইলী মন্ত্রিসভা অবস্থা পুনর্বিবেচনায় মন দিলেন।

ইস্রাইলের ভিতরের অবস্থা সঙীন। জমির ফসল মাঠেই পড়ে আছে। কৃষকরা ঢুকেছে সৈন্যবাহিনীতে। দোকান পাট প্রায় সব বন্ধ। সবাই গেছে সামরিক শিবিরে। মেয়েরা হাতে নিয়েছে রাইফেল। স্কুল কলেজ অচল। অস্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে সারা দেশে। সাধারণ মানুষ অধীর। তারা চায় সমস্যার দ্রুত সমাধান। সৈন্যবাহিনী চঞ্চল। বছরের খাবার মাঠে রেখে কৃষকরা সামরিক ব্যারাকে বসে থাকতে রাজী নয়। ওরা মরিয়া। একটা হেস্তনেস্ত করতে উৎসুক। . জেনারেল দেয়ান যুবসম্প্রদায়ের হিরো। ১৯৫৬ সালের সিনাই অভিযানে ইস্রাইলী বাহিনীকে

নাসের—১৬

তিনি দিয়েছিলেন যুদ্ধজয়ের গৌরব। এবারও সবাই তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। ১৯১৫ সালে প্যালেস্টাইনে জন্ম। মাত্র চৌদ্দবছর বয়সে দেয়ান বেছে নিয়েছিলেন বৈপ্লবিক পথ। যোগ দিয়েছিলেন ইহুদী গুপ্তসমিতি হাগানায়। ১৯৩৯ সালে বৃটিশ বিচারে পেয়েছিলেন দশ বছর কারাদণ্ড। এক বছর পরেই ঘটেছিল তাঁর কারামুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেয়ান পরেছিলেন বৃটিশ সৈন্যদলের ইউনিফর্ম। সিরিয়া তখন নিয়েছিল ফ্রান্সের ভিসি সরকারের (মার্শাল পেঁতা) আনুগত্য। দেয়ান চালিয়েছিলেন সিরিয়ার ফরাসী বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ। সংঘর্ষের সময় একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে দেয়ান পরেন বাঁ-চোখে কালো চশমা। কালো চশমা জেনারেল দেয়ানের ট্রেড মার্ক। ১৯৫৬ সালে সিনাই বিজয়ের পর তিনি পেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। তিনি এখন জাতির প্রেরণার উৎস।

আটাশ

বাইরের দুনিয়া জল্পনা কল্পনায় মশগুল। ইস্রাইলের ভিতরে চলছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। শক্তিশালী দল মাপাই। এস্কোল তার নেতা। মাপাই থেকে বেরিয়ে এসে বেন গুরিয়ন তৈরী করেছেন রফি দল। জেনারেল দেয়ান এ দলের সদস্য। মাপাই নরমপন্থী এবং রফি চরমপন্থী। জনসাধারণ মুটামোটি দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একটি স্থানীয় ইহুদী (সাব্রাস) এবং অপরটি বহিরাগত ইহুদী। স্থানীয় ইহুদীরা পছন্দ করে না বহিরাগত ইহুদীদের। এদের ধারণা, বহিরাগত ইহুদীরা হাজার হাজার বছর ঘুরে বেড়িয়েছে। ইউরোপের সর্বত্র তারা খেয়েছে খৃষ্টানদের তাড়া। হিটলার তাদের দিয়েছেন প্রচণ্ড মার। যারা বেঁচেছে

তারা এসে জুটেছে ইস্রাইলে। স্বাধীনতা বলতে ইউরোপীয় ইহুদীদের কিছু ছিল না। ফলে হারিয়েছে তারা আত্মবিশ্বাস। পরের সাহায্য ছাড়া এগুতে অক্ষম। ১৯৫৬ সালে সিনাই অভিযানে ইস্রাইল নিয়েছিল ফ্রান্স এবং বৃটেনের ছত্রছায়া। এবার ভাবছে—অন্যেরা এসে তাদের জন্য খুলে দেবে ত্রিরাণ প্রণালী। ইউরোপীয় ইহুদীরা নিজেদের মনে করে জাত কুলীন। তাদের দৃষ্টিতে স্থানীয় ইহুদীরা অনুন্নত। শ্বেতাঙ্গ উন্নাসিকতা সঙ্গে নিয়ে এসেছে তারা ইস্রাইলে।

রফি দলের প্রভাবশালী নেতা সাইমন পেরেস। তিনি জোট বাধলেন গহল দলের নেতা বেগিনের সঙ্গে। রফির মতই গহল উগ্রপন্থী। তাদের সম্মিলিত দাবী—এস্কোলকে পদত্যাগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর পদ নেবেন বেন গুরিয়ন। এস্কোল তাতে রাজী নন। চলল টানাহেঁচড়া। তৃতীয় পক্ষ থেকে এল একটি আপোষ প্রস্তাব—এস্কোল প্রধানমন্ত্রী এবং বেন গুরিয়ন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। বেন গুরিয়নের সম্মতি ছাড়াই দেওয়া হয়েছিল এ প্রস্তাব। তিনি চটলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন—প্রধানমন্ত্রীর কিম্বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর—কোন পদেই থাকতে পারবেন না এস্কোল। রফি দল দেখল—এস্কোল কোন পদই হাতছাড়া করতে রাজী নন। তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোও মুস্কিল। সম্মিলিত ভাবে প্রস্তাব দিল রফি—গহল, দেয়ানকে মন্ত্রিসভায় নিতে হবে। সৈন্যবাহিনী দেয়ানের পক্ষে। তাঁকে দপ্তরহীন উপপ্রধান মন্ত্রী অথবা প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্য করতে চাইলেন এস্কোল। রফি দলের নেতারা এবং দেয়ান তাতে অসম্মত। জেনারেল দেয়ান দেখা করলেন এস্কোলের সঙ্গে। তাঁকে বললেন—মন্ত্রীর দপ্তর না পেলে তিনি দক্ষিণ ফ্রন্টের কম্যাণ্ডারের পদ নিতে রাজী। সবাই ভাবল একটা মীমাংসা হয়ে গেছে। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধাল এম আরাখ ফ্রন্ট। পার্লামেন্টে (নেসেৎ) মাপাই দলের সঙ্গে আচদুত হাভোদা দলের সহযোগিতায়

তৈরী এ ফ্রণ্ট। তাদের দাবী—প্রতিরক্ষা দপ্তর দিতে হবে প্রাক্তন চীফ অফ স্টাফ ইগল ইয়াদিনকে। গহল দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন এস্কোল। বললেন তাদের ইয়াদিনের কথা। সবাই চায় জাতীয় ঐক্য। রফি দল মানল না এ প্রস্তাব। গহলও সায় দিল না। মীমাংসা করলেন ইয়াদিন নিজে। তিনি বললেন—জেনারেল দেয়ানের উপর রয়েছে জাতির আস্থা। আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে পড়েছে ইস্রাইল। জেনারেল দেয়ানই প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপযুক্ত মন্ত্রী। আর কোন বাধা রইল না। জেনারেল দেয়ান হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

ইস্রাইলী সমর নায়কদের মাথাব্যথা মিশরকে নিয়ে। এখানেই তাঁরা পাবেন প্রচণ্ড বাধা। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রকে গ্রাহ্য করে না ইস্রাইল। ক্ষুদ্র দেশ। অঞ্চলগুলো ঘন বসতিপূর্ণ। নিজের দেশে লড়াইএর বিপদ অনেক। পিছু হটার জায়গা নেই। হতাহতের সংখ্যা বাড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়বে। সীমান্তের ওপারে অন্যের জমিতে লড়াই ইস্রাইলের পক্ষে সুবিধা। তার জন্য দরকার প্রথম আক্রমণ। সিনাই তার প্রধান লক্ষ্য। এ সীমান্তে জড় হবে ইস্রাইলী বাহিনীর বৃহত্তম অংশ। সিরিয়া এবং জর্ডন সীমান্তে চালাবে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম। এদিকে নজর রেখেই ইস্রাইলী নেতারা প্রণয়ন করেছিলেন যুদ্ধ পরিকল্পনা।

ইস্রাইলী সমর কৌশল চিরাচরিত যুদ্ধরীতির পর্যায়ে পড়ে না। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান বড় কথা। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরী তার সমরনীতি। আক্রমণের ধারা কিছুটা জার্মানীর ব্লিৎসক্রীগের অনুরূপ। দুর্ধর্ষ সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে শত্রুর দুর্বল স্থানে প্রচণ্ড আঘাত। যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মাথাব্যথা নেই। ওটা হবে পরে। শত্রু একবার ছত্রভঙ্গ হলে পুনঃসমাবেশে সময় লাগে। এ সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। বোমারুর চেয়ে জঙ্গী-বোমারু বিমানের উপর ইস্রাইলের বেশী

ঝোঁক। আক্রমণ প্রতিরোধ, আক্রমণ এবং পদাতিকদের সাহায্যে এগুলো খুবই উপযোগী। বৈমানিকদের তৎপরতা সাংঘাতিক। সাড়ে সাত মিনিটের মধ্যে বিমানে যুদ্ধের সরঞ্জাম তুলে তারা শূন্যে উঠতে পারে। মার্কিন বিমান বহরের বেশ কিছু ইহুদী পাইলট ঢুকেছে ইস্রাইলী বিমান বহরে। শিক্ষায় এরা উন্নত। অনেকে আবার যুদ্ধ ফেরতা। অভিজ্ঞতা বেশী। হাতে আছে ফরাসী মিসটারস এবং মিরাজ। ভয়ের কিছু নেই। সোভিয়েট মিগ আধুনিক। কিন্তু তার চালক মিশরীয় বৈমানিকদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। আধুনিক যুদ্ধের কলাকৌশল তাদের অজানা। যান্ত্রিক অভিজ্ঞতাও কম।

ইস্রাইলী মন্ত্রিসভার গোপন বৈঠক বসল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল আলোচনা। বড় ভয় মিশরীয় বিমান আক্রমণের। যুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলবে তেল আবিবের উপর বিমান আক্রমণ। ইস্রাইলী বিমান বহরের বড় কর্ত্তা হোডের রিপোর্ট বিশ্বাস করতে পারছেন না অনেকে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, তেল আবিব আক্রান্ত হবার আগেই মিশরীয় এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের বিমান বহর ধ্বংসে তিনি সক্ষম। আসল মতলব জানতেন জেনারেল দেয়ান। আশ্বস্থ করলেন তিনি মন্ত্রিসভার অসামরিক সদস্যদের। গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট আশঙ্কাজনক। মিশরীয় জেনারেল রিয়াধ এসেছেন আম্মানে। জর্ডনবাহিনী এখন তাঁর অধীনে। অগ্রবর্ত্তী সদর দপ্তর গড়ে তুলছেন তিনি। ইরাকী গোলন্দাজ বাহিনী জর্ডন নদী পার হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ১৫০টি ট্যাঙ্কের একটি বহর। দু'তিন দিনের মধ্যেই তারা পজিসন নেবে। আসল লড়াই হবে সিনাই এ। জর্ডন সীমান্তে ইরাকী সৈন্য সমাবেশ ইস্রাইলের পক্ষে বিপদ জনক। শত্রুর প্রস্তুতির আগেই আঘাত হানা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সে আঘাত হবে অপ্রত্যাশিত। ইউরোপের জনমত ইস্রাইলের পক্ষে। মার্কিন এবং বৃটিশ নৌবহর ভূমধ্যসাগরে ঘোরাফেরা করছে।

সোভিয়েট বেশীদূর এগুবে না। এগুলে আমেরিকার সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবে। আফ্রো-এশিয়া চেঁচামেচি করলে ক্ষতি নেই। স্বস্তি পরিষদে তাদের সামলাবে বৃটেন এবং আমেরিকা। সময় অনুকূল।

উইলসন এবং জনসন কূটনৈতিক তৎপরতায় ব্যস্ত। সারা বিশ্বের নজর তাঁদের উপর। পয়লা জুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পৌঁছলেন ওয়াশিংটনে। হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনে তাঁকে দেওয়া হল গার্ড অফ অনার। সামরিক বাদ্য বাজল। বন্দুকের আওয়াজে সৈনিকেরা স্যালুট করল। সবাই অবাক হয়ে ভাবল—কেন এতসব কাণ্ডকারখানা? বৃটিশ-মার্কিন বন্ধুত্বের কি নিবিড় অভিব্যক্তি! সকালে দু'ঘণ্টা এবং বিকেলে দু'ঘণ্টা উইলসন কাটালেন জনসনের সঙ্গে। আলোচনার ফলাফল জানল না বাইরের কেউ। সাংবাদিকদের কিছুই বললেন না তিনি। তিরাণ প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাহাজের কনভয় পাঠাবার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা আর বেশী মাথা ঘামালেন না। বৃটিশ-মার্কিন কলরবে হঠাৎ যেন ভাটা পড়ল।

ইস্রাইলী মন্ত্রিসভা যুদ্ধ আরম্ভের নির্দেশ দিয়েছেন। সৈন্য বাহিনী তৈরী। মিশরকে ধোকা দেওয়া দরকার। সমর দপ্তর একদল সৈন্যের ছুটি ঘোষণা করলেন। তারা সমুদ্র উপকূলে পিকনিকে মন দিল। কাগজে কাগজে ছবি বেরুল। সবাই ভাবল যুদ্ধ বাধবে না। মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর অবশ্যই সব খবর জানত। প্রেসিডেন্ট জনসনেরও কোনকিছু অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। প্রকাশ্যে তিনি বলে চলেছেন, যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। কূটনৈতিক উপায়ে সমস্যার ফয়সালা হয়ে যাবে। মিশরীয় গোয়েন্দা দপ্তর অপদার্থ। তারা জানতে পারল না কিছুই। সেনাধ্যক্ষরা দায়িত্বহীন। ইস্রাইলী জেনারেলরা সীমান্ত ঘুরে সৈন্য সমাবেশ দেখছেন। মিশরের আকাশে গোয়েন্দা

বিমান উড়ছে। খেয়াল নেই কারও। সেনাপতিরা বিকেলে টেনিস খেলছেন।

গরমের দিনে কায়রোর অধিবাসীরা একটু বেশী রাত্রে শুতে যায়। জুন মাস চলছে। ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। যে যতক্ষণ পারে রাত্রে বাইরে কাটায়। দিনটা ছিল জুন মাসের চার তারিখ। রাত্রি বারোটার পর রাস্তাঘাট নির্জন। নিশ্চিন্ত মনে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মরুভূমিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার মিশরীয় এবং ইস্রাইলী সৈন্য। দিনে অসহ্য গরমে সবাই ছটফট করে। রাত্রে ঘুম নেই। ইস্রাইলী মেয়েদের সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সৈন্যদলের খাতায় তাদেরও নাম লেখাতে হয়। ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫৬ সালে নারীবাহিনী যুদ্ধে নেমেছিল। এবার তারা সেবিকা, ডাক্তার, কেরানী, টেলিফোন অপারেটার, বেতার অপারেটার প্রভৃতি কাজ নিয়ে জড় হয়েছে অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিগুলোতে। হাসিমুখে যে যার কাজ করছে। কারও কোন বিরক্তি নেই। ইস্রাইলী এবং মিশরীয় সৈন্যদলের মানসিকতা আলাদা। ইস্রাইলীরা জানে, তারা যদি যুদ্ধে হারে তবে তাদের স্বদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। ইস্রাইলের নাম মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে কোথাও দাঁড়াবার জায়গা পাবেনা তারা। মিশরীয়দের ভাবনা চিরাচরিত। আরবদের জমি বেদখল করেছে ইস্রাইল। এ জমি উদ্ধার তাদের নৈতিক কর্ত্তব্য। তারা না পারলে তাদের পরবর্ত্তীরা পারবে। নাসেরকে তারা বিশ্বাস করে। শতাব্দীর জড়তা থেকে টেনে তুলেছেন তিনি মিশরকে। আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এ রাষ্ট্র। পেয়েছে সে প্রভাবশালী জাতির মর্যাদা। এ মর্যাদা রাখতে হবে। জানপ্রাণ কবুল করে ইস্রাইলকে রুখতে হবে।

১৯৫৬ সালের সুয়েজ লড়াই-এর সময় থেকে বিশ্ব-জনমতের উপর নাসেরের শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। তিনি নিজে যুদ্ধের সূচনা

করবেন না। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টকে দিয়েছিলেন এ প্রতিশ্রুতি। যথারীতি স্বস্তি পরিষদকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন উথান্ট।' নাসেরের বিশ্বাস—তিরাণ প্রণালীর উপর মিশরীয় সার্বভৌমত্ব অনস্বীকার্য। শেষ পর্যন্ত মিশরের অনুকূলে একটা শান্তিপূর্ণ ফয়সলা হয়ে যাবে। সিরিয়ার উপর ইস্রাইলী চাপ প্রশমনের জন্য সিনাইএ হয়েছে মিশরীয় সৈন্য সমাবেশ। উদ্দেশ্য সফল। আপাততঃ যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। নাসের খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। গোয়েন্দা দপ্তরও অবস্থার গুরুত্ব যথাযথভাবে তাঁর নজরে আনে নি। সেনাপতিদেব গাফিলতি চোখে পড়েনি। ফিল্ড মার্শাল আমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর হাত ধরেই তিনি করেছিলেন বিপ্লবের সূচনা। আমেরের উপর তিনি রাখতেন অগাধ আস্থা।

জেনারেল দেয়ান নিজে গিয়েছিলেন সীমান্ত পর্যবেক্ষণে। জর্ডন সীমান্তের ইস্রাইলী কম্যাণ্ডারকে তিনি বলে এসেছিলেন— এ ফ্রণ্টে বড় রকমের লড়াই হবে না। বাদশা হুসেন সংগ্রামবিমুখ। আরব ঐক্যের খাতিরে তিনি পাঁয়তারা কষছেন। সিরীয় বাহিনী রয়েছে সুবিধাজনক অবস্থানে। গোলান উপত্যকা তাদের দখলে। এখান থেকে তারা ইস্রাইলী জনপদে কামান দাগতে পারবে। আত্মরক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় অধিবাসীদের। এদের হাতে আছে হালকা ধরণের অস্ত্র। সম্প্রতি পেয়েছে মেসিন গান এবং অন্যান্য অস্ত্রসম্ভার। প্রত্যেকটি বাড়ীর চারদিকে উঠেছে বালির বস্তার প্রাচীর। মাটির নীচে তৈরী হয়েছে দুর্ভেদ্য কংক্রিটের ঘর। প্রতিরোধ ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। ওরা লড়বে। জানপ্রাণ কবুল করে লড়বে। জমিতে আছে পাকা শস্য। সিরীয় গোলাবর্ষণে এগুলো যত জ্বলবে ওদের প্রতিরোধ আকাঙ্ক্ষা তত বাড়বে।

বৃটেনের ইনস্টিটিউট অফ ষ্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস দিয়েছেন বিবদমান পক্ষগুলোর শক্তির পরিমাপ :

ইস্রাইল : ২৬,৪০০০ সৈন্য। আটশ' ট্যাঙ্ক। তিনশ জঙ্গী

বিমান। **মিসর**ঃ ২৪০,০০০ সৈন্য। বারশ' ট্যাঙ্ক। চারশ পঞ্চাশ জঙ্গী বিমান। **জর্ডন**ঃ ৫০,০০০ সৈন্য। দু'শ ট্যাঙ্ক। চল্লিশ খানা জঙ্গী বিমান। **সৌদী আরব**ঃ ৫০,০০০ সৈন্য। একশ ট্যাঙ্ক। বিশ খানা জঙ্গী বিমান। **ইরাক**ঃ ৭০,০০০ সৈন্য। চারশ ট্যাঙ্ক। দু'শ জঙ্গী বিমাম। **আলজেরিয়া**ঃ ৬০,০০০ সৈন্য। একশ' ট্যাঙ্ক। একশ' জঙ্গী বিমান। **সিরিয়া**ঃ ৫০,০০০ সৈন্য। চারশ ট্যাঙ্ক। একশ কুড়ি জঙ্গী বিমান। **লেবানন**ঃ ১২,০০০ সৈন্য। আশীটি ট্যাঙ্ক। আঠারটি জঙ্গী বিমান। **কোয়েট**ঃ ৫,০০০ সৈন্য। চব্বিশটি ট্যাঙ্ক। ন'টি জঙ্গী বিমান।

ইস্রাইলের তুলনায় সম্মিলিত আরবের সামরিক শক্তি বেশী। কিন্তু তারা সত্যিকারে সম্মিলিত নয়। পাকাপোক্ত যৌথ কম্যাণ্ড গড়ে ওঠে নি। নাসের অনেকের চক্ষুশূল। তাঁর জাতীয়তাবাদ রক্ষণশীল শাসকদের মনে এনেছে সন্ত্রাস। মিশরের নেতৃত্বের ধ্বংস অনেকেরই কাম্য। জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সবাই দাঁড়িয়েছে নাসেরের পাশে। লড়াইএর ইচ্ছা অধিকাংশের নেই। ওরা চায় আরব দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের অবসান। নিজের হাতে নাসের খতম তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইস্রাইলীদের হাতে তাঁর পতন ঘটলে মনে মনে তারা খুশী। আধুনিক যুদ্ধের মানসিকতা এবং শিক্ষা আরব রাষ্ট্রগুলোর নেই। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তারা হাতে পেয়েছে। কিন্তু সার্থক প্রয়োগ বিদ্যা শেখেনি। সিরিয়া এবং ইরাকের যুদ্ধোন্মাদনা প্রবল। তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধও তীব্র। ইস্রাইলকে কাবু করতে হলে দরকার যৌথ পরিকল্পনা। বাক্‌যুদ্ধের আড়ম্বরে সামরিক প্রস্তুতি পড়েছে চাপা। মিশর ঠকেছে বহুবার। ১৯৫৬ সালে ইঙ্গ-ফরাসীর পরিকল্পনা ছিল রানওয়েতে মিশরীয় বিমান বহরের ধ্বংস সাধন। নির্বোধ সমর নেতারা আসন্ন আক্রমণের মুখে বিমানগুলো রেখেছিল কায়রোর বিমান ঘাঁটিতে। যন্ত্রপাতিগুলোর যথাযথ পরীক্ষার দরকারও কেউ বোধ

করেনি। রাত্রের অন্ধকারে বিমান চালাতে শেখেনি পাইলটরা। মার্কিন নাগরিকদের স্থানান্তর করা হচ্ছিল। তার জন্য বৃটিশ বোমাবর্ষণের বিলম্ব ঘটেছিল। এই সুযোগে বেশ কিছু বিমান অন্যত্র সরিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছিল মিশর। এই অপ্রত্যাশিত সুবিধা না এলে মাটিতেই মিশরীয় বিমান বহর ধ্বংস হত। এবারও নির্বুদ্ধিতার অভাব ছিল না সমর নায়কদের। সীমান্তে নিদারুণ উত্তেজনা। তবু কোন সতর্কতা নেই। চব্বিশ ঘণ্টা বিমান পর্যবেক্ষণের হুকুম দেয়নি কেউ। রানওয়েগুলোতে জঙ্গী বিমানগুলো গাদাগাদি করে সাজান। পাইলটরা গল্পগুজবে মত্ত। সৈন্যবাহিনীর প্রধানরা শান্তিকালীন মন্থরতায় আচ্ছন্ন। রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রস্তুতি বাড়েনি। কারিগরী বিদ্যার শিক্ষিত লোকের অভাব। আধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নেই। তাদের সমর নীতি ট্র্যাডিশন্যাল। নাসের একা। উপযুক্ত সহকর্মী তাঁর জোটেনি। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর তিনি রাজনীতিতে ডুবে আছেন। সৈন্যবাহিনীর উপর তদারকির সময় পাননি। ফিল্ড মার্শাল আমেরের উপর তিনি নির্ভরশীল। কিন্তু আমের অদূরদর্শী। আধুনিক সমর কৌশলের ছাপ তাঁর উপর পড়েনি। মিশরের সৌভাগ্য— রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সে পেয়েছে নাসেরকে। আর তার দুর্ভাগ্য—সামরিক নেতা হিসাবে পায়নি কাউকে।

ইস্রাইলের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সেনাপতিদের অনেকে দেখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গন। তারা লড়াই করেছেন। আধুনিক সর্বাত্মক যুদ্ধ বলতে কি বোঝায় তা সমর নায়করা জানেন। ইউরোপীর ইহুদীর মধ্যে অনেকে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল হিটলার বিরোধী পার্টিজান আন্দোলনে। সমর কৌশলের দিক থেকে নাৎসী জার্মানীর ষ্ট্র্যাটেজি ইস্রাইলের মডেল। ছোট একটা যান্ত্রিক সৈন্যদল প্রতিপক্ষের বড় সৈন্য বাহিনীকে অনায়াসেই ঘায়েল করতে সক্ষম। বেলজিয়ামের যুদ্ধে দেখিয়েছিল তা জার্মানী।

বৃটিশ, ফরাসী এবং বেলজিয়ান বাহিনী সম্মিলিতভাবে তৈরী ছিল জার্মান মোকাবিলায়। একটি আঘাতে তাদের ছত্রভঙ্গ করেছিল জার্মানী। বৃটিশ বাহিনী সরে এসেছিল ডানকার্কে। তারপর পাড়ি জমিয়েছিল বৃটেনে। মাথার উপর ছিল উন্মুক্ত আকাশ। জার্মান বিমান বহর যদি বোমাবর্ষণ করত তবে ডানকার্কেই ঘটত বৃটিশ বাহিনীর দ্বিতীয় বিপর্যয়। ইউরোপের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইস্রাইল গড়েছিল তার সৈন্যদল। তার সঙ্গে যোগ করেছিল স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট। সংগঠন চমৎকার। যান্ত্রিক কুশলতায় তারা সুনিপুণ। গতি দুর্বার। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্র্যাটেজি পরিবর্তনের প্রয়োজন। সমর নায়কেরা ওস্তাদ। যুদ্ধে ছত্রীবাহিনীর কার্যকারিতা ইস্রাইলীদের অজানা ছিলনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যাপক ভাবে ছত্রীবাহিনী ব্যবহার করেছিল জার্মানী। ১৯৫৬ সালে ইস্রাইলও ছত্রীসৈন্য নামিয়েছিল মিটলায়। এতসব দেখে শুনেও মিশরীয় সামরিক কর্তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। তারা গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তন করতে পারেননি।

ইস্রাইলের ইহুদী মাত্রই সৈনিক। সৈন্যদলে কাজ করা বাধ্যতামূলক। প্রত্যেকের কার্যকাল ত্রিশ মাস। ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হয় রিজার্ভ তালিকাভুক্ত। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে রিজার্ভিস্টরা আসে সিভিল ডিফেন্সের আওতায়। প্রতিরক্ষা বাহিনীর শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শারোণের হাতে। ১৯৫৬ সালে এঁর নেতৃত্বে ছত্রীবাহিনী দখল করেছিল মিটলা। সবাইকে প্রতিবছর ঝালাই করতে হয় সামরিক শিক্ষা। রিজার্ভিস্টদের বাৎসরিক শিক্ষার মেয়াদ ৪২ থেকে ৪৮ দিন। এন সিওদের ৩৬ দিন এবং সাধারণ নাগরিকদের ৩০ দিন। ন্যাশন্যাল সার্ভিসে মেয়েদের থাকতে হয় ১৮ মাস। রিজার্ভ তালিকাভুক্ত নারী কর্পোরেলদের বাৎসরিক শিক্ষার মেয়াদ ৩০ দিন এবং সার্জেণ্টদের ৪২ দিন।

চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে পারে ইস্রাইলী বাহিনীর একটা বড় অংশ। পূর্ণ সমাবেশে লাগে ৭২ ঘণ্টা। ইউনিট কম্যাণ্ডাররা টেলিফোনে কিম্বা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে আসে কোথায় এবং কখন তাদের হাজিরা দিতে হবে। যাদের দেখা মেলে না, হাজিরার স্থান এবং সময় জেনে নেওয়া তাদের দায়িত্ব। জরুরী অবস্থায় ওরা ব্যবহার করে সাংকেতিক বার্তা। বেতারে ঘোষণা করা হয় এসব বার্তা। সংশ্লিষ্ট নরনারী ছুটে আসে যার যার ঘাঁটিতে। ইউনিটগুলো জড় হয় সমাবেশ কেন্দ্রে। সেখান থেকে চলে যায় মূল শিবিরে। জোগাড় করে অস্ত্রশস্ত্র। সব সময় সঙ্গে থাকে বুট। অস্ত্রাগার থেকে এগুলো দেওয়া হয় না। সাঁজোয়া বাহিনীর রিজার্ভিস্টদের নিয়ম কড়া। প্রথম যাবে ওরা। দেয়ালে হুকে ঝুলান আছে প্রত্যেকের নাম লেখা ইউনিফরম এবং ট্যাঙ্কের নম্বর। বাইরে অপেক্ষা করে গাড়ী। ঝট্‌পট ওঠে গাড়ীতে। তারপর যুদ্ধযাত্রা।

জেনারেল দেয়ান জানেন, তার শক্তির উৎস। সারা ইস্রাইল একটি সৈন্যশিবির। প্রত্যেকটি বৃত্তির নরনারী সৈনিক। আহ্বান এলেই সব ছেড়ে সবাই ছোটে রণক্ষেত্রে। আক্রমণের প্রতিটি পরিকল্পনা সযত্নে তৈরী। বিমান বহরের উপর কঠিন দায়িত্ব। ওরা হানবে প্রথম আঘাত। মিশরের অরক্ষিত আকাশের নীচে এগিয়ে যাবে সৈন্যদল। তাঁর বাহিনী আগ্রাসী। আমেরিকা নিয়েছে ইস্রাইলের পক্ষ। বৃটেন রয়েছে পিছনে। সোভিয়েট রাশিয়া হয়ত হস্তক্ষেপ করবে না। তারও আছে মার্কিন ভীতি। অন্যান্যের মতামতের বাস্তব মূল্য নেই। ইস্রাইলের ভৌগোলিক অবস্থান আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতিকূল। তাকেই প্রথম আক্রমণ করতে হবে। ইস্রাইল লড়বে অন্যের জমিতে। নাসের যদি আগে আঘাত হানতেন তবে ইস্রাইলের আত্মবিশ্বাস হয়ত অনেকখানি কমে যেত। কিন্তু মিশর সুযোগ হারিয়েছে।

বিশ্ববিবেক তাকে পেয়ে বসেছে। কোনমতেই সে আগ্রাসী সাজবে না। ইস্রাইলের বিবেকের বালাই নেই। তার সঙ্কল্প—মারি অরি পারি যে কৌশলে। জেনারেল দেয়ান এ নীতির রূপকার। বিমান ঘাঁটিতে ইস্রাইলী বৈমানিকেরা উত্তেজনায় কাঁপছে। বিমানগুলো রানওয়েতে তৈরী। আকাশে টহলদারী বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। কান পেতে শুনছেন জেনারেল দেয়ান। দেয়ালে ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। আর মাত্র ক' ঘণ্টা। তারপর অপেক্ষার বিরাম। কাজ আরম্ভ। জুন মাসের চার তারিখ। রাত্রিটা ভয়ানক। কাটতে চায় না। সূর্যের রক্তমুখ দেখতে ইস্রাইল পাগল।

ঊনত্রিশ

১৯৫৫ সালের পাঁচই জুন সোমবার। সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ। সুয়েজের উপর পাতলা কুয়াশার পর্দা কেটে এসেছে। পূব আকাশ লাল। সূর্যের রশ্মি কোণাকোণি ভাবে পড়েছে কায়রোর বিমান ঘাঁটির রানওয়েগুলোর উপর। দু' তিনটা মিগ দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন সময় আকাশে উড়বার জন্য তৈরী। মিশরীয়দের অফিস আরম্ভ সকাল ন'টায়। বিমান বহরের বড় কর্তারা সাজগোছ করছেন। আর ক'মিনিটের মধ্যেই দপ্তরে হাজির হবেন। পাইলট এবং বিমান ঘাঁটির কর্মীরা কর্মস্থলে পৌঁছে গেছে। দু একটি জঙ্গী বিমান টহল শেষ করে ফিরে আসছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গেছে। কায়রো সহর জেগেছে।

ইস্রাইলী ঘড়িতে সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ। ওদের ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছনে চলে। রাত্রি চারটা থেকে পাইলটরা বসে তাদের ডিউটি রুমে। চোখে ঘুম নেই। যে কোন সময় বিমান নিয়ে আকাশে উঠবার হুকুম আসবে। রানওয়েতে জঙ্গী

বিমানগুলো অপেক্ষা করছে। যাত্রা আরম্ভের জন্য এগুলো তৈরী। ইস্রাইলী বিমান বহরের অধ্যক্ষ জেনারেল হোড কম্যাণ্ড সেণ্টারে বসে আছেন। বারে বারে ঘড়ি দেখছেন। তিনি শান্ত এবং সংযত। টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিলেন জেনারেল হোড। মাত্র দু'টি কথা বলে রিসিভার রেখে দিলেন। বিমানগুলোর ইঞ্জিন গর্জে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে আকাশে উড়ল। একটি পাক খেয়ে জোট বেঁধে চলল। প্রথমে এক ঝাঁক তারপর এক ঝাঁক—এমনি করেই বিমানগুলো বেরিয়ে পড়ল। খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এগুলো। হঠাৎ তারা ডানদিকে ঘুরল। মাত্র ত্রিশ ফুট নীচে থৈথৈ করছে ভূমধ্যসাগরের জল। ওরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্য সোজা পথ নেয় নি। অর্দ্ধবৃত্তা-কারে ভূমধ্যসাগর ঘুরে যাচ্ছে। চারদিকে ছড়ান রয়েছে মিশরীয় রাডার। ফাঁকি দেওয়া মুস্কিল। বিমানগুলো খুব নীচুতে। রাডারে ধরা পড়ছে না। কৌশল পুরনো। ভিয়েতনামে মার্কিন বৈমানিকরা নিয়েছিল এ কৌশল। ইস্রাইলী বিমানবহরে আছে ভিয়েতনাম ফেরতা ইহুদী বৈমানিক। এরা মার্কিন নাগরিক। মিশর তা জানত। নাসের অনেক আগেই প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে। কর্তৃপক্ষ উচ্চবাচ্য করেন নি। ১৯৫৫ সালে পাক-ভারত লড়াই এর সময় পাক-বৈমানিকেরাও বড় বড় গাছের মগডাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চালিয়েছিল তাদের সেবার জেট। ছোট, মন্থরগামী এবং নীচুতে উড়তে অভ্যস্ত ভারতের ন্যাটের হাতে খেয়েছিল প্রচণ্ড মার। মিশরের উপকূল দরিয়ার কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর। সঙ্গে আছে বিমানবাহী জাহাজ। গোয়েন্দা জাহাজ লিবার্টি কাছাকাছিই অবস্থান করছে। ভূমধ্যসাগরের বৃটিশ নৌবহরকে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছে। গত ক'দিন ধরে মল্টায় নোঙ্গর করে ছিল বিমানবাহী জাহাজ ভিক্টোরিয়া এবং এডেনে হার্মিস। ওদের সাম্প্রতিক গতিবিধির খবর রাখত না মিশর। মার্কিন বিমানবাহী জাহাজগুলোর কর্মতৎপরতা বেড়ে

গেছে। ডেক থেকে জঙ্গী বিমান উঠছে এবং নামছে। দু'টি সোভিয়েট ডেস্ট্রয়ার তাদের অনবরত হয়রানি করছে।

মিশরীয় বিমান বহরের কর্মীরা নিশ্চিন্ত। রাডারে কোন বিন্দু দেখা যাচ্ছে না। বৈমানিকরা খোশগল্পে মত্ত। বড়কর্তারা দপ্তরে হাজির হন নি। একটু পরেই হয়ত এসে পড়বেন। হঠাৎ শোনা গেল উড়ন্ত বিমানের বিকট গর্জন। কায়রোর বিমান ঘাঁটির টাওয়ার থেকে দেখা গেল এক ঝাঁক বিমান এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বাজল। চোখের পলকে ওরা একেবারে মাথার উপর এসে পড়ল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। বোমা ফাটছে। ওরা ছুঁ মেরে বোমা ফেলছে। রানওয়েতে সাজিয়ে রাখা মিশরীয় জঙ্গীবিমান-গুলো জ্বলছে। দশ মিনিট পরে আবার আক্রমণ। ইস্রাইল যুদ্ধে নেমেছে। একই সময়ে সে এল আরিশ, গেবেল লিবনি, বীর গিফগাফা, বীর আমাদা, আবু সুদর, কাব্রিট, ইঞ্চাশ, পশ্চিম কায়রো, বেনী সুইফ এবং ফেইদ বিমানঘাঁটির উপর হানা দিয়েছে। মিশরীয় বিমান বহর প্রতিরোধের সময় পায়নি। আক্রমণ অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সময় জাপানীদের পার্লহারবার আক্রমণের মতই এ আক্রমণ চাতুর্যভরা। আন্তর্জাতিক বিশ্বাসঘাতকতার আর একটি ন্যক্কারজনক নিদর্শন।

ইস্রাইলীরা ব্যবহার করছিল নূতন ধরণের বোমা। রানওয়েগুলো অকেজো করে ফেলতে এগুলো ছিল সাংঘাতিক। বিমান থেকে বোমাগুলো পড়ত রানওয়ের উপরে। সরাসরি মাটিতে ঢুকে যেত। কতগুলো ফাটতো দু চার মিনিটের মধ্যেই। আবার বেশী সময় নিত কোন কোন বোমা। বিমান আক্রমণের পর অনেকক্ষণ ধরে চলত বোমা বিস্ফোরণ। বড় বড় গর্ত হয়ে যেত রানওয়েগুলোতে। যখন তখন বিস্ফোরণের জন্য তাড়াতাড়ি মেরামত সম্ভব হত না। ১৯৫৬ সালে সুয়েজের লড়াইএর সময় বৃটিশ বিমান বহর মিশরের বিমান ঘাঁটিগুলোতে ফেলেছিল এ ধরণের বোমা।

ইস্রাইল নিয়েছিল বৃটিশ টেকনিক। রানওয়েগুলো অকর্মণ্য করার পর বিমান ধ্বংসের পালা। বিমান ঘাঁটিগুলোর মিশরীয় রক্ষীরা প্রথমে ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের জন্য তারা তৈরী নয়। কর্তৃপক্ষ তাদের সতর্ক করে দেননি। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ওরা দৌড়ে পালাচ্ছিল। প্রথম আক্রমণ শেষ হবার প্রায় দশ মিনিট পরেই এসেছিল দ্বিতীয় আক্রমণ। শৃঙ্খলার অভাবে মিশরীয় বিমানঘাঁটির কর্মীদের মধ্যে মরেছিল অনেকে। পরে গুছিয়ে নিয়েছিল যে যার ঘাঁটি। যে ক'টি বিমান বিধ্বংসী কামান বেঁচেছিল তা দিয়ে মরিয়া হয়ে গোলা ছুঁড়ছিল ওরা শূন্যে। ঘায়েল করেছিল গোটাকয় ইস্রাইলী বিমান। মিশরীদের হাতে ছিল এস এ-২ রকেট। চার হাজার ফুটের নীচে এগুলো বিশেষ কার্যকর হয় না। রকেটগুলো যত উপরে ওঠে তত তার গতিবেগ বাড়ে। ইস্রাইলী বিমানগুলো উড়ছিল খুব নীচু দিয়ে। দু চারটি রকেটও ছেড়েছিল মিশরীয় সৈন্যরা। কিন্তু এগুলো এড়াতে ইস্রাইলী বৈমানিকদের তেমন কোন অসুবিধা হয়নি।

উত্তর মিশরের বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর বাড়ছে ইস্রাইলী আক্রমণের প্রচণ্ডতা। বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো ক্রমেই স্তব্ধ হয়ে আসছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। টাওয়ার ধ্বংসস্তূপে পরিণত। দক্ষিণাঞ্চলের হারঘাদা বিমানঘাঁটি অক্ষত। সেখান থেকে উড়ল বারটি মিশরীয় মিগ। ধাওয়া করল কায়রোর দিকে। সুরু হল বিমান লড়াই। ঘিরে ধরল তাদের পঞ্চাশটি শত্রু বিমান। ওরা ক'খানা ইস্রাইলী বিমানে আগুন জ্বালিয়ে নিজেরাও জ্বলে উঠল। দক্ষিণের বিমান ঘাঁটিগুলোতে বিমানের সংখ্যা কম। আরও চারটি মিগ কায়রো রক্ষায় এগিয়ে এল। ক'মিনিটের মধ্যে ঘায়েল করল দুখানি ইস্রাইলী বিমান। অসম লড়াই। এতগুলো শত্রু বিমানের বিরুদ্ধে মাত্র চারখানা মিগ বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। এগুলোও গুলি খেয়ে জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে থুবড়ে

পড়ল। মিশরীয় বিমান ঘাঁটিগুলো পাচ্ছিল বিভিন্ন ধরনের অবাস্তব নির্দ্দেশ। এগুলো কার্যকর করার অর্থ আত্মহত্যা। কর্মীরা ভাবল—উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হয়ত পাগল হয়ে গিয়েছেন। তাদের মাথার ঠিক নেই।

ইস্রাইলীরা প্রয়োগ করেছিল ইলেকট্রোনিক যান্ত্রিক কৌশল। রাডারগুলোকে এবং শত্রুপক্ষের বৈমানিকদের বিভ্রান্ত করার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এ কৌশল নিয়েছিল মিত্রপক্ষ। তাছাড়া জার্মানী এবং মিত্রপক্ষ সমভাবেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহার করেছিল উচ্চ শক্তিশালী সংবাদ প্রেরকযন্ত্র। নাৎসী জার্মানী থেকে পলাতক জার্মান ভাষাভাষী ইহুদীদের কাজে লাগিয়েছিল বৃটেন। ওরা কাজ করত বৃটিশ বেতার কেন্দ্রগুলোতে। জার্মান পাইলটরা আকাশ থেকে যে তরঙ্গে কথাবার্তা বলত সদর ঘাঁটির সঙ্গে, ঠিক সেই তরঙ্গে বিশুদ্ধ জার্মান ভাষায় ইহুদী অপারেটররা নির্দ্দেশ পাঠাত জার্মান বৈমানিকদের কাছে। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। আসল নকল নির্দ্দেশের ভেদাভেদ বুঝতে সময় লাগত। মিশরের উপর বিমান আক্রমণের সময় ইস্রাইলীরা কাজে লাগিয়েছিল এই কৌশল। পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দরকার যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। মিশরীয়দে র তা ছিল না। সূচনাতেই ওরা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল।

মিশরীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের বিমান যুদ্ধের ধারণা গতানুগতিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্যায় তাদের মডেল। লড়াই আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিবদমান দুপক্ষের বিমান উঠবে আকাশে। ধরা পড়বে রাডারে। শূন্যে চলবে বিমানে বিমানে লড়াই। মিশরের ভূভাগ বড়। বিমান ঘাঁটির সংখ্যা বেশী। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের বিমান ঘাঁটিগুলো তার আওতায়। তেল-আবিবের মর্মস্থলে আঘাত হানতে অসুবিধা কিছু নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এবং তার পরে যেসব যান্ত্রিক কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর খোঁজ-খবর

মিশরীয় সমর নায়করা রাখতেন না। এই দুর্বলতার চরম সুযোগ নিয়েছিল ইস্রাইল।

বেলা বাড়ছে। ইস্রাইলী বৈমানিকরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা আসছে, বোমা ফেলছে এবং চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাধা পাচ্ছে। দু একটি করে বিমান খোয়াচ্ছে। আশী মিনিট ধরে চলছে আক্রমণ। তারপর দশ মিনিট বিরাম। আবার আশী মিনিট অবিরাম বোমাবর্ষণ। ভারতের উপর ওদের ভারী রাগ। রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটি কনভয় রওনা হয়েছিল রাফায়। বিশ্বসভার সব রকমের নিদর্শন ছিল গাড়িগুলোর গায়ে। চিনতে অসুবিধা নেই কিছু। ইস্রাইলী জঙ্গী বিমান কনভয়ের উপর ফেলল বোমা। মরল তের জন জওয়ান। হেলবানে ছিল বিমান কারখানা। ভারত-মিশরের যৌথ উদ্যোগে তৈরী হচ্ছিল জেট বিমান। ইস্রাইলীরা চুরমার করল এ কারখানা।

সকালের দিকে উত্তর মিশরের দশটি বিমানঘাঁটি ছিল প্রথম ইস্রাইলী আক্রমণের লক্ষ্য। পরে ওরা ধাওয়া করল দক্ষিণে। ধ্বংস করল মানসুরা, হেলবান, এল মিনিয়া, আলমাজা, লাক্সোর, দেবেরসোইর, হারঘাদা, রাস বানাস এবং কায়রো ইণ্টারন্যাশন্যাল বিমানঘাঁটি। মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে উনিশটি বিমানঘাঁটি বিধ্বস্ত হল। রানওয়েগুলো অকর্মন্য হয়ে পড়ল। অধিকাংশ মিশরীয় বিমান চুরমার হয়ে গেল মাটিতে। টাওয়ার, রাডার স্টেশন, হ্যাঙার— সব বিপর্যস্ত। রানওয়েগুলোতে আসল বিমানগুলো জ্বলছে। অক্ষত রয়েছে শুধু নকলগুলো। ইস্রাইলী গোয়েন্দা দপ্তর নিপুণ। সব খবর সংগ্রহ করেছিল আগে থেকেই। আক্রমণ চালাবার সময় জ্বলন্ত বিমান থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনাকয় ইস্রাইলী পাইলট। তাদের একজনের পকেটে পাওয়া গেল মিশরীয় বিমান ঘাঁটিগুলোর নিখুঁত ছবি। অনেক উঁচু থেকে নেওয়া এগুলো। মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ইউ-২ ছাড়া আর কারও পক্ষে এধরনের

ছবি তোলা অসম্ভব। ইস্রাইলের হাতে ইউ-২ নেই। এ ছবিগুলো সে পেল কোথায়? মিশরীয় কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করলেন: ইউ-২ গোয়েন্দাগিরি চালিয়েছে। মিশরের সামরিক ঘাঁটিগুলোর ছবি তুলে সি আই এ ইস্রাইলে পাচার করেছে। এটা তাদের পক্ষে নূতন নয়। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ লড়াইএর কিছুদিন আগে ইউ-২ মিশরের উপর উড়ে বেড়িয়েছিল। জোগান দিয়েছিল সামরিক গোপন তথ্য ফ্রান্সকে। এসব কারসাজির কথা প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার নিজেও জানতেন না। পরে প্রকাশ পেয়েছিল সব।

মিশরীয় বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর ইস্রাইলী আক্রমণের পর চার ঘণ্টা চলে গেছে। সিরীয় বিমান বহরের দেখা নেই। দুপুরের পর ওরা বোমা ফেলল ইস্রাইলের হেইফা তৈল শোধনাগারের কাছে। আক্রমণ করল মেগিদ্দো বিমানঘাঁটি। মাটিতেই জ্বলে উঠল গোটাকয় ইস্রাইলী বিমান। ইস্রাইলী বিমান বহর পাল্টা আক্রমণ চালাল দামাস্কাসের বিমানঘাঁটির উপর। জর্ডন বিমান বহর বোমা ফেলল কেফের সিরকিন বিমান ঘাঁটিতে। ধ্বংস করল ক'টি পরিবহন বিমান। ইস্রাইলী বিমান বহর গুড়িয়ে দিল জর্ডনের মাফ্রাক এবং আম্মান বিমানঘাঁটি। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল আজলুনের জর্ডনী রাডার স্টেশন। ইরাকী বিমান বহরের পাত্তা নেই। সারাদিন রাত মিশরের উপর চলল ইস্রাইলী বিমান বহরের অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ। কোন বাধা নেই সেখানে। রানওয়েগুলোতে সৃষ্টি হল বড় বড় গর্ত। বিশেষ ধরণের টাইম বোমাগুলো মাটির মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে হচ্ছিল বিস্ফোরণ। তাড়াতাড়ি মেরামত অসম্ভব।

ইস্রাইলী বিমান আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় অকেজো হয়ে পড়েছিল মিশরীয় বিমান বহর। কায়রো আক্রান্ত হবার দু' ঘণ্টার মধ্যেই জ্বলে উঠল নেগেভ সীমান্ত। আধঘণ্টা ধরে চলল মিশরীয় সামরিক ঘাঁটিগুলোর উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। বিমান বিধ্বংসী

কামানের গোলায় ছেয়ে গেল আকাশ। মিশরীয় সৈন্যরা অসহায়। ঘন ঘন তাকাচ্ছে দিগন্তে। তাদের বিমানগুলো সাহায্যের জন্য ছুটে আসছে না। ওরা জানত না মাত্র দু' ঘণ্টা আগে কি অঘটন ঘটে গেছে। বিমানের ছত্রছায়া মিশরীয় বাহিনী আর পাবে না। তিনটি ইস্রাইলী ডিভিসন অতিক্রম করল সীমান্ত। জেনারেল টালের নেতৃত্বে একটি সাঁজোয়া ডিভিসন ছুটে চলল খান ইউনিসের দিকে। বীরশেবা থেকে সুরু হয়েছিল তাদের অভিযান। প্রথম লক্ষ্য খান ইউনিস দখল। জেনাবেল ইউফি তাঁর বাহিনী নিয়ে তৈরী ছিলেন নিৎসানার কাছাকাছি অঞ্চলে। তিনি এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন তাঁর সৈন্যদলকে। এদলের প্রাথমিক লক্ষ্য আবু এঘেইলা। তৃতীয় ডিভিসনের ভার ছিল জেনারেল শারোণের উপর। নেগেভের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে সৈন্য পরিচালনা করলেন তিনি কুনটিল্লার দিকে। প্রচণ্ড বাধার মধ্যে তারা এগিয়ে চলল। সুরু হল গোটা সিনাই দখলের লড়াই।

ইস্রাইলী নৌবহর ক্ষুদ্র। তুলনায় মিশরীয় নৌবহর বড়। সোমবার সন্ধ্যার অন্ধকারে ওরা হানা দিল পোর্ট সৈয়দে। মিশরের হাতে আছে রকেটবাহী জাহাজ। হাজার পাউণ্ড বিস্ফোরক নিয়ে রকেটগুলো যেতে পারে ৩৫ মাইল। ইস্রাইলের ভয়, এগুলো বন্দর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে তেল আবিব রকেটের পাল্লার মধ্যে পড়বে। ইস্রাইলী নৌবহর পাহারা দিচ্ছিল পোর্ট সৈয়দের প্রবেশ মুখ। ইস্রাইলী যুদ্ধ জাহাজ দেখেই বন্দর থেকে বেরিয়ে এল মিশরীয় যুদ্ধজাহাজ। অমনি সুরু হল বিমান আক্রমণ। ইস্রাইলী যুদ্ধজাহাজ থেকে চলল গোলা। মাথার উপর বিমানছত্র নেই। মিশরীয় নাবিকেরা অসহায়। জাহাজ নিয়ে আবার ঢুকে পড়ল ওরা বন্দরে নিরাপদ আশ্রয়ে।

সকালে বেজে উঠেছিল সাইরেন। জনতা বুঝেছিল বিপদ আসন্ন। অতর্কিত ইস্রাইলী আক্রমণের কথা তাদের মনে আসেনি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা শুনল বেতার ঘোষণা—ইস্রাইল লড়াই সুরু করেছে। তারা মিশরীয় বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর অবিরাম আক্রমণ চালাচ্ছে। ঘোষণার পর সামরিক সঙ্গীত এবং বাজনা। আবার ঘোষণা—আকাশে প্রচণ্ড লড়াই সুরু হয়েছে। বিমান বিধ্বংসী কামান গর্জে উঠেছে। শত্রু-বিমান শূন্যে গুড়িয়ে যাচ্ছে। সঙ্কটের গুরুত্ব জনসাধারণ বোঝেনি। নিজেদের বিমান শক্তির উপর তাদের ছিল অগাধ আস্থা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটছে। তেল আবিব নিশ্চিহ্ন হবার কোন খবর আসছে না। জনতা ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। মন তাদের শক্ত। শত আঘাতেও ওটা দুমড়ায় না। দুপুরে মিশরীয়রা শুনল বৃটিশ, মার্কিন এবং ইস্রাইলী বিমান বহর একযোগে মিশরের উপর হানা দিয়েছে। নাসের নিজেও বিশ্বাস করতেন এই ষড়যন্ত্রের কথা। ইস্রাইল এত বিমান পেল কোথায়? নিজের আকাশ পাহারা দেবার জন্য ক'টি বিমান সে রেখেছিল? বিরাট এলাকা জুড়ে অবিশ্রান্ত বিমান আক্রমণ চলছে। হিসাব অনুযায়ী ইস্রাইলের বিমান সংখ্যা মাত্র তিনশ'। তার মধ্যে বেশ কিছু খোয়া গিয়েছে। তা সত্বেও আক্রমণের বিমান নেই। ইস্রাইল হয়ত গোপনে বেশী পরিমাণ বিমান সংগ্রহ করেছিল। এ কাজে তার মদতদাতা আমেরিকা। যদি সে বেশী বিমান সংগ্রহ নাও করে থাকে তবে বৃটিশ এবং মার্কিন বিমান ইস্রাইলী ছাপ লাগিয়ে হানাদারীতে যোগ দিয়েছে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ লড়াইএর সময় একাণ্ড করেছিল ফ্রান্স। মিশরীয় দরিয়ার কাছাকাছি মার্কিন বিমানবাহী জাহাজগুলো কি করছে? বৃটেনের ভূমধ্যসাগরীয় বাহিনীই বা কোথায়? নাসের ভাবছিলেন এসব কথা। সোভিয়েট নৌবহর অবশ্যই ইঙ্গ-মার্কিন নৌবহরের উপর নজর রাখছে। তারা কোন সংঘর্ষে জড়াবে না। নাসেরের দৃঢ় প্রত্যয়, মিশরের উপর ইস্রাইলী বিমান হানায় ইঙ্গ-মার্কিন যোগসাজস রয়েছে। বেতারে

ঘোষিত হল অভিযোগ। বিশ্বাস করল আরব জনতা। সৈন্য পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিল সুদান। আলজেরিয়ার সৈন্যরা রওনা হল মিশরে। ফ্রান্স সফরে গেছেন সৌদী আরবের বাদশা ফয়জল। প্যারিস থেকেই তিনি ঘোষণা করলেন, সৌদী বাহিনী জর্ডনের পথে।

ইস্রাইলী আক্রমণ আরম্ভের দু'ঘণ্টার মধ্যে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল যুদ্ধের সংবাদ। আটলান্টিকের ওপাড়ে রাত্রি তখন আড়াইটা। প্রেসিডেন্ট জনসনের সহকারী ওয়াণ্ট রোসটো মার্কিন নিরাপত্তা দপ্তরের কর্তাব্যক্তি। তাঁকে ডেকে তুললেন ডিউটি অফিসার। রোসটো ছুটে গেলেন হোয়াইট হাউসে। প্রেসিডেন্ট জনসন ঘুমুচ্ছেন। তাঁকে জাগান হল। প্রেসিডেন্ট পেলেন আরব-ইস্রাইল লড়াইএর খবর। সকাল আটটায় ম্যাক-নামারা, রোসটো এবং খৃষ্টিয়ানকে নিয়ে জনসন বসলেন বৈঠকে। মার্কিন নীতি নির্দ্ধারণের জন্য চলল আলোচনা। দুপুরে প্রচার দপ্তর ঘোষণা করল—চিন্তায়, কথায় এবং কাজে আমেরিকা থাকবে নিরপেক্ষ। মার্কিন ইহুদীরা চটল। সিনেট সদস্যদের একাংশ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। ইস্রাইলকে সাহায্য করবার বহু প্রকাশ্য এবং গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মার্কিন সরকার। এখন সাজছেন নিরপেক্ষ। বিকেলে প্রেসিডেন্ট, জনসন মত পাল্টালেন। তাঁর নীতির নূতন ব্যাখ্যা সংযোজিত হল। তিনি বললেন—বিবদমান কোন পক্ষেই যোগ দেবে না আমেরিকা। স্বস্তি পরিষদের মাধ্যমে শান্তি এবং যুদ্ধবিরতি তার লক্ষ্য।

বৃটেনে চলছিল কমন্সসভার অধিবেশন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্রাউন বললেন—কোন পক্ষই নেবে না বৃটেন। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘটাতে হবে। কে প্রথম আক্রমণ করেছে তা তিনি বলতে পারছেন না। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাঁর হাতে নেই।

সকাল পৌনে এগারটায় (মস্কোর সময়) খবর পেলেন

কোসিগিন। গোটা সোভিয়েট রাশিয়া রাগে ফেটে পড়ল। মস্কো বেতার উত্তাল হয়ে উঠল। বিঘোষক বারবার বলতে লাগলেন—ইস্রাইল আক্রমণকারী। বিক্ষোভ দানা বাধল জনতার মধ্যে। সহস্র কণ্ঠের ধিক্কারধ্বনি শোনা গেল। তাস জানালেন—সোভিয়েট সরকার কঠোর মনোভাব নিয়েছেন। অবস্থার মোকাবিলায় যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁরা তৈরী। ওয়াশিংটনে সোভিয়েট টেলেটাইপ মেসিনে হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল। সিরিলিক হরফে লেখা পড়তে লাগল। অনুবাদ করে এগুলো পাঠান হল হোয়াইট হাউসের আর একটি মেসিনে। মার্কিন প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্রে নিদারুণ উত্তেজনা। মস্কো ব্যবহার করেছেন হটলাইন। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে দেখা দিয়েছিল কিউবা সঙ্কট। আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার লড়াই বাধবার উপক্রম। সঙ্কট এড়াবার পরই মস্কো ওয়াশিংটনের মধ্যে বসান হয়েছিল হটলাইন। ভুল বোঝাবুঝির ফলে যাতে যুদ্ধ না লাগে তার জন্যই এ ব্যবস্থা। এতদিন নীরব ছিল এ লাইন। ১৯৬৭ সালের পাঁচই জুন হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠেছে হটলাইন। কোসিগিন পাঠিয়েছেন বার্তা—মার্কিন সরকার ইস্রাইলের পক্ষে সামরিক সক্রিয়তা দেখালে বিপদ অনিবার্য। হস্তক্ষেপ করবে সোভিয়েট রাশিয়া। মস্কো-ওয়াশিংটন হটলাইনে বার্তা বিনিময়ের খবর আঘাত হানল বৃটিশ মর্যাদায়। মস্কো--লণ্ডনের মধ্যেও রয়েছে হটলাইন। লণ্ডনের আগ্রহেই তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মস্কো-ওয়াশিংটন হটলাইন গরম, আর মস্কো-লণ্ডন হটলাইন ঠাণ্ডা। এ অপমান সহ্য করা যায় না। বৃটেনেও দাবী উঠল—হটলাইন ব্যবহার কর। নইলে আন্তর্জাতিক প্রেষ্টিজ থাকে না। দুনিয়ার লোক ভাববে—দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি বৃটেন। আন্তর্জাতিক সঙ্কট মোচনে তার কোন গুরুত্ব নেই। সোভিয়েট রাশিয়া কোন পাত্তা দেয় না গ্রেটবৃটেনকে। কার সঙ্গে হবে হটলাইনের বার্তা বিনিময়?

আপাতত ওটা পড়েই রইল। মৃতযন্ত্রে প্রাণসঞ্চার করা গেল না। হাতের কাছে হট লাইন থাকা সত্ত্বেও প্রেষ্টিজ বাড়াবার সুযোগ পেল না বৃটেন। প্রেসিডেণ্ট দ্যগল স্পষ্টভাষী। কারও তোয়াক্কা করেন না তিনি। তাঁর প্রধানমন্ত্রী জর্জ পম্পিদু ইস্রাইল প্রেমিক। কিন্তু দ্যগলের বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাঁর নেই। যুদ্ধ আরম্ভের সংবাদ প্যারিসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল মহলে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেছে। অনেকে রাস্তায় নেমে এসেছে। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ অভিযানকারীরা আওয়াজ তুলেছে—জয়তু ইস্রাইল। অচঞ্চল দ্যগল ঘোষণা করলেন—আরবদের সঙ্গে ইস্রাইলের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ইস্রাইল মাত্র সেদিনের রাষ্ট্র। তার সঙ্গে ফ্রান্সের যোগাযোগ ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেনি। ১৯৫৬ সালের ঘটনা প্রক্ষিপ্ত। মূল ধারার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আক্রমণকারীকে ফ্রান্স সমর্থন দেবে না।

ভারতের কাছে মিশরের অফুরন্ত প্রত্যাশা। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সঙ্কটে নেহরুর অবদানের কথা তার মনে আছে। মিশরের জনতা শুনতে চায় ভারতের মতামত। ওরা পাগল হয়ে উঠেছে। বৃটিশ এবং মার্কিন দূতাবাস, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতি সব ধ্বংস করছে। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রেও চলছে আরব জনতার মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। বৃটেন এবং আমেরিকা তাঁদের শত্রু। তাদের দূতাবাস-গুলোর উপরই চড়াও হচ্ছে উন্মত্ত জনতা। ভারতের জনতাও ক্রোধে ফেটে পড়ছে। সর্বত্র সুরু হয়েছে বিক্ষোভ। লোকসভার অধিবেশন বসেছে দিল্লীতে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ভিতরে ভিতরে জ্বলছেন। তাঁর মুখে চোখে প্রচণ্ড ঘৃণা। ইস্রাইল আগ্রাসী। অতর্কিত আক্রমণ হেনেছে সে মিশরের উপর। রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধি পেয়েছেন দিল্লীর নির্দ্দেশ। প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন। মুখ খুলছেন না। হয়ত তথ্যাদির জন্য অপেক্ষা করছেন।

স্বস্তি পরিষদের জরুরী বৈঠকের দাবী জানাল ভারত। যথারীতি

বৈঠক সুরু হল। ভারতীয় প্রতিনিধি পার্থসারথি উত্থাপন করলেন প্রস্তাব—ইস্রাইল আক্রমণকারী। তার কাজ নিন্দার যোগ্য। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি দরকার। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে বিবদমান পক্ষগুলো ফিরে যাবে ৪ঠা জুনের সীমান্তে। তাঁকে সমর্থন করল সোভিয়েট রাশিয়া। বেঁকে বসল আমেরিকা এবং বৃটেন। তাদের বক্তব্য—নিন্দা করা চলবে না ইস্রাইলকে। বিবদমান বাহিনীগুলোর যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। সৈন্যাপসারণের প্রশ্ন আসবে পরে। এখন শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতি। পাঁচজন স্থায়ী এবং দশজন অস্থায়ী সদস্য নিয়ে গঠিত সেদিনের স্বস্তি পরিষদ। স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতৈক্য দরকার। তা না হলে আসবে ভিটো। সংখ্যাধিক্যের মতামত অচল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলছে বিতর্ক। অনেকখানি আরবভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে ইস্রাইল। যুদ্ধের আগের সীমান্তে তাকে ফিরিয়ে দিতে না পারলে সে অধিকৃত এলাকায় গেড়ে বসবে। সুবিধাজনক অবস্থান থেকে করবে দর কষাকষি। আগ্রাসীকে লুটের মাল ভোগের সুযোগ দেওয়া অন্যায়। ইস্রাইলী প্রতিনিধির বক্তৃতা চমকপ্রদ। দিনকে রাত করে ফেললেন তিনি। তার কথা—ইস্রাইল আগে আক্রমণ করেনি। মিশরীয় বাহিনীই প্রথম আক্রমণ চালিয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা আক্রমণের ঝুঁকি নিয়েছে ইস্রাইল। ন্যাকা সাজল বৃটেন এবং আমেরিকা। তাদের মনেও নাকি সংশয়—কে আক্রমণকারী? ওদের বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা দপ্তরও আক্রমণকারীকে খুঁজে বার করতে পারেনি। তাজ্জব বনল সবাই। দুনিয়া জানল, ইস্রাইল আক্রমণকারী। জানল না শুধু বৃটেন এবং আমেরিকা। বিতর্কের শেষ নেই। ঘরোয়া আলোচনার জন্য স্বস্তি পরিষদের বৈঠক স্থগিত রইল। পাঁচই জুন কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারলনা বিশ্বসভার এই ক্ষুদে সংস্থা। আকারে ছোট, দাপটে বড়। কার্যকর ব্যবস্থা রূপায়ণের ক্ষমতা শুধু এরই আছে, সাধারণ

পরিষদের নেই। সাধারণ পরিষদের হাতে যা আছে তা খুবই সীমিত।

ওদিকে সিনাইএর মরুভূমি জ্বলছে। যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো ভিয়েনায় সফররত। সেখানেই তিনি শুনলেন মিশরের উপর ইস্রাইলী আক্রমণের সংবাদ। টিটো প্রতিশ্রুতি দিলেন নাসেরকে। ইস্রাইলের বিরুদ্ধে তাঁর ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে সব সময়ই মদত দেবে যুগোশ্লাভিয়া। আফ্রিকার প্রগতিবাদী রাষ্ট্রগুলো ইস্রাইলী দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। আফ্রো-এশিয়ার বড় দুর্বলতা তাদের প্রচারযন্ত্র। আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার হাতে। তাদের দেওয়া সংবাদের উপর দেশী পত্রিকাগুলো নির্ভরশীল। সংবাদপত্র জগতে ইহুদীলবী প্রবল। সঠিক সংবাদ পাওয়া দুঃসাধ্য। যা জোটে তা ইউরোপ ঘেষা। মাথাকুটে বার করতে হয় সত্য ঘটনা। জনমত গঠনের দায়িত্ব যাদের উপর তারা দুনিয়াটাকে ইউরোপীয় দৃষ্টি দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। এশিয়া কিম্বা আফ্রিকার যে কোন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সংকটে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে বার বার। আরব-ইস্রাইল লড়াইএ তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মিশরীয় সামরিক সদর দপ্তরের কর্তারা দিশাহারা। সুপ্রীম কম্যাণ্ড নাসেরের হাতে। চারদিক থেকে আসছে বিপর্যয়ের সংবাদ। অল্পেতেই হাল ছেড়ে দেওয়া ফিল্ড মার্শাল আমেরের অভ্যাস। বিমান সাহায্যের আকুতি আসছে সিনাই থেকে। বিমান বহর পঙ্গু। রানওয়েগুলো ক্ষত বিক্ষত। আমেরের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নাসের ধীর, স্থির এবং গম্ভীর। বিপদের মধ্যেও তার ধৈর্যচুতি ঘটছে না। বিভ্রান্ত সেনাপতিদের তিনি বলছেন, বিপ্লবের পরাজয় নেই। এ যুদ্ধ শুধুমাত্র সৈন্যদলের যুদ্ধ নয়। এটা জনযুদ্ধ। জনতা তাঁর সহায়। আদর্শের গোঁজামিল নেই যেখানে সামরিক জয় কিংবা পরাজয় সেখানে শেষ কথা নয়। লড়াই চলছে এবং চলবে।

শহীদের কবর থেকে বেরিয়ে আসবে নূতন যুগের. মুক্তিসংগ্রামী। তারাই নেবে ইস্রাইলী বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম প্রতিশোধ। মে মাসে ইস্রাইল সৈন্য সমাবেশ করেছিল সিরিয়া সীমান্তে। তার আগ্রাসী আস্ফালন সেদিন নজরে পড়েনি বৃটেন কিম্বা আমেরিকার। দামাস্কাসের উপর সম্ভাব্য আক্রমণ এড়াবার জন্য সিনাইএ সৈন্য সমাবেশের হুকুম দিয়েছিলেন নাসের। পশ্চিমী দৃষ্টিতে তিনি যুদ্ধবাদী, আর ইস্রাইল নিরপরাধ।

সত্য বিকৃতির এমন নির্লজ্জ উদাহণ দুর্লভ। চারদিকে টেলিফোন বাজছে। মিনিটে মিনিটে সংবাদ আসছে। ঝড়ের মধ্যে একলা নাসের। তাঁর চোখের সামনে জ্বলছে সিনাই। মরুভূমির লাল বালি আরও লাল হয়ে উঠছে। মিশরীয় সৈন্যদল বড় অসহায়। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তারা লড়াই করছে। মাথাব উপর পড়ছে ইস্রাইলী বোমা। কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে তারা? রাষ্ট্রসংঘ ক্লীব। ন্যায়-অন্যায় বোধ সে হারিয়ে ফেলেছে। আক্রমণ-কারীকে আক্রমণকারী বলতে পারছে না। পিছন থেকে তার গলাটিপে ধরছে বৃটেন এবং আমেরিকা।

ত্রিশ

সিনাই অঞ্চলে মিশরীয় এবং ইস্রাইলী সৈন্য সমাবেশের প্রকৃতি ছিল আলাদা। মিশরীয় ব্যূহগুলো আত্মরক্ষামূলক এবং গতিহীন। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্ট, প্রেসিডেণ্ট জনসন এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নাসের। তিনি আগে আক্রমণ করবেন না। ইস্রাইলীদের কাছ থেকে এধরণের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেনি কেউ। মিশরে মার্কিন এবং বৃটিশ গোয়েন্দার অভাব নেই। ইস্রাইলী গোয়েন্দারাও ছিল

সক্রিয়। ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান অনেকবার মিশরের আকাশ দিয়ে উড়ে গেছে। সযত্নে নিয়েছে মিশরীর সৈন্য সমাবেশের ছবি। এগুলোর বিশ্লেষণে অবশ্যই ধরা পড়েছিল নাসেরের উদ্দেশ্য। তাঁর সরলতার পুরো সুযোগ নিয়েছিল ইস্রাইল। মিশর প্রথম বিমান আক্রমণ চালালে তার বিমান বহর মাটিতে ধ্বংস হত না। দিনের পর দিন হয়ত লড়াই চলত আকাশে। জর্ডনের তুকরাম শহর, সিরিয়ার তাইরেরিয়াস হ্রদের উত্তর অঞ্চল এবং আবু আঘেইলা থেকে বীরশেবার মধ্য দিয়ে সৈন্য পরিচালনা করলে ইস্রাইলকে চারভাগে ভাগ করার চেষ্টা সম্ভব হত। এ সুযোগ নেয়নি মিশর। নেবার ইচ্ছাও ছিল না। যুদ্ধ নয়, সিরিয়ার উপর ইস্রাইলী চাপের ভার প্রশমন নাসেরের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৯৫৬ সালের সিনাই অভিযান পরিকল্পনা কিছুটা রদবদল করেছিল ইস্রাইল। সেবার তার সঙ্গে ছিল বৃটিশ এবং ফরাসী। পোর্ট সৈয়দ কিম্বা আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণের সম্ভাবনা ছিল তাদের। সিনাই বাহিনীর একটা বড় অংশ সরিয়ে নিয়েছিলেন নাসের। ওদের মোতায়েন করা হয়েছিল কায়রোর আশেপাশে এবং ইসমাইলিয়ায়। সিনাইএর প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলো ছিল দুর্বল। উত্তর সীমান্তে কোনরূপ ঝুঁকি না নিয়েই ইস্রাইল ধাওয়া করতে পেরেছিল আকাবায় শার্ম এল শেখের দিকে। এবারের অবস্থা আলাদা। সিনাইএর ঘাঁটিগুলো শক্তিশালী এবং সুরক্ষিত। এগুলোকে পিছনে রেখে আকাবা উপকূল বরাবর এগিয়ে যাওয়া ইস্রাইলীদের পক্ষে বিপজ্জনক। নেগেভের উত্তর অঞ্চল থেকে হানা দেওয়া ছাড়া তাঁদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। তারা ভেবেছিল, দক্ষিণ সীমান্ত থেকে আক্রমণ চালিয়ে সিনাইএর মিশরীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলো ভেঙ্গে ফেলতে পারলে আকাবার পথ উন্মুক্ত হবে।

গাজা থেকে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত চলে গেছে একটি রেল লাইন।

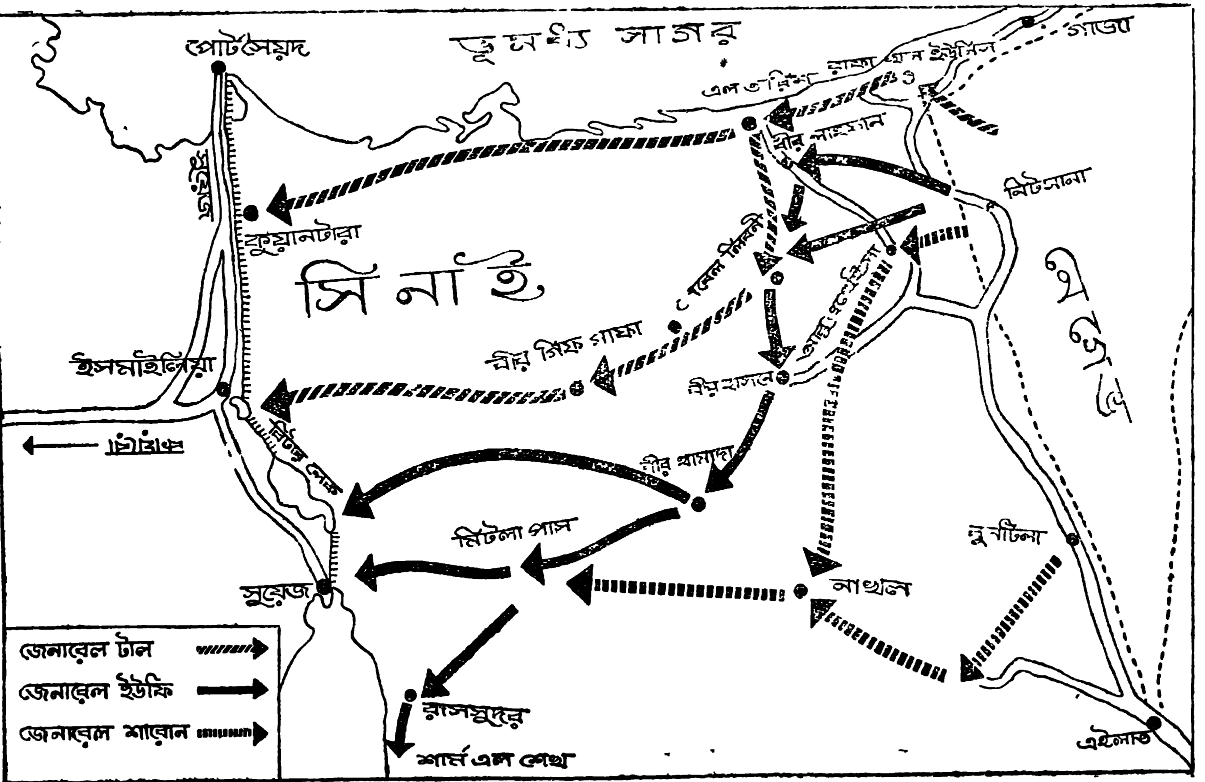
তার খানিকটা উত্তরে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল ভূভাগ। সিনাই মরুভূমিতে মিশরীয় বাহিনীর এটা গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ লাইন। রেল লাইনের পাশাপাশি অঞ্চল দিয়ে ছড়িয়ে আছে খান ইউনিস, শেখ জুয়েভ, গিরোদেন, এল আরিশ এবং সুয়েজ ক্যানালের পাড়ে কানতারা। খান ইউনিস থেকে বিশ মাইল দক্ষিণে ইস্রাইলী সীমান্তসহর নিটসানা। এখান থেকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রেখা টানলে পাওয়া যাবে আবু আঘেইলা, গেবেল লিবনী, বীর গিফগাফা এবং সুয়েজ ক্যানাল এলাকায় ইসমাইলিয়া। আবু আঘেইলার পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে ইস্রাইলী সীমান্তের কাছে কুন্টিল্লা। এখান থেকে সুয়েজ বন্দরের দিকে এগিয়ে গেলে পথে পড়বে নাখল এবং মিটলা। কুন্টিল্লার প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে ইস্রাইলী বন্দর এইলাত। গেবেল লিবনীর প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে বীর হাসনো। তার প্রায় বার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বীর থামাদা। এসব অঞ্চলে রয়েছে সুরক্ষিত মিশরীয় ঘাঁটি। ইস্রাইলের লক্ষ্য, দক্ষিণে সুয়েজ উপসাগরের রাস সুদর থেকে সুয়েজ ক্যানালের উত্তরের পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত সমগ্র সুয়েজ এলাকা দখল।

জেনারেল রবিন ছিলেন ইস্রাইলী চীফ অফ স্টাফ। তাঁর সামরিক অভিজ্ঞতা ব্যাপক। ষ্ট্র্যাটেজীর পদ্ধতি প্রায় নাৎসী জার্মানীর অনুরূপ। সাঁজোয়া বাহিনীর সব শক্তি এবং প্রচণ্ড গতি নিয়ে শত্রু এলাকায় অনুপ্রবেশ। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলা। চারদিকের ক্রমবর্দ্ধমান চাপে তাদের সংহত শক্তির বিনাশ। **ইস্রাইলী পরিকল্পনা :** সীমান্তের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মিশরীয় শক্ত ঘাঁটির উপর যুগপৎ আক্রমণ আরম্ভ। সুয়েজ ক্যানালের পূবে পাহাড়ী এলাকার দিকে সাঁজোয়া বাহিনী পরিচালনা। শত্রুর পলায়ন পথ অবরোধ। পরিবেষ্টিত মিশরীয় বাহিনীর ধ্বংস সাধন। **তাদের সৈন্য সমাবেশ :** বীরশেবা এলাকায় জেনারেল টালের সাঁজোয়া ডিভিশন। তার বিশ মাইল দক্ষিণে নিটসানায়

জেনারেল ইউফি এবং জেনারেল শারোণের ডিভিশন। এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে জেনারেল শারোণের ডিভিশনের একটি ব্রিগেড। জেনারেল টাল এবং জেনারেল শারোণের উপর আক্রমণ চালাবার মুখ্য দায়িত্ব। টালের প্রাথমিক লক্ষ্য এল আরিস। শারোণের উপর ভার আবু আঘেইলা দখল। আবুআঘেইলা বাঁয়ে রেখে ইউফি এগুবেন গেবেল লুবনীর পথে। তার বাহিনীর একটি বাহু দখল করবে বীর লাহফান।

মিশরীয় স্ট্র্যাটেজী: রাফায়, আবু আঘেইলায় এবং কুন্টিল্লায় প্রতিরোধ ঘাঁটি। পিছনে সুশৃঙ্খল ঘাঁটিশ্রেণী। সুয়েজ ক্যানাল এলাকার দিকে শত্রুর অগ্রগতিতে পরপর বাধা সৃষ্টি মিশরীয়দের প্রধান লক্ষ্য। আক্রান্ত হলে আবু আঘেইলা থেকে প্রতিআক্রমণ। বীরশেবার মধ্য দিয়ে জর্ডন পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা। জর্ডন থেকে ইস্রাইলের উপর প্রত্যাঘাত। সিরিয়া থেকে পাল্টা আক্রমণ। এই ত্রিধা আক্রমণের দ্বারা ইস্রাইলকে চার ভাগে ভাগ করে ফেলা। তারপর শত্রু ঘাটিগুলোর বিনাশ। এর জন্য দরকার যৌথ আরব কম্যাণ্ড। জর্ডন বাহিনীর ভার নিয়েছিলেন মিশরীয় জেনারেল রিয়াধ। সিরিয়ার বাহিনীর সঙ্গে ছিল বোঝাপড়া। কোয়ালিশন খুবই শিথিল। **মিশরীয় সৈন্য সমাবেশ:** রাফা, এল আরিশ এলাকায় সপ্তম ডিভিশন, আবু আঘেইলা, কুসেইমা এলাকায় দ্বিতীয় ডিভিশন এবং নাখল, কুন্টিল্লা এলাকায় ষষ্ঠ ডিভিশন। অন্যান্য ডিভিশন সিনাইর বিস্তৃত অঞ্চলে বিভিন্ন ঘাঁটিতে ছড়ান ছিল।

সোমবার সকালে সীমান্তের মিশরীয় ঘাঁটিগুলোর উপর চলল ইস্রাইলী বিমান বহরের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। তার আধঘণ্টা পরে জেনারেল টাল করলেন অভিযানের সূচনা। প্রাথমিক লক্ষ্য— রাফা। অশ্বখুরাকৃতি মাইন শৃঙ্খল দিয়ে এই মিশরীয় ঘাঁটি বেষ্টিত। প্রায় সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত গিয়েছে মাইনের সারি। সামনে প্রবেশপথে কাঁটা-তারের বেড়ার পিছনে অপেক্ষা করছে মিশরীয় ট্যাঙ্কধ্বংসী


ভূমধ্য সাগর
পোর্টসেয়দ
গাজা
রাফা
খান ইউনিস
বীর লাহফান
মিটসানা
কুয়ানটারা
সিনাই
নেগেভ
বীর গিফ গাফা
বীর হাসনে
ইসমাইলিয়া
বিটার লেক
বীর থামাদা
মিটলা পাস
কুনটিলা
নাখল
সুয়েজ
রাসসুদর
শার্ম এল শেখ
এইলাত
জেনারেল টাল
জেনারেল ইউফি
জেনারেল শারোন

কামান এবং গোলন্দাজ সৈন্যরা। ঘাঁটির পশ্চিমে রয়েছে আর একটা গোলন্দাজ বাহিনী। রাফা থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে মাইন শৃঙ্খল। এটা শেষ হয়েছে দুরতিক্রম্য নরম বালু প্রান্তরে। জেনারেল টাল দুভাগে ভাগ করলেন তাঁর মূল বাহিনীকে। একটি দল খান ইউনিস দখল করে স্থানীয় রাস্তা ধরে রাফার দিকে এগুবে। তাতে তারা মিশরীয় গোলন্দাজদের কামানের পাল্লার বাইরে থাকবে। মাইন অধ্যুষিত অঞ্চলও পরিহার করে চলতে পারবে। আর একটি দল আরও দক্ষিণ থেকে মাইন এলাকার পাশ দিয়ে মার্চ করবে। তারা পিছন থেকে রাফার উপর আক্রমণ চালাবে।

জেনারেল টাল কম্যাণ্ডারদের ডেকে বললেন—যে কোন উপায়ে নির্দিষ্ট ঘাঁটিগুলো দখল করতে হবে। ক্ষয় ক্ষতির দিকে তাকাবার দরকার নেই। পিছু হটা অসম্ভব। প্রথম আঘাতের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে গোটা যুদ্ধের জয়-পরাজয় এবং ইস্রাইলের ভবিষ্যত। জেনারেল টালের উত্তর বাহিনী এগুতে লাগল। খান ইউনিসের কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হল মিশরীয় গোলান্দাজদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানগুলো গর্জন করে উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘায়েল হল ছটি ইস্রাইলী ট্যাঙ্ক। হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই ইস্রাইলীদের। ওরা এগুচ্ছে। ট্যাঙ্কগুলো ছুটছে। প্রতিরোধ ব্যূহ ভাঙ্গছে। আশেপাশে ট্যাঙ্কগুলো জ্বলছে। শহরের প্রবেশমুখে তুমুল লড়াই। মিশরীয় সৈন্যদের মনোবল অসাধারণ। ইস্রাইলীরা মরিয়া। রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতি সংগ্রাম। এধরণের প্রবল প্রতিরোধ প্রত্যাশা করেন নি জেনারেল টাল। পঁয়ত্রিশটি ট্যাঙ্ক এবং ক'শ সৈন্য খুইয়ে ইস্রাইলী বাহিনী দখল করল খান ইউনিস। মিশরীয় হতাহতের সংখ্যাও বড় কম নয়। খান ইউনিস থেকে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলল জেনারেল টালের উত্তর বাহিনী। রাফার পাশ কাটিয়ে, মাইন এলাকা এড়িয়ে এবং

সাগর উপকূল ঘেঁষে এগুচ্ছে তারা। দখল করবে শেখ জুয়েড। জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ। রেল লাইন এবং অন্যান্য যান বাহনের সড়ক মিশেছে এখানে। এটা হাতে পেলে যুদ্ধরত পূবের মিশরীয় বাহিনী পাবে না কোন সাহায্য। তাদের পশ্চাদপসারণের পথ হবে অবরুদ্ধ। রাফার পিছনে ছড়িয়ে আছে কতগুলো প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। এগুলো অকেজো করা দরকার। উত্তর বাহিনীর একটি বাহু প্রসারিত হল ইউনিস-রাফা রেল লাইনের উত্তর দিকে। ওরা এগিয়ে চলল এই ঘাঁটিগুলোর পথে।

জেনারেল টালের দক্ষিণ বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো ছুটছে পশ্চিমে। রাফা থেকে দক্ষিণের নরম বালু প্রান্তর পর্যন্ত চলে গেছে মাইন শৃঙ্খল। এটাকে ডাইনে রেখে পাশ কাটিয়ে এগুচ্ছে তারা। ধুলোয় আচ্ছন্ন আকাশ। আশেপাশে উঁচু নীচু বালির পাহাড়। ব্রিগেড কম্যাণ্ডার বুঝতে পারছেন, মিশরীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলোর পিছনে এসে পড়েছেন তিনি। মানচিত্র দেখে শত্রু ব্যূহগুলোর অবস্থান নিরূপণ সহজসাধ্য নয়। উঁচু বালুস্তরের আড়ালে লুকিয়ে আছে মিশরীয় প্রতিরক্ষীরা। অসহ্য গরম! জলের রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে অভিযানকারী সৈন্যদের মধ্যে। মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হল একঝাঁক ট্যাঙ্ক। তারা এগিয়ে গেল। অনুমানের উপর নির্ভর করে গুলি চালাল। এল উত্তর—পাল্টা গোলা। ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডারের ট্যাঙ্ক জ্বলে উঠল। কম্যাণ্ডার লুটিয়ে পড়লেন। দূর থেকে আগুনের ধোঁয়া দেখলেন ব্রিগেড কম্যাণ্ডার। তার সৈন্যদল ঝাঁপিয়ে পড়ল। আরম্ভ হল প্রচণ্ড লড়াই। কেউ পিছু হটতে রাজী নয়। মিশরীয় সৈন্যরা অনড়। দলে দলে মরছে, কিন্তু ঘাঁটি ছাড়ছে না। একটি ব্যাটেলিয়ানকে ঘেরাও করে ফেলেছে মিশরীয় সৈন্যরা। তাদের অবস্থা সঙীন। কম্যাণ্ডার এক হাতে মেসিনগান চালাচ্ছেন এবং অপর হাতে বেতারযন্ত্র ধরে সাহায্যের আর্তি জানাচ্ছেন। জেনারেল টাল পাঠালেন রিজার্ভ বাহিনী।

ওরা যথা সময়ে পৌঁছল বিপজ্জনক এলাকায়। রক্ষা পেল অবরুদ্ধ ইস্রাইলী সৈন্যদল। কিন্তু বাধা দুরাতিক্রম্য। মিশরীয়রা জীবন মরণ পণ করে লড়ছে। দিগন্তে দেখা গেল ক'টি বিমান। ইস্রাইলীরা তাদের দিল সাংকেতিক নিশানা। বেপরোয়া বিমান আক্রমণ। জঙ্গীবিমানগুলো ছোঁ দিয়ে মাটির কাছাকাছি নেমে বোমা ফেলছে। মেসিনগানের গুলি চালাচ্ছে। আবার ছোঁ দিচ্ছে। চারদিকে বোমা ফাটছে। কোথাও আশ্রয় নেই। মিশরীয় কম্যাণ্ডার ঘন ঘন বিমানের সাহায্য চাচ্ছেন। বিমানের পাত্তা নেই। প্রতিরক্ষীরা জানতেও পারে নি যে, মিশরীয় বিমান বহর বিধ্বস্ত। তাদের সাহায্যে একটি বিমানও আসবে না। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ইস্রাইলীদের প্রথম ধাক্কা সার্থক। তারা বিজয়ী। ওদের সামরিক কৌশল নাৎসী জার্মানীর। আহত এবং নিহতদের সম্পর্কে ব্যবস্থা চীনাদের। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং আহতদের ফেলে রাখা বারণ। এমন কি, পশ্চাদপসরণের সময়ও নিহতদের বয়ে নিয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। এক ঝাঁক হেলিকপ্টার নামল যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলে। সারারাত ধরে সরাতে লাগল নিহত এবং আহতদের। বাইরে থেকে ইস্রাইলীদের নিহতের সংখ্যা নির্দ্ধারণ অসম্ভব।

জেনারেল টালের বাহিনী দুটো চলছে এল আরিশের পথে। এই সহরের পাঁচ মাইল উত্তরে গিরাদেহ। তার উত্তরবাহিনী দখল করবে গিরাদেহ। রাত্রে এল আরিশ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় হানা দেবে সম্মিলিত উত্তর এবং দক্ষিণবাহিনী। তার আগে সেখানে চলবে বিমান আক্রমণ। নামবে ছত্রীবাহিনী। খবর পাওয়া গেল, দুপুর থেকে জর্ডন সীমান্তে চলছে সংগ্রাম। ইস্রাইলী সমর নায়কেরা ভেবেছিলেন, এ সীমান্তে জোরাল লড়াই বাধবে না। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর আঞ্চলিক কম্যাণ্ডার ওড বলের মাধ্যমে তারা তিনদিন আগে বাদশা হুসেনের কাছে পাঠিয়েছিলেন প্রস্তাব।

জর্ডন যুদ্ধে না নামলে ইস্রাইলও তাকে আক্রমণ করবে না। বাদশার কিছু করার নেই। তাঁর সৈন্যবাহিনী মিশরীয় জেনারেল রিয়াধের কর্তৃত্বাধীনে। তারা নির্দ্দেশ নিচ্ছে জেনারেল রিয়াদের কাছ থেকে, বাদশা হুসেনের কাছ থেকে নয়। বিমান এবং ছত্রীবাহিনী পাঠাতে হবে জর্ডন সীমান্তে। বাতিল হয়ে গেল এল আরিশের উপর রাত্রের বিমান আক্রমণ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছত্রীবাহিনী নামানোর পরিকল্পনা। সোমবার সকালে (৫ই জুন) জেনারেল টালের উত্তরবাহিনী হানা দিয়েছে খান ইউনিসের উপর। ওখানে চলছে লড়াই। বিশ মাইল দক্ষিণে সীমান্তে তৈরী জেনারেল ইউফির বাহিনী। তারা সুরু করল অভিযান। মূলবাহিনী নিল গেবেল লিবনীর পথ। আর একটি বাহু ছুটল লাহফানের দিকে। নরম বালু প্রান্তর দিয়ে এগুচ্ছে সৈন্যদল। মিশরীয়রা এ অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে নি। মাঝে মাঝে মাইন পেতে রেখেছিল। তাদের ধারণা, এ প্রান্তর দিয়ে যান্ত্রিক বাহিনী চলতে পারবে না। নরম বালুতে চাকা বসে যাবে। ১৯৫৬ সালে সিনাই অভিযানের সময় ইস্রাইলীরা এ অঞ্চলে চালিয়েছিল ব্যাপক পর্যবেক্ষণ। জীপে করে তারা ঘুরেছিল গোটা প্রান্তর। ইঞ্জিনীয়ারদের রিপোর্ট ছিল অনুকূল। ঢেউ খেলান রাবারের চাকায় গাড়ী চালান সম্ভব। ইউফির ট্যাঙ্ক বহর এবং যান্ত্রিক গোলন্দাজ সৈন্যদল ছুটছে। দু একটি জায়গায় মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। সামনে মাইন পাতা রয়েছে। ইঞ্জিনীয়াররা পরিষ্কার করছে মাইন। বেশী সময় তারা নিচ্ছে না। গেবেল লিবনী এবং আবু আঘেইলা থেকে এল আরিশের দিকে দুটি সড়ক চলে গিয়েছে বীর লাহফানের প্রান্ত দিয়ে। জেনারেল ইউফি অবরোধ করলেন এসব পথ। এল আরিশে মিশরীয় সাহায্য পৌছানোর আর কোন উপায় রইল না।

বিকেল তখন পাঁচটা। এল আরিশের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন

জেনারেল টাল। প্রতিরক্ষীরা সমান তালে লড়ছে। তাদের সাহায্যের জন্য ছুটে যাচ্ছে একটি মিশরীয় সাঁজোয়া ব্রিগেড। তারা ধরেছিল গেবেল লিবনীর পথ। বীর লাহফানের অদূরে তাদের দেখা হল জেনারেল ইউফির বাহিনীর সঙ্গে। আরম্ভ হল প্রচণ্ড সংগ্রাম। তারপর সারারাত হাতাহাতি লড়াই। ভোরে ইস্রাইলীদের সাহায্যে এল বিমান বহর। সুরু করল আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল মিশরীয় ব্রিগেড।

মিশর-ইস্রাইল সীমান্ত থেকে পনের মাইল পশ্চিমে আবু আঘেইলা। খুব পাকাপোক্ত ঘাঁটি। সামনে তিন মাইল লম্বা তিনটি সমান্তরাল পরিখা। প্রথম এবং দ্বিতীয়টির দূরত্ব তিনশ গজ। দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টির দূরত্ব ষোলশ' গজ। কংক্রিটে তৈরী এসব পরিখা। ব্যূহের মধ্যে আছে ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান এবং গোলন্দাজ সৈন্য। পিছনে মোতায়েন রয়েছে গোলন্দাজ এবং সাঁজোয়া বহর। সামনা সামনি আক্রমণে এ ঘাঁটি দখল দুঃসাধ্য।

এল আরিশ, গেবেল লিবনী এবং কুসেইমার রাস্তা মিশেছে আবু আঘেইলায়। সিনাইএর মধ্যঅঞ্চলের প্রতিরোধঘাঁটি এটা। আবু আঘেইলা পিছনে রেখে ইস্রাইলী বাহিনী বেশীদূর এগুতে পারবে না। তাদের সরবরাহ লাইন নিরাপদ থাকবে না। জেনারেল ইউফির বাহিনী এর পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে। আবু আঘেইলা অবরোধ করে পিছন থেকে আক্রমণ ইস্রাইলী মতলব। এই আক্রমণ চলবে রাত্রিতে। আবু আঘেইলা দখলের পরিকল্পনা এঁটেছিলেন জেনারেল শারোণ। মিশরীয় সৈন্যসমাবেশের নিখুঁত চিত্র পেয়েছিলেন তিনি আগেই। সামনে থেকে ইস্রাইলী গোলন্দাজরা করবে গোলাবর্ষণ। ছত্রীবাহিনী নামবে উত্তরে। তারা মিশরীয় গোলন্দাজদের উপর চড়াও হবে। তাদের পাশে থাকবে ইস্রাইলী গোলন্দাজরা। মূল ট্যাঙ্ক বহর পিছন থেকে ঢুকে পড়বে শত্রু ব্যূহে।

সোমবার সকালে জেনারেল শারোণ নিটসানা থেকে সুরু করলেন তার অভিযান। রসদ নিয়ে পিছনে চলল বিরাট একটি কনভয়। বিমান আক্রমণের সহজ লক্ষ্য এগুলো। আকাশে কোন মিশরীয় বিমান নেই। জেনারেল শারোণ নিশ্চিন্ত। বেলা তিনটায় ইস্রাইলী সাঁজোয়া বহর আবু আঘেইলার পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছল। মিশরীয় প্রতিরক্ষীদের গোলাবর্ষণ সংহার মূর্তি নিল। ইস্রাইলীরাও পাল্টা গোলাবর্ষণ করতে লাগল। গোলন্দাজ বাহিনী ছিল পিছনে। সন্ধ্যায় তারা হাজির হল রণাঙ্গনে। রাত্রির অন্ধকারে স্থান নিল মিশরীয় বূহের উত্তর পাশে। একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট এগিয়ে গেল আরও উত্তরে। এখানে সুরু হল লড়াই। প্রথম আঘাতেই মিশরীয়রা ঘায়েল করল গোটা দশেক ট্যাঙ্ক। ইস্রাইলী কম্যাণ্ডার চাইলেন বিমান সাহায্য। এলোপাতাড়ি বোমাবর্ষণ চালাল বিমানগুলো। ধূলিঝড় বইছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে বারবার। পিছু হটল ইস্রাইলী সৈন্যরা। সঙ্গে নিয়ে গেল মৃত এবং আহতদের। আবার আক্রমণ। মিশরীয় প্রতিরক্ষায় ভাটা পড়ল। এল আরিশ —আবু আঘেইলা সড়কে ঘাঁটি গেড়ে বসল ইস্রাইলীরা। সেখান থেকে খানিকটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে দখল করল গেবেল লিবনী সড়কের সংযোগ স্থল। আর একটা দল ঘাঁটি বানাল কুসেইমা—আবু আঘেইলা সড়কে। আবু আঘেইলা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ। প্রতিরক্ষীদের জন্য সাহায্য আসার সব পথ বন্ধ।

হেলিকপ্টারে এল ছত্রীবাহিনী। আক্রমণ আরম্ভের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। রাত্রি পৌনে দশটায় মিশরীয় ব্যূহের পিছন থেকে হানা দিল ইস্রাইলী ট্যাঙ্ক বহর। গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ সুরু করল পরিখাগুলোর উপর। চারিদিকে আগুন ছুটছে। রণক্ষেত্র দিনের মত সাদা হয়ে উঠছে। ইস্রাইলীরা সার্চলাইট ফেলছে। তা দেখে গোলন্দাজরা নিশানা নিচ্ছে। আধঘণ্টা ধরে চলল তুমুল সংগ্রাম। একটি বালিয়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে সব দেখছেন জেনারেল

শারোণ। মিশরীয় গোলন্দাজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইস্রাইলী ছত্রীবাহিনী। পরিখার মধ্যে চলছে হাতাহাতি লড়াই। মিশরীয় সৈন্যরা ধিক্কার দিচ্ছে তাদের বিমান বহরকে। তারা যদি সজাগ থাকত তবে অসহায় প্রতিরক্ষীরা পড়ে পড়ে মার খেত না। ইস্রাইলীরা এত সহজে আবু আঘেইলা ঘেরাও করতে পারত না। পরের দিন সকাল ছ'টার মধ্যে সব শেষ। আবু আঘেইলা ইস্রাইলীদের দখলে। জেনারেল শারোণ সাঁজোয়া বহর নিয়ে ছুটছেন নাখলের দিকে। এল আরিশ এসে গেছে ইস্রাইলীদের হাতে। জেনারেল টাল রওনা হয়েছেন গেবেল লিবনীতে। সেখানে তিনি দেখা করবেন জেনারেল ইউফির সঙ্গে। নির্দ্ধারিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম। বেতারে সব খবর পেয়েছেন দক্ষিণ ফ্রণ্টের কম্যাণ্ডার জেনারেল গাভিস। তাঁর নির্দ্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে সবাই।

ইস্রাইলীদের ধারণা ছিল, নাসেরের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়াবে না জর্ডন। বাদশা হুসেন বৃটেন এবং আমেরিকার আশ্রিত। এ দুটি রাষ্ট্র ইস্রাইলের সমর্থক। তাদের চাপে জর্ডন ঠাণ্ডা থাকবে। বাদশা হুসেনের উভয় সঙ্কট। প্যালেস্টাইনী প্রজারা নাসের ভক্ত। তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষার সাধ্য তাঁর নেই। জেরুজালেমের প্রায় অর্দ্ধেক ইস্রাইলী দখলে। এ অঞ্চল উদ্ধার বাদশা হুসেনের বংশানুক্রমিক আকাঙ্ক্ষা। হুসেনের বাবা বাদশা আবদুল্লা ১৯৪৮ সালে নেমেছিলেন লড়াইএ। সবার আগে তিনি সরিয়ে এনেছিলেন নিজের সৈন্যদল। নাসেরের কাঁধে ভর না করলে জেরুজালেম উদ্ধার জর্ডনের পক্ষে অসম্ভব। নাসেরেরও দরকার ছিল জর্ডনের সহযোগিতা। এখান থেকে ইস্রাইলের উপর আক্রমণ পরিচলনা সহজ। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ আরম্ভের আগে বাদশা হুসেনের উপর ইউরোপীয় চাপ ছিল প্রবল। ইস্রাইলী প্রধানমন্ত্রী এস্কোল আসন্ন লড়াই থেকে তফাৎ রাখতে চেয়েছিলেন তাঁকে।

জর্ডন-বাহিনী মিশরীয় জেনারেল রিয়াধের অধীনে। দ্বিধাগ্রস্ত বাদশা পিছু টানতে পারছিলেন না। কিন্তু সেনাপতিদের মধ্যে তিনি ঢুকিয়েছিলেন জেনারেল 'রিয়াধের সঙ্গে অসহযোগিতার মনোভাব।

ইস্রাইলীরা ধূর্ত। তাদের সমর প্রস্তুতি বহুদিনের। জর্ডন নদীর পশ্চিমে মাউণ্ট স্কোপাস। এটা ইস্রাইলী ছিটমহল। ১৯৪৮ সালের চুক্তি অনুযায়ী ওটা যুদ্ধমুক্ত অঞ্চল। ছোট একটি অস্ত্রাগার এবং একশ' বিশ জনের বেশী সৈন্য রাখা বারণ। প্রতি পনের দিনে একটি করে ইস্রাইলী কনভয় যেত মাউণ্ট স্কোপাসে। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী পরীক্ষা করত তাদের জিনিষপত্র। বিশ্বসভার ইউরোপীয় জেনারেলরা ছিলেন ইস্রাইলীদের মদৎদার। তাদের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে ইস্রাইল গড়ে তুলেছিল সেখানে বড় একটি অস্ত্রাগার। ইস্রাইলী বাহিনীর বৃহত্তম অংশ পাঠান হয়েছে সিনাই সীমান্তে। আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী কিছু নেই জর্ডন এলাকায়। ইস্রাইলীদের মতলব—সিনাইকে কব্জির মধ্যে এনে পরে আক্রমণ চালান হবে জর্ডনের উপর। আরবদের বিমান বহর ধ্বংস সর্বক্ষণই ইস্রাইলী পরিকল্পনার অংশ। ওটা চলবে একসঙ্গে।

সোমবার সকালে আম্মনে বাজল সাইরেন। ইস্রাইলী বিমান হানা দিল জর্ডনের বিমান ঘাঁটিগুলোতে। মাটিতে সব সাবাড় করতে পারল না। অক্ষত রইল ক'টা। জর্ডন এবং সিরিয়া অযথা সময় নষ্ট করতে লাগল। বিমান আক্রমণের পর দুঘণ্টা চলে গেছে। এর মধ্যে ইস্রাইলীদের উপর একটা সংঘবদ্ধ আক্রমণ দানা বেঁধে উঠল না। মাঝে মাঝে কামানের গোলাবর্ষণ ছাড়া জর্ডনের সৈন্য দল আর কিছুই করল না। সীমান্তের উপরে ইস্রাইলী বাহিনী তৈরী। আক্রমণের পরিকল্পনা এঁটেছিল তারা সপ্তাহখানেক আগে। জেনারেল দেয়ান নিজে দেখে এসেছিলেন

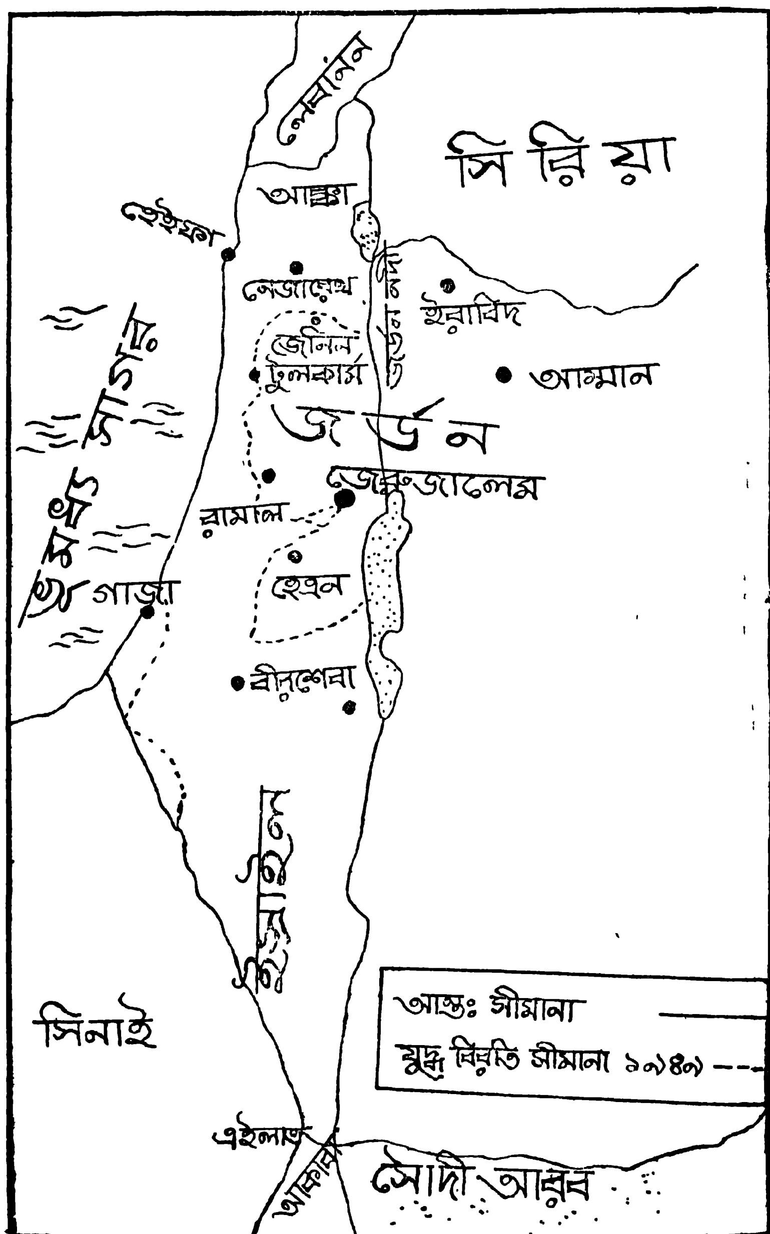
সম্ভাব্য রণক্ষেত্র। এ অঞ্চলের দায়িত্ব জেনারেল নারকিসের উপর। তাঁর সামনে সমূহ বিপদ। সিনাইএ চলছে প্রচণ্ড সংগ্রাম। প্রবল প্রতিরোধের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে ইস্রাইলী বাহিনী। জর্ডন সীমান্তে দ্রুত সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। শত্রু বাহিনী অনায়াসেই জেরুজালেমের ইস্রাইলী অধিকৃত এলাকা ঘেরাও করে ফেলতে পারে। জর্ডন সীমান্ত থেকে মাত্র দশ মাইলের মধ্যে নাতান্যা। উত্তর এবং দক্ষিণ ইস্রাইলের যোগাযোগ রাখছে এই গুরুত্বপুর্ণ ঘাঁটি। জর্ডনী বিমান এখানে বোমাবর্ষণ করে গেছে। শত্রুর হাতে এ ঘাঁটি পড়লে উত্তর এবং দক্ষিণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একঝাঁক ট্যাঙ্ক এবং ছত্রীবাহিনীর বড় দরকার। সিনাইএর যুদ্ধের অবস্থা অনুকূল হলেই তা পাওয়া সম্ভব। অপেক্ষা করছেন জেনারেল নারকিস। সুযোগ দিচ্ছে না জর্ডন। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর কম্যাণ্ডার জেনারেল বুল অস্ত্রসম্বরণের আবেদন জানাচ্ছেন। সময় কাটান ইস্রাইলের দরকার। ইস্রাইলীদের কাজ করছেন জেনারেল বুল। স্বস্তি পরিষদে চলছে হট্টগোল। যুদ্ধপূর্ব এলাকায় ফিরে যাবার সর্তে যুদ্ধ বিরতিতে ইস্রাইল অসম্মত। কিন্তু জর্ডন সীমান্তে পুরা আক্রমণের আগেই সে যুদ্ধ বিরতিতে রাজী। তাতে লাভ অনেক। এ সীমান্তে ইস্রাইলী বাহিনী এগিয়ে যায় নি। যুদ্ধ বিরতিতে তার লোকসান নেই। সিনাই সীমান্তে গত ক'ঘণ্টায় বেশ কিছু আরবভূমি সে দখল করেছে। পুরনো সীমান্তে ফিরে গেলে তার লোকসান। লুটের মাল হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর জর্ডন সীমান্তে লড়াই বন্ধ হলে আরব ঐক্যে ফাটল ধরবে। নাসেরের আওতা থেকে জর্ডন ছিটকে পড়বে।

জেনারেল নারকিসের পরিকল্পনাঃ জেরুজালেম থেকে গোলন্দাজ বাহিনী ঢুকবে মাউণ্ট স্কোপাসে। সেখানে রসদ মজুত। গোলাগুলির অভাব হবে না। সাঁজোয়া বহর অভিযান চালাবে জেরুজালেম ঘাঁটি থেকে। ওরা দখল করবে রামাল্লাহ এবং

জেরুজালেমের মধ্যবর্তী উচ্চভূমি। ওখানে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারলে সমগ্র জেরুজালেমের যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রণ, মাউন্ট স্কোপাস এবং সরকারীভবন প্রতিরক্ষা সহজ। আর একটি গোলন্দাজ বাহিনী এগিয়ে যাবে স্যুর বাহিরে। তারা জেরুজালেম এবং বেথলহেমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। পুলিশ স্কুল নেবে ছত্রীব্রিগেড। প্রাথমিক অভিযানের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর স্থুরু হবে জর্ডন নদীর পশ্চিমাঞ্চল দখলের চূড়ান্ত অভিযান।

বেলা পৌনে একটায় জর্ডন বাহিনী ঢুকল মাউন্ট স্কোপাসে। এটি ইস্রাইলী ছিটমহল। কর্ণেল উরিবেন-আরি তাঁর ব্রিগেড নিয়ে ছুটলেন রামাল্লাহ এবং জেরুজালেমের মধ্যবর্তী উচ্চভূমির দিকে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে জর্ডনীরা দখল করল সরকারী ভবন। এখানে ছিল রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সদর দপ্তর। সিনাই থেকে এল একটি ইস্রাইলী ছত্রী ব্যাটেলিয়ান। তাদের পরিচালনা করছিলেন কর্ণেল মোরেচাইগুর। পুলিশ স্কুল এবং স্যুর বাহির দখলে মদত দেবার ভার পড়ল তার উপর। বেলা আড়াইটায় সর্বাত্মক আক্রমণের হুকুম দিলেন জেনারেল নারকিস। ইস্রাইলী বিমানবহর শত্রু ঘাঁটিগুলোর উপর স্থুরু করল বোমাবর্ষণ।

পুলিশ স্কুল দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যূহ। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। বেড়াগুলোর সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছে পরিখাশ্রেণী। প্রবেশমুখে পিলবক্স। পাঁচজন সৈন্য থাকে এক একটি পিলবক্সে। ওরা চালায় দু'টি মেসিন গান। একটি ইস্রাইলী ব্যাটেলিয়ান আক্রমণ চালাচ্ছে এখানে। অপর ব্যাটেলিয়ান লড়াই করছে শেখ জার্রহে। এ দুটি ঘাঁটির মধ্য দিয়ে চলে গেছে মাউন্ট স্কোপাসের রাস্তা। ইস্রাইলীরা এগুছে। বৃষ্টি ধারার মত বুলেট পড়ছে। দলে দলে মরছে। কারও ভ্রুক্ষেপ নেই তাতে। প্রতিরক্ষীদের সাহায্য পাঠাবার সব পথ বন্ধ। মাথার উপর বিমানছত্র নেই। পরিখায় পরিখায় এবং গৃহে গৃহে চলছে হাতাহাতি


লেবানন
সিরিয়া
আক্কা
হাইফা
নেজারেথ
জেনিন
টুলকার্ম
ইরবিদ
আম্মান
জর্ডন
জেরুজালেম
হেব্রন
গাজা
বীরশেবা
সিনাই
এইলাৎ
সৌদী আরব
আন্তঃ সীমানা
যুদ্ধ বিরতি সীমানা ১৯৪৯

লড়াই। বিরাট দৈত্যের মত সব ভেঙ্গে চুরে আসছে ট্যাঙ্ক। বেলা পৌনে চারটায় পুলিশ স্কুল দখল করল ইস্রাইলী সৈন্যরা। শেখ জারহের পতন ঘটল প্রায় একই সময়ে। রাত্রি তিনটার মধ্যে জেনারেল নারকিসের প্রাথমিক অভিযানের লক্ষ্য সম্পূর্ণ। জর্ডনীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। তারা এখন বিভিন্ন ঘাঁটিতে একক রক্ষী। বাইরের কোন সাহায্য আসবে না। এদের ঘায়েল করা সহজ। সুযোগ এবং সময় হাতে থাকতেও সংঘবদ্ধ প্রথম আক্রমণ চালাতে পারল না জর্ডনীরা। এ দুর্বলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল ইস্রাইলী বাহিনী। সিরিয়ার সৈন্যদল নিশ্চল। মাঝে মাঝে দু একটি বিমান পাঠিয়ে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। সারাদিনের মধ্যে ওরা সীমান্ত থেকে এক পাও এগুল না। ইস্রাইলীরা হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পেল।

একত্রিশ

মঙ্গলবার, ৬ই জুন। সিনাইএর বিচ্ছিন্ন মিশরীয় ঘাঁটিগুলো একে একে দখল করে নিচ্ছে ইস্রাইলীরা। ওরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সুয়েজ খালের পূবপাড়ে পৌঁছতে ব্যস্ত। জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়ের গোটা এলাকা দখল করতে চাচ্ছে জেনারেল নারকিসের বাহিনী। লড়াইএর বিশ্রাম নেই। ইস্রাইলী বিমান-বহর বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করছে। শীঘ্রই হয়ত রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ আসবে। তার আগে পূর্ব পরিকল্পিত আরবভূমি দখল খুবই দরকার। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে তারা। কিন্তু স্বস্তিপরিষদ একমত হতে পারছে না। সোমবার কোন ফয়সালা হয়নি। অধিবেশন স্থগিত ছিল। মঙ্গলবার সুরু হল বৈঠক। বিতর্কের শেষ নেই। ভারত অনড়। যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপূর্ব সীমারেখায় ফিরে যেতে হবে·বিবদমান পক্ষগুলোকে

সোভিয়েট রাশিয়া জোরাল সমর্থন দিচ্ছে ভারতকে। তাদের যুক্তি পরিষ্কার। ইস্রাইল আক্রমণকারী। রাষ্ট্রসংঘের সনদের বিরুদ্ধে সে কাজ করেছে। আক্রমণকাঁরীকে লুটের মাল ভোগ করতে দেওয়া শান্তির পরিপন্থী এবং ন্যায় নীতি বিরোধী। বৃটেন এবং আমেরিকা কোনমতেই ইস্রাইলকে আক্রমণকারী বলতে রাজী নয়। তারা চায়—শুধু যুদ্ধবিরতি। তার অর্থ, যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। সিনাইএর অর্দ্ধেক ইতিমধ্যে দখল করে ফেলেছে ইস্রাইল। জর্ডনের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তারা ভেঙ্গে ফেলেছে। বৃটেন এবং আমেরিকায় চলছে উল্লাস। যত সময় যাবে তত আরবভূমি ইস্রাইলের কুক্ষিগত হবে। অচল অবস্থা সচল হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না স্বস্তিপরিষদে।

নাসের ঘোষণা করলেন: বৃটিশ এবং মার্কিন বিমানবহর মিশর আক্রমণে যোগ দিয়েছে। সোমবার বিকেলে তারা বোমা ফেলেছে। কায়রো এবং আম্মান বেতার একযোগে এ অভিযোগ প্রচার করতে লাগল। আরব পত্রিকাগুলো আরও স্পষ্ট। লিবিয়ায় রয়েছে মার্কিন বিমান ঘাঁটি। এখান থেকে মার্কিন বিমান হামলা চালিয়েছে আরবভূমিতে। বৃটিশ বিমান উড়েছে বিমানবাহী জাহাজগুলো থেকে। যে পরিমাণ বিমান ইস্রাইলের হাতে আছে তার চেয়ে বেশী বিমান তারা ব্যবহার করেছে অভিযানে। আরবের পাঁচটি তৈলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র ইউরোপে তৈল সরবরাহ বন্ধ করে দিল। সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক, সিরিয়া এবং আলজেরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিড়ে ফেলল। কতগুলো অকেজো জাহাজ ডুবিয়ে সুয়েজখাল বন্ধ করলেন নাসের।

দিল্লীতে চলছে লোকসভার অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বললেন, ইস্রাইলী আক্রমণ ইচ্ছাকৃত এবং কাপুরুষোচিত। যুদ্ধপূর্ব সীমানায় তাকে ফিরে যেতে হবে।

প্রতিবাদ জানাল স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন কমন্সসভায় ইস্রাইলীদের সঙ্গে বৃটিশ বিমানবহরের সহযোগিতার কথা অস্বীকার করলেন। আরব রাষ্ট্রগুলো তৈল দেবে না। বেশীদিন বয়কট চললে বৃটেনে শিল্পসঙ্কট দেখা দেবে। উইলসন চিন্তিত। ভরসা দিল ইরান। ইউরোপে তার তৈল রপ্তানী বাড়বে।

মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যেই জর্ডন অঞ্চলের যুদ্ধের ফলাফল প্রায় নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। ইস্রাইলী যান্ত্রিক বাহিনীর তুটি ব্যাটেলিয়ান ধাওয়া করছে রামাল্লার দিকে। সন্ধ্যা সাতটায় ওরা ঢুকল সহরে। সব অন্ধকার। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। একঝাঁক ট্যাঙ্ক ঘুরে বেড়াল সহরের বিভিন্ন রাস্তায়। এলোপাতাড়ি গোলা ছুড়ছে ট্যাঙ্ক চালকরা। প্রতিরোধ নেই বললেই চলে। সহরের উত্তরে এবং দক্ষিণে ঘাঁটি গেড়ে বসল ইস্রাইলীরা। সকালে চলবে বাড়ী বাড়ী তল্লাস। জেনারেল নারকিসের পরবর্তী লক্ষ্য নেব্লাস।

জর্ডন সীমান্তের উত্তরাঞ্চলের কম্যাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এলাজার। সোমবার বিকেলে একটি গোলন্দাজ ব্রিগেড এবং এক ঝাঁক ট্যাঙ্ক নিয়ে তিনি জর্ডন সীমান্ত পার হয়েছিলেন। জেনিন দখল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এখান থেকেই জর্ডনীরা দূরপাল্লার কামানের গোলা ছুড়ছিল ইস্রাইলী বিমান ঘাঁটি রামাত ডেভিডের উপর। মঙ্গলবার ভোরে জেনিনের উত্তর-পশ্চিমে সুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। সকালে আর একটি ইস্রাইলী গোলন্দাজ সৈন্যদল পৌছল রণক্ষেত্রে। সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারল না প্রতিরক্ষীরা। ইস্রাইলী বাহিনী দখল করল জেনিন। জর্ডনীদের গতি মন্থর। অবিশ্রান্তভাবে চলছে ইস্রাইলী বিমানের বোমাবর্ষণ। সাহায্য এবং রসদ পাঠাবার পথঘাট বিপন্ন। বোমার ঘায়ে কনভয়গুলো জ্বলছে। প্রত্যেকটি জর্ডনী ঘাঁটিতেই ইস্রাইলী চাপ বাড়ছে। প্রতিরক্ষীরা পাচ্ছে না কোন রসদ। বেশীক্ষণ টিকে

থাকা অসম্ভব। গুলিগোলা ফুরিয়ে গেছে। চালকরা ট্যাঙ্ক ফেলে পালাচ্ছে। সৈন্যরা মরছে। তাদের স্থান পূরণের জন্য নূতন সৈন্যদল আসছে না। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। যুদ্ধের মনোবল জর্ডনীরা হারিয়ে ফেলেছে। ইতিমধ্যে নেব্লাসও ইস্রাইলীদের হাতে চলে গিয়েছে।

জর্ডন নদীর পশ্চিম পারের উত্তরাঞ্চলের ঘাঁটিগুলোর দখল প্রায় সম্পূর্ণ। তুলকার্ম এবং নালকিলিয়ায় ঢুকেছে ইস্রাইলী সৈন্যদল। জর্ডনীদের কাছে তুলকার্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে ইস্রাইলী উপকূল সহর নাতান্যা মাত্র দশ মাইল। যথাসময়ে সংঘবদ্ধ আক্রমণ সুরু করলে এ সহর দখল অসম্ভব ছিল না। জর্ডনীদের হাতে নাতান্যা এলে উত্তর এবং দক্ষিণ ইস্রাইলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। সিনাইএ মিশরীয় বাহিনীর উপর চাপ কমত।

এলাজারের বাহিনী উত্তরাঞ্চলের ঘাঁটিগুলো দখল করতে করতে দক্ষিণের দিকে এগুচ্ছিল। মধ্য অঞ্চলের জর্ডনী প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলছিল ছত্রীবাহিনী। দক্ষিণে কর্ণেল আমিতাইর সৈন্যদল দক্ষিণ জেরুজালেমের উপর আঘাত হানছিল। বিমান বহর সক্রিয়। জর্ডনী রিজার্ভ বাহিনী উদ্দেশ্যহীন। ওরা ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই দেখতে পাচ্ছে ঘাঁটি ইস্রাইলী দখলে। বিমানের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে তাদের গতিবিধি হয়ে পড়েছিল মন্থর। ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছিল। সৈন্যরা প্রায় ছত্রভঙ্গ। অবস্থা সেনাপতিদের আয়ত্তের বাইরে। রামাল্লা এবং নেব্লাসের আশেপাশের উচ্চভূমিতে ইস্রাইলী ঘাঁটি গড়ে তোলার কাজ সম্পূর্ণ। ওখান থেকে একটি দল নেমে এল জর্ডন উপত্যকায়। তাদের সঙ্গে মিলিত হল ছত্রীবাহিনী। ওরা এগিয়ে চলল জেরিকোর দিকে। পথ বন্ধুর। দুটি ভাগে ভাগ হয়ে চলেছে ইস্রাইলী বাহিনী। কোন বাধা নেই। ট্যাঙ্কগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে এগুচ্ছে। জেরিকোর

অগ্রবর্তী শক্ত ঘাঁটি পুলিশ স্টেশন। ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি ইস্রাইলী ব্যাটেলিয়ান। তার আগে বিমানের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়েছিল জর্ডনী গোলন্দাজ সমাবেশ। প্রতিরোধ দুর্বল। একটি ইস্রাইলী ব্যাটেলিয়ান আশেপাশের অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চোরাগোপ্তা আক্রমণের স্থানগুলো পরিষ্কার করছিল। রাত্রের অন্ধকারে সুরু হল সম্মিলিত আক্রমণ। নীরবে আত্মসমর্পণ করল জেরিকো। অদূরে নিশ্চল সাগরের নীল জল। জেরিকোকে দাঁড়িয়ে বিজয়ী ইস্রাইলীরা দেখল ডেড সি এবং তার উপকূলের উষর প্রান্তর।

অর্দ্ধেক সিনাই ইস্রাইলীদের দখলে। অক্টোপাশের বিরাট বাহুগুলো মিশরীয়দের বেষ্টন করে ফেলেছে। প্রতিরোধ ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ। বিজয়ী সৈন্যবাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গোটা অঞ্চল তারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। মিশরীয় সৈন্যরা পালাচ্ছে। কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই। অফিসাররা সাধারণ সৈনিকদের ফেলে জীপে চড়ে ছুটছে। সবার উদ্দেশ্যহীন যাত্রা। পিছু হটার সব পথ বন্ধ। দিনের বেলায় মরুভূমি আগুন ছড়ায়। রাত্রে বরফ শীতল। এক ফোঁটা জল নেই। ইস্রাইলী বিমান যেখানে সেখানে বোমা ফেলছে। মিশরীয় দেখলেই মেসিনগান চালাচ্ছে। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বিধ্বস্ত সমরসম্ভার। মরুভূমির মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। হতভাগ্যেরা চোখের সামনে দেখেছে শুধু মরীচিকা। আকাশে মৃত্যু, পায়ের নীচে মৃত্যু, সামনে মৃত্যু এবং পিছনে মৃত্যু। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসে। পা চলে না। ধূ ধূ মরুপ্রান্তর জ্বলছে। চারদিকে মৃত্যুর ইসারা। ইস্রাইলীদের হাতে বন্দী হচ্ছে দলে দলে। পরাজয়ের ম্লান ছবি নেমে এসেছে মিশরের উপর। সুয়েজ খালের দিকে চূড়ান্ত অভিযানের সলাপরামর্শ সুরু হয়েছে। মিশরীয় জাতীয় জীবনে এ মঙ্গলবার সত্যিকারের কালো মঙ্গলবার।

মিশরীয় নৌবহর তুলনায় ইস্রাইলীদের চেয়ে বড়। পরিচালকরা

অনভিজ্ঞ। যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ওদের উচিত ছিল হাইফা আক্রমণ। ভূমধ্যসাগর উপকূলে রয়েছে মার্কিন এবং বৃটিশ নৌবহর। মিশরীয়দের বড় ভয় এহুটি নৌবহরের। সুযোগ পেলেই হয়ত ওরা হামলা চালাবে। ১৯৫৬ সালের কথা মনে আছে সবার। মঙ্গলবার রাত্রের অন্ধকারে ইস্রাইলী উপকূলে দেখা গেল তিনটি মিশরীয় সাবমেরিন। বিমানগুলো ছেঁকে ধরল তাদের। ইস্রাইলী নৌবহর ছাড়ল জলবোমা। পেল না কোন বিমান সাহায্য। কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলো ওরা।

আকাশে চাঁদ নেই। তারাগুলি জ্বল জ্বল করছে। একটি ইস্রাইলী সাবমেরিন এসে দাঁড়াল আলেকজান্দ্রিয়ার প্রবেশ মুখে। বিস্ফোরক নিয়ে চারজন ডুবুরী নামল জলে। ঢুকল বন্দরে। নোঙ্গর করা ছিল মিশরীয় সাবমেরিন এবং ক্ষেপণাস্ত্র জাহাজ। এগুলো উড়িয়ে দেবে ডুবুরীরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছে সাবমেরিন। ওরা ফিরে আসছে না। পূব আকাশে সূর্য উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। আর দেরী চলে না। সাবমেরিন চলে গেল। দুপুরে খবর পাওয়া গেল, ডুবুরীরা ধরা পড়েছে। হারবারের কোন ক্ষতিই তারা করতে পারে নি। লড়াইএর ক'দিন মিশরীয় কিম্বা ইস্রাইলী নৌবহরের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। এল আরিশ দখলের সংগ্রামে নৌবহর ব্যবহারের পরিকল্পনা এঁটেছিল ইস্রাইলীরা। শেষ পর্যন্ত দরকার পড়ে নি। মিশরীয় বিমান বহর পর্যুদস্ত। মাথার উপরে আকাশ অরক্ষিত। বিমান বহরের সহোযো এ ঘাঁটি অল্পায়াসেই দখল করেছিল শত্রুবাহিনী। এইলাত বন্দর নিয়ে ভয় ছিল খুব বেশী। সিনাই অভিযান সার্থকতার পথে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে-ভয়ও কেটে গেছে। ভূমধ্যসাগরের মিশরীয় নৌবহর বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য আগে ভাগেই ইস্রাইলী পরিকল্পনা তৈরী ছিল। তাদের একটা বড় অংশকে প্রলোভিত করা হয়েছিল লোহিত সাগরে। দিনের বেলায় গোটাকয়

অবতরণ ভেলা ইস্রাইলীরা পাঠিয়েছিল এইলাতে। মিশরীয়দের চোখের সামনেই ঘটেছিল ঘটনা। রাত্রের অন্ধকারে ভেলাগুলো ফেরত এনে রেখে দেওয়া হয়েছিল নেগেভের ঘাঁটিতে। দিনের বেলায় আবার এগুলো পাঠান হল এইলাতে। ক'দিন ধরেই ইস্রাইলীরা দিয়েছিল এই মহড়া। মিশরীয়রা ভাবল, শার্ম এল শেখ বিপন্ন। এখানেই হবে ইস্রাইলী আক্রমণ। ১৯৫৬ সালে এ ঘাঁটি ছিল শত্রু আক্রমণের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য। ফাঁদে পড়ল মিশরীয় সমর নায়কেরা। তাঁদের ধারণা স্থলপথে বেশ কিছু অবতরণ-ভেলা ইস্রাইলীরা পাঠিয়েছে এইলাতে। আকাবা উপসাগরের উত্তর প্রান্তে এইলাত। দক্ষিণ প্রান্তে শার্ম এল শেখ। জল পথে শার্ম এল শেখ দখল করতে হলে এইলাত থেকে আক্রমণ সুরু করা দরকার। আকাবা উপসাগরে গোটা তিন ইস্রাইলী পাহারাদার বোটও ভয়ানক কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠল। মিশরীয়রা শার্ম এল শেখ প্রহরার জন্য পাঠাল যুদ্ধজাহাজ। লড়াই আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আটকা পড়ল সেগুলো লোহিত সাগরে। মিশরীয় নৌবহরের পরিচালকরা অধিকতর শক্তিশালী নৌবহরের মালিক। কিন্তু বুদ্ধিতে ইস্রাইলীদের চেয়ে খাট। তার উপর বিমান আচ্ছাদন নেই মাথার উপরে। সঙ্কটকালে সক্রিয় হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক যুদ্ধে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিমান সাহায্য। এ সাহায্য ছাড়া স্থলবাহিনী কিম্বা নৌবহর অসহায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রিন্স অফ ওয়েলস এবং রিপালস্ ডুবি তার প্রমাণ। আরও প্রমাণ দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুর ঘাঁটির পতন। জাপানীরা অনায়াসেই দখল করেছিল সিঙ্গাপুর। বৃটিশবাহিনী তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। বিমান শক্তির দুর্বলতার খেসারত দিয়েছিল বৃটেন। ১৯৫৬ সালের লড়াইএ নির্মম আঘাত পেল মিশর।

নাসের নিঃসঙ্গ। রণক্ষেত্রে পরাজয়ের ঘনঘটা। ফিল্ড মার্শাল আমের বুদ্ধিভ্রংশ। বাস্তববোধ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। দু চারটি

বিমান ছাড়া আর সব ধ্বংস হয়েছে। সিনাই শত্রুর দখলে চলে যাচ্ছে। আর ক'ঘণ্টার মধ্যেই তারা হয়ত সুয়েজ খালের পাড়ে এসে দাঁড়াবে। কায়রোর আকাশ অরক্ষিত। সৌদী আরবের সৈন্যবাহিনী মার্চ করচে। ক'দিন ধরেই এ ধরণের খবর শোনা যাচ্ছে। বাদশা ফয়জল প্যারিস থেকে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু রণাঙ্গনের কাছাকাছি কোথাও তাদের টিকি মিলছে না। তারা হয়ত সৌদী আরবের জনপথে লেফট্ রাইট্ করছে। দরকার জঙ্গী বিমানের। সৌদীর হাতে আছে মাত্র বিশটি বিমান। তার পাইলটদের মধ্যে অনেকে বৃটিশ। রাজতন্ত্রী সৌদী সাধারণতন্ত্রী মিশরের সাহায্যে আসবে না। লোক দেখান আস্ফালন চলবে। পিছন থেকে বাদশা ফয়জল সুতো টানবেন। কোয়েটের আন্তরিকতা সন্দেহাতীত। তার একদল সৈন্য শার্ম এল শেখ পাহারা দিচ্ছে। বিমানের সংখ্যা মাত্র নয়। একটি খোয়া গেছে। বাকীগুলো পাঠানোর অর্থ আত্মহত্যা। লেবাননের সমর শক্তি অতি নগণ্য। জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক খৃষ্টান। ওরা বৃটিশ এবং আমেরিকার সমর্থক। আরব জনতা নাসেরপন্থী। মানসিক দিক থেকে দেশটি দুভাগে বিভক্ত। যুদ্ধের গতি এরা পাল্টাতে পারবে না। ইরাক অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। কিন্তু ইরাকী সরকার দ্বিধাগ্রস্ত। জর্ডনে সৈন্যদল পাঠিয়েছে। নির্বোধের মত তারা ছুটাছুটি করছে। যুদ্ধের চেয়ে হুঙ্কার তাদের বেশী। ভরসা আলজেরিয়া। যুদ্ধের ঐতিহ্য আছে আলজেরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে। সরাসরি আক্রমণ ওদের অপছন্দ। গেরিলা লড়াই-এর দিকে ঝোঁক বেশী। বুমাদিয়েন সৈন্য পাঠাবেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বারবার। মিশরীয় বিমান বহর বিধ্বস্ত। আলজেরিয়ার হাতে মাত্র একশটি বিমান। পাইলটরা উপযুক্ত শিক্ষার সময় পায় নি। মিশরীয় বিমান বহরের আশ্রয় পেলে আলজেরীয় সৈন্যরা লড়াই করতে পারত। উন্মুক্ত আকাশের নীচে সৈন্যবাহিনীকে ছেড়ে

দেওয়া বিপজ্জনক। বুমাদিয়েন থমকে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ভাবছেন যুদ্ধ পরিবর্ত্তী অবস্থা। বিজয়ী ইস্রাইলীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন গেরিলা লড়াই। আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা মিশরের কাজে লাগাতে তিনি উৎসুক। ফিল্ড মার্শাল আমের প্রায় অস্তিত্বহীন মিশরীয় বিমান বহরকে সিনাইএ আক্রমণ চালাবার হুকুম দিচ্ছেন। এ ফ্রণ্টে ইস্রাইলী অগ্রগতি থামাতে হবে। হুকুম তামিলের লোক নেই। আমের নাছোড়বান্দা। হুকুমের পর হুকুম চলছে। তার কার্য্যকর রূপ যাচাইএর সময় তাঁর কম।

অসাধারণ আত্মবিশ্বাস মিশরীয় জনতার মনে। হয়ত তারা পায় নি সামরিক বিপর্যয়ের সঠিক খবর। যুদ্ধের সময় সংবাদের উপর সেন্সর ব্যবস্থা সাধারণ নিয়ম। মিশরীয় বিমান আকাশে উড়ছে না তা গোপন রাখার মত ঘটনা নয়। নাসেরের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। বিশেষ কিছু বলছেন না তিনি। ঘন ঘন সাইরেন বাজছে। কখনও বিমান আক্রমণ হচ্ছে। আবার কখনও হচ্ছে না। জনসাধারণ শান্ত এবং সংযত। তাদের মধ্যে নেই কোন আতঙ্ক। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছেদ পড়ে নি। তরুণেরা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কায়রোর চারদিকে গড়ে উঠছে রক্ষাব্যূহ। কারখানার শ্রমিকেরা শিখছে গেরিলা যুদ্ধ। চোরা-কারবারীরা হাত গুটিয়েছে। অতি মুনাফার লোভ দেখালে জনতা তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। গুণ্ডারা পর্যন্ত সেজেছে দেশপ্রেমিক। জনপথে ছিনতাই কমেছে। সবাই প্রতিরক্ষায় ব্যস্ত। নাসের এনেছেন মিশরীয় মানসজগতে বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফসল ফলতে সুরু করেছে আপদকালে। ব্যর্থ সৈন্যবাহিনী, সার্থক জনতা। সহস্র বিপদের মধ্যে এরাই নাসেরের সান্ত্বনা।

সিরিয়ার মতিগতি রহস্যজনক। দামাস্কাস আক্রমণের হুমকী দিয়েছিল ইস্রাইল। সৈন্যসমাবেশও করেছিল তারা এ সীমান্তে।

হয়ত ওটা ভান। আসল মতলব সিনাই দখল। ইস্রাইলের প্রধান শত্রু মিশর। যুদ্ধের সূচনাতেই বোঝা গিয়েছিল, সিনাই সীমান্তে তার যুদ্ধপ্রস্তুতি দীর্ঘদিনের। সিরিয়ার উপর ইস্রাইলী চাপ কমাবার জন্য নাসের সৈন্য পাঠিয়েছিলেন সিনাই সীমান্তে। জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত মিশর। তার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ। বিমান বহরের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র বিদ্যমান। সিরিয়ার বিমান বহরের প্রায় অর্দ্ধেক নষ্ট হয়েছে দুদিনে। বাকীগুলো আকাশে উড়ছে না। ইস্রাইলী এলাকায় দু একটি হানা দিয়েই ওরা বসে পড়েছে। যুদ্ধের সূচনাতেই সিরিয়া ত্রিমুখী অভিযান চালাতে পারত। মিশমার হায়ারডেনের মধ্য দিয়ে একটি বাহিনী এগুত পশ্চিমে হাইফার দিকে। এখান থেকে একটি বাহু নাজারেথের পথ নিত। গ্যালিলী সাগরের দক্ষিণে টেল কাজির দিয়ে দ্বিতীয় বাহিনী ধরত জর্ডনের পথ। উত্তর-পশ্চিমে একটু মোড় ঘুরে যেতে পারত আফুলায়। লেবাননকে ঘাঁটি করে তৃতীয় বাহিনী হানা দিত একারে। ইস্রাইলকে ত্রিধা বিভক্ত করার একটা চেষ্টা করতে পারত সিরিয়া। ইস্রাইলী বিমান বহর সিনাই এবং জর্ডনে ব্যস্ত। সিরিয়া তার নিজস্ব বিমান বহরের খানিকটা সাহায্য পেত। এ পরিকল্পনা কার্য্যকর করার চেষ্টা চললে সিনাইএ মিশরীয় বাহিনীর উপর চাপ কমত। কিন্তু সিরিয়া বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতাই দেখাল না। গোলান উপত্যকা থেকে শুধু কামানের গোলা ছাড়ল। সিরিয়ার আড়ম্বর বেশী। মুখে প্রচণ্ড বিপ্লবী। কাজের সময় একেবারে নির্জীব। গত ক'বছর ধরে সিরিয়া গড়ে তুলেছিল প্রতিরক্ষা ব্যূহ। তাদের ধারণা, গোলান উপত্যকা অজেয়। এখানে বসেই প্রতিরোধ করতে পারবে ইস্রাইলী আক্রমণ। সিনাই এবং জর্ডন যখন খাবি খাচ্ছে, সিরিয়া তখন নীরবে অপেক্ষা করছে। সম্মিলিত অভিযানের কথা তার চিন্তায় আসছে না। সে বুঝতে পারছে না, মিশর খতম হলে সিরিয়ারও রক্ষা নেই। দামাস্কাসের

অকর্ম্মণ্যতা কাজে লাগিয়েছিল ইস্রাইল। মিশর এবং জর্ডনের লড়াইএর প্রথমপর্ব শেষ করে সবশক্তি নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সিরিয়ার উপর। টাল সামলাতে পারে নি সিরিয়া।

বত্রিশ

সাতই জুন বুধবার। সকালে গেবেল লিবনীতে জেনারেল ইউফির সঙ্গে দেখা করলেন জেনারেল টাল। পরিশ্রান্ত ইস্রাইলী সৈন্যরা পেয়েছে খানিকটা বিশ্রাম। গত চব্বিশ ঘণ্টায় ওদের চোখে ঘুম ছিল না। সবাই টলছে। যে যেমনি পারছে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। গেবেল লিবনীতে তৈরী হল পরবর্তী ইস্রাইলী পরিকল্পনা। টালের বাহিনী আরও উত্তরের রাস্তা নেবে। বীর গিফগাফার মধ্য দিয়ে এগুবে। ইসমাইলিয়ামুখী পাহাড়ী পথ অবরোধ করবে। ইউফির বাহিনী আরও দক্ষিণের রাস্তা ধরবে। ওদের লক্ষ্য মিটলা পাস ইস্রাইলীরা জানে, সিনাইএর পূর্বাঞ্চলের ছত্রভঙ্গ মিশরীয় বাহিনী ছুটবে সুয়েজ খালের পূবপাড়ের অঞ্চলে। সেখানে জমায়েত হয়ে হয়ত চালাবে পাল্টা আক্রমণ। মিটলা দিয়ে পিছু হটতে হবে তাদের। এ পথ অবরোধ করতে পারলে মিশরীয় সৈন্যরা অক্টোপাশের জালে জড়িয়ে পড়বে।. তারা হবে ইস্রাইলীদের সহজ শিকার। গেবেল লিবনীর দশ মাইল পশ্চিমে বীর হামা। অভিযানের পথে টাল নেবেন এই মিশরীয় ঘাঁটি। আর ইউফি দখল করবেন বীর হাসনে। সকালে টালের বাহিনী পৌছল বীর হামার উপকণ্ঠে। ভারী ট্যাঙ্ক নিয়ে তৈরী ছিল মিশরীয় সৈন্যরা। তাদের গোলার গতি সাংঘাতিক। ইস্রাইলী হাল্কা ট্যাঙ্কগুলো দাঁড়াতে পারছিল না। এল জঙ্গীবিমান। চলল বোমাবর্ষণ। কাবু হয়ে পড়ল প্রতিরক্ষীরা। সরবরাহ পথ বন্ধ। গোলাগুলি প্রায় নিঃশেষ। ট্যাঙ্ক চালাবার তেল নেই। তার উপর

আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত বোমা এবং মেসিনগানের বুলেট বৃষ্টি। বীর হামায় ঢুকল বিজয়ী ইস্রাইলী বাহিনী। রিজার্ভ সৈন্যদল যোগ দিল তাদের সঙ্গে। মার্চ করল বীর গিফগাফার পথে। এদিকে ইউফির সাঁজোয়া বাহিনী ঢুকে পড়েছে বীর হাসনের ঘাঁটিতে। এখানে প্রতিরোধ তেমন জোরাল ছিল না। মিশরীয় বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়ান অসম্ভব।

ইউফি ছুটছেন মিটলা পাসের দিকে। ১৯৫৬ সালে জেনারেল শারোণ এখানে নামিয়েছিলেন ছত্রীবাহিনী। ফরাসী বিমানবহর জোগিয়েছিল তাদের রসদ। মিটলায় চুপ করে বসেছিল তারা। মিশরীদের পাল্টা আক্রমণে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল ছত্রীদল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ইডেন প্রচার করছিলেন সুয়েজখাল বিপন্ন। মিটলা থেকে ইস্রাইলী বাহিনী সুয়েজখালের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। বিবদমান পক্ষ দুটিকে পৃথক রাখা দরকার। তা না হলে সুয়েজখাল বন্ধ হয়ে যাবে। সুয়েজখালের নিরাপত্তার জন্য বৃটিশ এবং ফরাসী বাহিনী পোর্টসৈয়দে অবতরণ করবে। মিশর থেকে মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছিল আমেরিকা। দেরী হয়ে গেল ইঙ্গ-ফরাসীর পোর্ট সৈয়দ আক্রমণ। চটে গেলেন ইস্রাইলী প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন। মিটলা থেকে সরিয়ে নিতে চাইলেন ইস্রাইলী বাহিনী। বাধা দিলেন, জেনারেল দেয়ান। মলের মারফত ইডেন পাঠালেন সংবাদ—আর ক'ঘণ্টার মধ্যেই পোর্ট সৈয়দে অবতরণ করবে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী। ইস্রাইলীরা মিটলা ছাড়লে বিবদমান পক্ষ দুটিকে তফাত রাখার সুযোগ পাবে না ইংরাজ। মিটলা গিরিপথ কুড়ি কিলোমিটার লম্বা। পুব থেকে সুয়েজখালের পাড়ে পৌঁছবার প্রধান সড়ক এটা। মিটলার পশ্চিমে বীর থামাদা। মিশরীয় অগ্রবর্তী ঘাঁটি এটা। বীর থামাদার দিকে চলছে দুটি ইস্রাইলী ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়ান। এ ঘাঁটির দখল নিয়ে ওরা এগুবে মিটলার দিকে। মিশরীয় বাহিনীর

পশ্চাদপসারণের সব পথ বন্ধ করা ইস্রাইলি উদ্দেশ্য। ট্যাঙ্ক বহরের গতি মন্থর। তৈল এবং রসদের অভাব। গতির ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল রাখতে পারছে না। মিশরীয় বিমানবহর বিধ্বস্ত। সেনাপতিরা অদূরদর্শী। শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। এসব দুর্বলতা যদি মিশরীয়দের না থাকত, তবে অতি উৎসাহী ইস্রাইলী সৈন্যদল বিপদে পড়ত। মিটলার প্রায় বিশ মাইল দূরে থেমে গেল ইস্রাইলী অগ্রগতি। তৈলের অভাবে ট্যাঙ্কগুলো অচল। গোলাগুলি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। প্রায় অর্দ্ধেক সরঞ্জাম রাস্তায় ফেলে রেখে মার্চ করছে ইস্রাইলী সৈন্যদল। প্রত্যাঘাতের সুযোগ নিচ্ছে না মিশরীয় বাহিনী। ওদের মধ্যে ঢুকেছে বিমান আতঙ্ক। মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। দুর্বল স্থানে শত্রুকে আঘাত করতে পারছে না। বুধবার সন্ধ্যায় ইস্রাইলী ট্যাঙ্কগুলো হাজির হল মিটলার কাছাকাছি অঞ্চলে।

আরও দক্ষিণে শার্ম এল শেখ। তিরাণ প্রণালীর প্রবেশমুখে মিশরীয় ঘাঁটি। সিনাইএর বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় রক্ষীরা ছেড়ে গিয়েছে এ ঘাঁটি। হেলিকপ্টারে এখানে নামল একটি ইস্রাইলী সৈন্যদল। উপকূলে অবতরণ করল জনাকয় নৌসেনা। দখল হল শার্ম এল শেখ। উড়তে লাগল ইস্রাইলী পতাকা। বীর গিফগাফার উত্তরে ইস্রাইলীরা গড়ে তুলল ট্যাঙ্কের ব্যূহ। বীর থামাদা থেকে ইসমাইলিয়া পর্যন্ত সড়কে সৃষ্টি হল অবরোধ। সুয়েজখালের দিকে মিসরীয়দের পলায়ন পথ একেবারে বন্ধ। ফাঁদ তৈরী। এই ফাঁদের মধ্যে মিশরীয় সৈন্যদের নিয়ে আসার দায়িত্ব জেনারেল শারোণের।

অবরুদ্ধ মিশরীয় বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল বীর গিফগাফার উত্তরে ইস্রাইলীদের উপর। ওরা আক্রমণ চালাচ্ছিল পশ্চিম দিক থেকে। যুধ্যমান পক্ষ দুটির মধ্যে মাত্র বিশ গজ

ব্যবধান। সুরু হয়েছে ট্যাঙ্কের লড়াই। মিশরীয় ট্যাঙ্ক ভারী। ইস্রাইলী ট্যাঙ্ক হালকা। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যে এগুলো দাঁড়াতে পারছে না। একটির পর একটি জ্বলছে। ইস্রাইলী রসদের কনভয়ের মধ্যে এসে পড়ল একটা গোলা। ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আড়াই ঘণ্টা ধরে চলল সংগ্রাম। ইসমাইলিয়া থেকে একদল মিশরীয় বাহিনী এগিয়ে এল সঙ্গীদের সাহায্যে। রাস্তার মধ্যে ওরা বাধা পেল। ইস্রাইলীরা ভারী ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ চালাল পিছন থেকে। বিমানবহর ফেলতে লাগল বোমা। মিশরীয় সৈন্যরা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল তারা। অবরুদ্ধ সিনাই অঞ্চলের মিশরীয় সৈন্যরা ছুটছে। তাদের লক্ষ্য সুয়েজ খালের পূব পাড়। জানে না তারা মিটলা ইস্রাইলীদের দখলে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা। ইস্রাইলী বিমান করছে বোমাবর্ষণ। নিহতের পাহাড় জমে উঠছে রাস্তা ঘাটে। যানবাহন পুড়ছে। রাত্রির আকাশ লাল। ইস্রাইলী পরিকল্পনা সার্থক। মৃত্যুফাঁদে পা দিয়েছে মিশরীয় সৈন্যদল। বেরুবার পথ নেই।

বুধবার সন্ধ্যায় জেরুজালেম, কিং ডেভিড, হেব্রন এবং আব্রাহাম দখল করে নিয়েছে ইস্রাইল। জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড় তার নিয়ন্ত্রণে। এ অঞ্চল ইস্রাইলী শাসনে রাখা ইহুদীদের আজীবন স্বপ্ন। কোন কথা তারা শুনবে না। রাষ্ট্রসংঘ ভাঙ্গতে পারবে না এ স্বপ্নের সার্থক রূপ। ইস্রাইলী সেনাপতিদের সুদৃঢ় সঙ্কল্প—জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড় তারা ছাড়বেন না—কোন দিনই নয়।

যুদ্ধ আরম্ভের পর ছত্রিশ ঘণ্টা চলে গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া বুঝতে পেরেছে, মিশরের ভাগ্য বিপর্যয় সম্পূর্ণ। দর কষাকষির সময় নেই। দেরী হলে আরও ভূভাগ হারাবে মিশর। আবার মস্কো-ওয়াশিংটন হটলাইন সক্রিয় হয়ে উঠল। কোসিগিন জানালেন—শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সোভিয়েট রাশিয়া রাজী।

বাদশা হুসেনের জন্য বৃটেন চিন্তিত। তার আশঙ্কা—তিনি হয়ত গদী হারাবেন। ইতিমধ্যে গুজব রটেছে—বাদশা হুসেন রোমে পালিয়েছেন। স্বস্তি পরিষদের বৈঠক বসল। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাব—বুধবার ৭ই জুন রাত্রি আটটায় (জি এম টি) যুদ্ধ বিরতি ঘটবে। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এ প্রস্তাব। আক্রমণকারী পেল না কোন ভৎ'সনা। যুদ্ধপূর্ব সীমানায় আপাততঃ ফিরে যেতে হবে না তাদের। এ প্রশ্ন আসবে পরে। ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তব্য স্পষ্ট। যুদ্ধপূর্ব এলাকায় ফিরে যাবার নির্দ্দেশ যুক্ত থাকবে মূল প্রস্তাবের সঙ্গে। মিশর, সিরিয়া এবং ইরাক প্রত্যাখ্যান করল নিঃসর্ত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব। জর্ডনী প্রধানমন্ত্রী সাদ জুমা ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণে জর্ডন রাজী।

৮ই জুন বৃহস্পতিবার। ঘটল এক অঘটন। মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ লিবার্টি আল আরিশের কাছাকাছি দরিয়ায় ঘুরাঘুরি করছিল। তার গতিবেগ ছিল পাঁচ নট। ইলেকৃট্রনিক যন্ত্রপাতিতে সাজান এ জাহাজ। ইস্রাইলীরা চালাল আক্রমণ। কোন বাধা পেল না তারা। টরপেডোর আঘাতে ফাটল ধরল জাহাজের গায়ে। আগুন জ্বলছে চারদিকে। টলতে টলতে চলছে লিবার্টি। চৌত্রিশজন অফিসার এবং নাবিক প্রাণ হারিয়েছে। মূল্যবান দলিলপত্র পুড়ে গেছে। আমেরিকা বলছে, আন্তর্জাতিক দরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল লিবার্টি। জাহাজে উড়ছিল মার্কিন পতাকা। আকাশ পরিষ্কার। ভুল বোঝাবুঝির কোন সম্ভাবনা নেই। ইস্রাইলীদের কৈফিয়ত—ভুলক্রমে আক্রমণ চলেছিল লিবার্টির উপর। ঘটনার পর কোন পক্ষই উচ্চবাচ্য বেশী কিছু করে নি। আরবদের মনে সন্দেহ—সি আই এর নির্দ্দেশে লিবার্টির উপর হয়েছে হামলা। ইস্রাইলীদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করছিল লিবার্টি। প্রমাণ লোপের জন্যই এ কারসাজি। আসল প্রশ্নের জবাব মার্কিন সরকার দেন নি। যুদ্ধ এলাকায় গোয়েন্দা জাহাজ

পাঠান হয়েছিল কেন? কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ত দুর্বল। আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে মার্কিন নাগরিকদের অপসারণ সম্পর্কে ওয়াশিংটনে সংবাদ সরবরাহের জন্য লিবার্টি গিয়েছিল সিনাইএর দরিয়ায়। সংবাদ আদান প্রদানের মার্কিনী ব্যবস্থা অত্যাধুনিক। তার জন্য গোয়ান্দা জাহাজের দরকার পড়ে না। আল আহরামের সম্পাদক মহম্মদ হেইকল লিখলেন—মার্কিন এবং বৃটিশ বিমান পাহারা দিচ্ছিল ইস্রাইলের আকাশ। আর ইস্রাইলী বিমানবহর আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর করেছিল বোমাবর্ষণ। অনুরূপ অভিযোগ এনেছেন নাসের। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাদশা হুসেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে মিশর অনুমোদন করল যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব। ইস্রাইলকে শাসানী দিল সোভিয়েট রাশিয়া। যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত না হলে তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখবেন না মস্কো। টালবাহনা করতে লাগল ইস্রাইল। মুখে বলল, আরবরা যুদ্ধবিরতি মানলে তারও আপত্তি নেই। কিন্তু রণাঙ্গনে চলল ক্ষিপ্র অগ্রগতি। সুয়েজ খালের পূবপাড় পর্যন্ত গোটা সিনাই তখনও ইস্রাইলী দখলে আসে নি। জেনারেল রবিন ঘোষণা করলেন, সিনাই, শার্ম এল শেখ এবং জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়ের আরবভূমি তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। মিশরীয় প্রতিরক্ষীরা আত্মসমর্পন করেছে। সুয়েজ খালের পূব পাড়ের বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে মিশরীর ঘাঁটি শৃঙ্খল। তার অনেকগুলোই মিশরীয় সৈন্যদের দখলে। তারা এসব ঘাঁটিতে মোতয়েন থাকতে পারলে সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হাতছাড়া হবে না। আকস্মিকভাবে যুদ্ধ বিরতির ফ্যাসাদ অনেক। শেষ মুহূর্তে যতখানি জমি পাওয়া যায় তা দখল করে নেওয়া সবারই লক্ষ্য। যে যেখানে আছে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লে সীমারেখা টানা মুস্কিল। প্রয়োজন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। অস্ত্র সম্বরণের আগের ক'ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। লড়াইটা এ সময় সাংঘাতিক রূপ

নেয়। ইস্রাইলের সুবিধা। সে বিজয়ী। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে নিজের খুশীমত লাইনে পৌঁছতে পারবে। কালহরণ তার দরকার। সিরিয়ার গোলান উপত্যকা ইস্রাইলের চাই। ওখানে হাত দেওয়া হয়নি। ওটা দখলের পর যুদ্ধবিরতি। তাই ইস্রাইলী টালবাহনা এবং তার প্রতিরোধে সোভিয়েট শাসানী।

জর্ডন এবং সিনাইএ ইস্রাইলী বিমান বহরের প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ইতস্তত সংঘর্ষ চলবে। ব্যাপক লড়াইএর সম্ভাবনা নেই। গোটা বিমান বহর নিয়ে সিরিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইস্রাইল। বোমাবর্ষণের বিরাম নেই। দশ মিনিট পর পর এক ঝাঁক বিমান আসছে এবং যাচ্ছে। গোলান উপত্যকার প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলো কাঁপছে। সিরিয়ার সৈন্যদল ভূগর্ভ আশ্রয়ে অপেক্ষা করছে। বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো হামেশাই গর্জে উঠছে। নীচে ইস্রাইলী গ্রামগুলোর উপর মাঝে মাঝে কামানের গোলা এসে পড়ছে। সিরিয়ায় গোলন্দাজদের চোখে ঘুম নেই। গত দুদিন ধরে তারাই ছিল সক্রিয়। সাঁজোয়া, ট্যাঙ্ক এবং পদাতিকরা এক পাও এগোয় নি। মিশর এবং জর্ডন পরাজিত। যথা সময়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি সিরিয়া। সে এখন একা। বৃহস্পতিবার রাত্রি তিনটা বিশ মিনিটে যুদ্ধ বিরতির কথা। চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছে স্বস্তি পরিষদ। সময় পার হয়ে গেছে। ইস্রাইল থামছে না। প্রকাশ্যে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব মেনেও সে যুদ্ধ শেষ করছে না। বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে সৈন্যদল এসে জুটছে সিরিয়ার সীমান্তে। অভিযান আসন্ন।

শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারটায় ইস্রাইল সুরু করল আক্রমণ। আইন ফিতে এবং জাওয়ার পর্বতমালা তাদের লক্ষ্য। সমতল থেকে দেড় হাজার ফিট উপরে এই ভূমি। এঁকে বেঁকে চলছে রাস্তা। যান্ত্রিক বাহিনীর চলাচলে ভয়নাক অসুবিধা। বুলডজার দিয়ে পথঘাট পরিষ্কার করতে করতে এগুচ্ছে ইঞ্জিনীয়াররা।

পিছনে সাঁজোয়া বহর। বৃষ্টিধারার মত গোলাগুলি পড়ছে। ইস্রাইলীদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। সিরিয়ার ট্যাঙ্ক গুলোর দেহ মাটির নীচে। কামানগুলো বাইরে। ওদের ঘায়েল করা কঠিন। ইস্রাইলী সৈন্যরা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠছে। দূর থেকে হাতবোমা ছুড়ছে। আর একটি গোলন্দাজ বাহিনী তেল আজাজিয়েতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিন ঘণ্টা ধরে চলেছে হাতাহাতি লড়াই। নূতন নূতন ইস্রাইলী সৈন্যদল যুদ্ধক্লান্ত সঙ্গীদের সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছে। সিরিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যরা তাদের উপর কামান দাগছে না। ওরা নীচে ইস্রাইলী গ্রামগুলোর উপর গোলাবর্ষণে ব্যস্ত। সামরিক দিক থেকে এ কসরত অর্থহীন।

দক্ষিণে গোনেন এবং আশমুরু অঞ্চলে ইস্রালীরা হানা দিয়েছে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। উত্তরের উঁচু ভূমিতে দুটি ঘাঁটি তৈরী করেছে সৈন্যদল। সারারাত্রি ধরে চলেছে ব্যূহ রচনা। সকালে সুরু হবে অভিযান। যুদ্ধবিরতির তাগিদ দিচ্ছে স্বস্তি পরিষদ। ইস্রাইলের অভিযোগ, সিরিয়া অস্ত্রসম্বরণ করছে না। ইস্রাইলীরা না থামলে সিরিয়া থামতে পারে না। এক তরফা যুদ্ধ বিরতির স্বীকৃতি দিলে মুখ থাকে না। এই মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে ইস্রাইল।

শনিবার সকালে সংগ্রামের উদ্বোধন করল ইস্রাইলী বিমান বহর। আবার প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো নিস্তেজ। সিরিয়ার সৈন্যদল দিশাহারা। সেনাপতিরা মন ঠিক করতে পারছেন না। সীমান্তের উত্তর অঞ্চলের প্রাথমিক আঘাত প্রায় সম্পূর্ণ। টেল তামারা, বনিয়াস প্রভৃতি ঘাঁটিগুলো চলে গেছে শত্রুর দখলে। আত্মসমর্পন করছে সিরিয়ার সৈন্যরা। ইস্রাইলীরা ছুটছে মাস্‌সাদার পথে। কনেইত্রার দিকে চলেছে আর একটি বাহিনী। গোনেন থেকে সাঁজোয়া বহর এগুচ্ছে ব্রাবিয়ের দিকে। পার্বত্য পথে ধীরে ধীরে যাচ্ছে ইস্রাইলী সৈন্যদল।

বাঁ দিকে মোড় নিয়ে কনেইত্রার দিকে ধাওয়া করল তারা। বেলা একটায় অবরুদ্ধ হল কনেইত্রা। আড়াইটায় ঘটল সহরের পতন। সিরিয়ার সৈন্যরা চলল দামাস্কাসে। রাজধানীর বিপদ আসন্ন। রক্ষা করতে হবে দামাস্কাস। এখানে মোকাবিলা করবে তারা ইস্রাইলীদের।

শনিবার সকালে গেলিলি সাগরের দক্ষিণ উপকূল থেকে অভিযান সুরু করেছিল ইস্রাইলী সাঁজোয়া বাহিনী। ইয়ারমুখ উপত্যকা দখল ওদের দায়িত্ব। ছত্রী সৈন্যদল নেমেছিল পিছনে। ডাবুস্‌সিয়ের মধ্য দিয়ে আর একটি সাঁজোয়া বাহিনী এগিয়ে চলেছিল। বাউটমিয়ায় তারা মিলিত হল অভিযানকারী মূল বাহিনীর সঙ্গে। সিরিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। যতটুকু বাকী ছিল তা শেষ করল ইস্রাইলী বিমান বহর। জয় সম্পূর্ণ। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যুদ্ধ বিরতিতে সম্মতি দিল সিরিয়া এবং ইস্রাইল। সরকারীভাবে ছ'দিনের যুদ্ধের পূর্ণ অবসান। গাজা, শার্ম এল শেখ, সুয়েজখাল পর্যন্ত সিনাই, জর্ডন নদীর পশ্চিম অঞ্চল এবং সিরিয়া সীমান্তের উচ্চভূমির উপর দখল নিল ইস্রাইলী বাহিনী। আরবের মহা দুর্দ্দিন। পর পর তিনটি লড়াইএ (১৯৪৮, ১৯৫৬ এবং ১৯৪৭) ঘটেছে তাদের পরাজয়। ক্ষুদ্র ইস্রাইলের কাছে ঘায়েল হয়েছে তারা বার বার। রণক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী চুরমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নাসের এবং নাসেরবাদ অপরাজিত। তাদের সৈনিক সৈন্যদল নয়, জনতা।

তেত্রিশ

সেদিন ছিল শুক্রবার (৯ই জুন)। সিরিয়ার লড়াই তখনও চলছে। বেতারে শোনা গেল নাসেরের কণ্ঠ। তিনি বলছেন—গত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা জানতে পেরেছিলাম সঙ্কট সুরু হয়েছে। সিরিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়েছে ইস্রাইল। খোলা-খুলিভাবেই একথা ইস্রাইলী রাজনৈতিক নেতা এবং সমর নায়করা ঘোষণা করেছেন। প্রমাণের অভাব নেই।

সিরিয়া থেকে এবং আমাদের নিজস্বসূত্রে এ সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম। মে মাসের প্রথমভাগে মিশরীয় পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল সফর করছিলেন মস্কো। সেখানেও তাঁরা শুনেছিলেন ইস্রাইলী ষড়যন্ত্রের কাহিনী। নীরবে ইস্রাইলী হুমকীর কাছে নতি স্বীকার আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিপদে আপদে, সুখে-দুঃখে এবং জয়-পরাজয়ে সবার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে আমরা অভ্যস্ত। গত ক'দিনে মিশরের বিপর্যয় ঘটেছে। সব দায়িত্ব আমি নিজে নিতে ইচ্ছুক। এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। সরকারী পদে ইস্তাফা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সব দায়িত্বও ছেড়ে দিচ্ছি। আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিরে যাব। তাদের সঙ্গে একযোগে আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করব। জাকারিয়া মহীউদ্দীন হবেন মিশরের প্রেসিডেণ্ট।

এই ঘোষণার জন্য তৈরী ছিল না আরব জনতা। যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়েও নাসেরের পদত্যাগ সাংঘাতিক। জাতির অন্তরের মণিকোঠায় তাঁর স্থান। তিনি জয়-পরাজয়ের উর্দ্ধে। গোটা মিশর হতবাক। পরাজয়ের শোক ভুলে গেছে সাধারণ মানুষ। যুদ্ধে জিতেছে ইস্রাইল। চূড়ান্ত বিজয় এখনও বাকী। সেনাবাহিনীর সংগ্রাম

আপাতত শেষ হয়েছে। জনতার সংগ্রাম চলছে এবং চলবে। তাদের পরিচালনা করবেন নাসের। তিনি রাষ্ট্রের হাল ছাড়লে তারা কার মুখের দিকে তাকাবে? নাসেরহীন মিশর মৃত আরবের কবর। সারা দুনিয়া বিস্মিত। অদ্ভুত এই মানুষটি। নিজের দোষ ঢাকার নেই কোন কসরত। ব্যর্থতার জন্য কাউকে করছেন না দায়ী। নেই কোন ক্ষমতার মোহ। নিজের কাঁধে সব দোষ চাপিয়ে বিদায় নিচ্ছেন নব মিশরের জন্মদাতা।

প্রথম ধাক্কা কাটল নীরবে। তারপর দেখা গেল প্রতিক্রিয়া। মিশরের সাধারণ নরনারী পাগল। তারা ছুটেছে কায়রোর পথে। আকাশ ভরে উঠছে তাদের আওয়াজে—নাসের জিন্দাবাদ। তাঁকে আমরা চাই। আরব দুনিয়ার দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে প্রতিধ্বনি। যুদ্ধে পরাজিত নেতার জন্যে এই উন্মাদনা এক অভূত-পূর্ব ঘটনা। ক'ঘণ্টা পরেই ঘোষণা করলেন নাসের—তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনায় রাজী। প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগ পত্র গ্রহণের অধিকারী জাতীয় পরিষদ। শনিবার বসল অধিবেশন। নাসেরের পদত্যাগ পত্র গ্রহণে সবাই অনিচ্ছুক। জাকারিয়া মহীউদ্দিন বললেন—আমি প্রেসিডেণ্টের পদ নেব না।

কায়রোর জনপথে উদ্বিগ্ন নরনারীর অবিশ্রান্ত প্রবাহ। আত্মহত্যা করছে কেউ কেউ। জনতার স্নেহের বন্দী নাসের। ঘোষণা করলেন—পদত্যাগের সিদ্ধান্ত তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। প্রেসিডেণ্টের পদে যথারীতি বহাল থাকবেন। আশ্বস্ত হল অশান্ত জনতা। ইউরোপ হতভম্ব। এই মহাদেশের রাষ্ট্রগুলো ঘর গুছিয়ে নিয়েছে অনেক আগেই। জাতির জনকেরা শতাব্দীর কবরের নীচে চিরনিদ্রায় মগ্ন। তাদের সমাধিতে ফুলের মালা দেয় না কেউ। যারা এখন রাষ্ট্রের কর্ণধার তারা শাসক, জননেতা নন। রাষ্ট্র পরিচালনার সার্থকতা এবং ব্যর্থতার মধ্যে ঘটে তাঁদের উত্থান পতন। প্রাচ্যের রাজনীতি আলাদা। এখানে চলেছে উন্নয়ন এবং সংহতির

আপ্রাণ চেষ্টা। বিদেশী শাসকদের শোষণ জ্বালার জের কাটে নি। জাতির জনকেরা জীবন্ত। জনমানসে তাঁদের পুঁজি অফুরন্ত। সৈন্যবাহিনীর হার-জিতে এ পুঁজিতে বড় একটা টান পড়ে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের সূচনাতেই অপঘাতে প্রাণ দিলেন মুসোলিনী। তাঁর শব নিয়ে চলল নারকীয় তাণ্ডব। সিনাইএর রণক্ষেত্রে উত্তপ্ত বালুপ্রান্তরে নাসেরকে ফেলে দিল ইস্রাইল। মিশরীয় জনতা তাঁকে তুলে নিল নিজেদের মাথায়। ইউরোপীয় রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের কাছে প্রাচ্য রাজনীতি একটা বিরাট রহস্য। এই রহস্যভেদের অক্ষমতার জন্যই হোঁচট খান তাঁরা পদে পদে। বিশ্লেষণে থাকে মারাত্মক ভুলভ্রান্তি। সরকারী নীতিতে আসে বিভ্রান্তি। সুরু হয় মন কষাকষি। বৃটিশ সাংবাদিকদের অনেকে উন্নাসিক। বকেয়া সাম্রাজ্যবাদী গৌরবে তাদের দৃষ্টি ঝাপসা। তারা ভাবেন—বৃটেন দুনিয়ার শিক্ষক। ছাত্র হতে সে নারাজ। অজ্ঞতা ঢাকতে গিয়ে চলে উদ্ভট কাহিনীর অবতারণা।

বুধবার (সাতই জুন) লণ্ডনের আকাশ বাতাস গুজবে ভরপুর। ইস্রাইল জিতেছে। মিশরীয় বাহিনী ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। নাসেরের পতন আসন্ন। ইভিনিং স্টাণ্ডার্ডের পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ জন কিমচে। সাতই জুন তিনি লিখলেন, সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন নাসের। সৈন্য বাহিনীতে তাঁর বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ। গত রাত্রে হয়ত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। সিনাই অঞ্চলের সৈন্যাধক্ষ জেনারেল মোরটাগী গোটা মিশরীয় বাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছেন। বি বি সির মাইলস কোপল্যাণ্ড বললেন—কিছুদিন থেকেই চলছিল নাসেরকে সরাবার কথাবর্তা। আরব সোসালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতির পদ নিয়েই হয়ত নাসেরকে এখন খুশী থাকতে হবে। বৃটিশ বিশেষজ্ঞদের এতসব জল্পনা কল্পনার মধ্যে খবর এল, ৯ই জুনের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন নাসের। প্রেসিডেণ্টের পদে তিনি ফিরে

গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পদটিও নিজের হাতে নিয়েছেন। কিন্তু মার্শাল আমের, সিনাইএর কম্যাণ্ডার জেনারেল মোরটাগী, বিমান বহরের বড় কর্ত্তা মহম্মদ মামুদ এবং নৌবহরের প্রধান সোলিমন ইজ্জাত পদত্যাগ করেছেন। নাসের তাদের পদত্যাগে সম্মতি দিয়েছেন। সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই রয়েছে। প্রধান সেনাপতির পদ পেয়েছেন জেনারেল ফৌজী। জাকারিয়া মহীউদ্দিন এবং আলী সাব্রি হয়েছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি আগের চেয়ে আরও বেশী শক্তিশালী।

এত সহজে নাসেরকে রেহাই দেওয়া পশ্চিমী বিবেকে বাধে। গুজব কিছুতেই থামে না। বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যবহুল সংবাদের বিরাম নেই। কারও মতে বন্দুক উঁচিয়ে নাসেরকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন সেনাপতিরা। জনসাধারণের মধ্যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখে হাতের পুতুল হিসাবে তাঁকে রেখে দিয়েছেন তারা। কারও কারও ধারনা, নাসের দেশছেড়ে পালিয়েছেন। টেলিভিশনে তাঁকে দেখা যাচ্ছেনা। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? বৃটিশ সাংবাদিকরা আঁকছেন মিশরের ভয়াবহ চিত্র। পরাজিত রাষ্ট্রের দুর্বিসহ অবস্থা খুবই স্বাভাবিক। প্রায় পাঁচ ছ' হাজার মিশরীয় সৈন্য ইস্রাইলের হাতে বন্দী। আহতেরা মরুভূমিতে ছটফট করছে। যারা বেঁচে আছে তারা সুয়েজ খালের দিকে এগুচ্ছে। খাদ্য নেই, জল নেই এবং মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই। পা চলে না। তবু তারা চলছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ দুর্গত উদ্ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিশরের সমরশক্তি একেবারে নিঃশেষিত। যুদ্ধের আগে এল আরিশ থেকে তেল আবিবে জঙ্গী বিমান পৌছতে সময় লাগত সাড়ে চার মিনিট। কায়রো আসতে ইস্রাইলী বিমানের দরকার পড়ত পঁচিশ মিনিট। যুদ্ধের পর সব ওলটপালট হয়ে গেছে। সুয়েজ খালের পূব পাড়ের ঘাঁটি থেকে ইস্রাইলীরা এখন সাড়ে চার মিনিটের মধ্যেই কায়রোর

উপর বোমা ফেলতে পারে। মিশরীয়দের কাছে তেল আবিবের দূরত্ব বেড়েছে। সুয়েজ উপসাগরের প্রান্তিক এলাকা রাস সুদর। এখানে প্রতিদিন সংগৃহীত হয় দেড়লক্ষ ব্যারেল তৈল। এ সম্পদ ইস্রাইলের দখলে। চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নাসের টিকে আছেন কি করে? জনতা তাঁকে মাথায় তুলে নাচে কেন? জবাব খুঁজে পান না বৃটিশ বিশেষজ্ঞ মহল। তাদের সর্বশেষ সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত —ক্ষয়ক্ষতির আসল হিসাব দেওয়া হয় নি জনসাধারণকে। গোটা জাতিকে বেকুব বানিয়ে রেখেছেন নাসের। যেদিন সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে সেদিন মিশরীয় ডিক্টেটর ছিটকে পড়বেন। নূতন আশায় বুক বাধল বৃটেন।

ইস্রাইল বেপরোয়া। তার আস্ফালন বাড়ছে। যুদ্ধ জয়ের নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে। মিশর অসহায়। তার নিরাপত্তা ইস্রাইলী সমর নায়কদের দয়ার উপর নির্ভরশীল। পশ্চিম এশিয়ায় শক্তিসাম্য ভেঙ্গে পড়েছে। সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে ইস্রাইল। খুশীমত যেখানে সেখানে সে ছোঁবল মারবে। একমাত্র ভরসা সোভিয়েট রাশিয়া। নূতন ষ্ট্র্যাটেজী নিয়েছেন মস্কো। যুদ্ধ থেমেছে। আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে ইস্রাইলের উপর। তার জমির ক্ষুধা বাড়তে দেওয়া চলবে না। মিশরের ভাঙ্গা মেরুদণ্ড আবার জোড়া লাগাতে হবে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। ১০ই জুন ইস্রাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল সোভিয়েট রাশিয়া। মস্কোতে বসল কমিউনিস্ট শীর্ষ সম্মেলন। যোগ দিল বালগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্বজার্মানী, হাঙ্গেরী। পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া এবং সোভিয়েট রাশিয়া। মার্কিন-ইস্রাইলী আঁতাতের নিন্দা করল তারা। ভারতের জনমত বিক্ষুব্ধ। স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ মূল স্রোত থেকে সরে দাঁড়াল। তাদের যুক্তি— পাক-ভারত লড়াইএর সময় মিশর ভারতকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয় নি। নিরপেক্ষের ভূমিকা নিয়েছিলেন নাসের। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট

আয়ুব খানের পুত্র গহর অভিযোগ আনলেন, মিশরের উপর ইস্রাইলী আক্রমণে গোপন মদত দিয়েছে ভারত।

যুদ্ধবিরতির পর এক সপ্তাহও কাটে নি। ছোটখাট সংঘর্ষ সুরু হয়েছে সুয়েজ খালের চারদিকে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন বসবে নিউইয়র্কে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন রওনা হয়েছেন আমেরিকায়। অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধান যাচ্ছেন এ অধিবেশনে যোগ দিতে। ভারত থেকে গিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাগলা। নিউইয়র্ক যাবার পথে কোসিগিন প্যারিসে দেখা করলেন দ্য গলের সঙ্গে। তিনি থামলেন না লণ্ডনে। বৃটিশ প্রেষ্টিজে আঘাত লাগল। আন্তর্জাতিক সঙ্কটে তার মতামতের দাম দেয় না কেউ। সবাই আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত। সম্প্রতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন দ্যগল। তাঁর স্পষ্ট কথা পছন্দ করে না অনেকে। কিন্তু গুরুত্ব দেয় সবাই। ১৭ই জুন সুরু হল সাধারণ পরিষদের অধিবেশন। বিতর্কের উদ্বোধন করলেন প্রেসিডেণ্ট জনসন। মিশরের উপর ইস্রাইলী আক্রমণের নিন্দা করে এবং যুদ্ধপূর্ব সীমানায় ইস্রাইলী বাহিনীকে ফিরে যাবার নির্দ্দেশ দিয়ে প্রস্তাব উঠালেন কোসিগিন। জোরাল ভাবে তাঁকে সমর্থন করলেন চাগলা। বেঁকে বসল আমেরিকা। তার লেজুড় ধরল বৃটেন। ব্যর্থ হল সাধারণ পরিষদ। কোন প্রস্তাবই নিতে পারল না বিশ্বসভা। লুটের মাল ভোগ করার সুযোগ পেল ইস্রাইল। তার সাহস বেড়েছে। সে জানে আমেরিকা সঙ্গে থাকলে ভয়ের কিছু নেই। ক্ষমতার অবস্থান থেকে দর কষাকষি করতে পারবে সে। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে টানা হয়েছে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা। নিজের এলাকা দিয়ে গানবোট চালাতে চায় ইস্রাইল। কিছুতেই তা দেবে না মিশর। উত্তেজনা বাড়ছে। নাসের উদ্বিগ্ন। বড় রকমের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা তাঁর নেই। ইঙ্গ-মার্কিন পাল্লায় পড়ে রাষ্ট্রসংঘ বৃহন্নলা। কোসিগিন ব্যর্থ।

প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছে ক'বার। অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা কম।

এই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে সোভিয়েট চীফ অফ স্টাফ মার্শাল ঝাখরোভ এক প্রতিনিধি দল নিয়ে এলেন কায়রোতে। মিশরকে অস্ত্রসরবরাহ করবে সোভিয়েট রাশিয়া। সিনাইএর সামরিক ক্ষতিপূরণ খুবই দরকার। তা না হলে ইস্রাইলী আস্ফালন কমবে না। আরবের নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসবে না। সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট পদগর্নী তিনদিন কাটালেন নাসেরের সঙ্গে। তেরটি সোভিয়েট যুদ্ধজাহাজ নোঙ্গর করল পোর্ট সৈয়দ এবং আলেকজান্দ্রিয়ায়। এ্যাডমিরাল মোলটসব বললেন—তাঁর জাহাজগুলো যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধে দৃঢ়সঙ্কল্প। আরব ছুনিয়া ফেলল স্বস্তির নিঃশ্বাস। নাসের কৃতজ্ঞ। বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া। তার সামরিক আশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। ২৪শে জুন প্রেসিডেন্ট পদগর্নী ফিরে গেলেন মস্কো। ২৫শে জুন থেকে সুরু হল মিশরে সোভিয়েট সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ। এবার আমেরিকার উদ্বেগের পালা। তার আশ্রিত ইস্রাইলকে দেখাশোনার মাত্রা একটু বাড়ান দরকার।

পশ্চিম এশিয়ার তৈল আমদানী বন্ধ হওয়ায় বৃটেন পড়েছিল বিপদে। এ তৈলের উপর নির্ভর করে তার শিল্প। সুয়েজ খাল বন্ধ। বৃটিশ রপ্তানীপণ্য উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যায় প্রাচ্যে। পথ-খরচা বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের দামও হয় উর্দ্ধমুখী। প্রতিযোগিতার বাজারে বৃটেনের পিছু হটার সম্ভাবনা বেশী। আরবের তৈল পাওয়া না গেলে বিকল্প ব্যবস্থার দরকার। একমাত্র ভরসা আমেরিকা। তার তৈলে হাত দিতে গেলে চড়া দাম পড়বে। ব্যবসা নিয়ে বৃটেন পড়ল মহা ফাপরে। তবে মুস্কিলটা তার একার নয়। আরবের তৈল রাষ্ট্রগুলোরও। তৈলের রয়েলিটি তাদেরও দরকার। একটি বাজার নষ্ট হলে আর একটি বাজার খুঁজে বার করাও সহজ

নয়। সৌদী আরব তৈলের রাজা। বাদশা ফয়জল মনেপ্রাণে নাসের বিরোধী। আরব জনতার ভয়ে বৃটেন এবং আমেরিকায় তৈল সরবরাহ বন্ধ করেছিলেন তিনি। আবার তৈল সরবরাহ আরম্ভের জন্য মন উসখুস করছে বাদশার। তৈল শ্রমিকরা নাসের সমর্থক। বাদশার মর্জিমত তারা চলে না। যে কোন সময় ওরা ধর্মঘট করবে। পাইপ উড়িয়ে দেবে। বাদশা ফয়জল করে নিলেন একটা আপোষ মীমাংসা। সুয়েজ খালের আয় বন্ধ হয়েছে। টাকার প্রয়োজন মিশরের বড় বেশী। ইউরোপে যাবে সৌদীর তৈল। নাসের পাবেন সৌদীর টাকা। জর্ডনের বাদশা হুসেনের ভাগ্যেও জুটবে ছিটেফোঁটা। কোয়েট এবং লিবিয়া নিল সৌদীর পথ। স্বাক্ষরিত হল খার্তুম চুক্তি। মিশর পাবে বছরে ন'কোটি পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড। তৈলবাদশারা সঙ্কট এড়ালেন। বৃটেনেরও ফাড়া কাটল।

পোর্ট সৈয়দ এবং আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে নোঙ্গর ফেলে রয়েছে সোভিয়েট যুদ্ধ জাহাজগুলো। কায়রোতে বসেছে পাঁচটি আরব রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন। যোগ দিয়েছে সুদান, জর্ডন, আলজেরিয়া, ইরাক এবং সিরিয়া। বাদশা হুসেনের অস্বস্তি বাড়ছে। সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। আরব-ইস্রাইলী বিরোধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে তাঁর গদীর আশঙ্কা তত বাড়বে। উগ্রপন্থী গেরিলারা রাজতন্ত্রের গলা টিপে ধরবে। বাদশা হুসেন চান এককভাবে ইস্রাইলের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নিতে। আরব শীর্ষসম্মেলন তাঁকে এ অধিকার দেবে না। প্রথম দিনের বৈঠক শেষেই বাদশা হুসেন পাড়ি জমালেন জর্ডনে। তাঁর বাবা আবদুল্লা ইস্রাইলের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন আততায়ীর গুলিতে। সব কথা মনে আছে বাদশা হুসেনের। তিনি ভয়ে কাঁপছেন। দুদিন পর বেরুল শীর্ষ সম্মেলনের যৌথ ইস্তাহার—এককভাবে কোন আরব রাষ্ট্র

ইস্রাইলের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বসতে পারবে না। উভয় সঙ্কটে পড়লেন জর্ডনের বাদশা। সামনে ইস্রাইল পিছনে জাতীয়তাবাদী শক্তি। উভয়েরই বন্দুকের নল তাঁর দিকে।

২৭শে জুন নূতন জেরুজালেমের সঙ্গে পুরনো জেরুজালেমের মিলন ঘটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইস্রাইলী পার্লামেন্ট নেসেৎ। ওটা যথারীতি কার্যকর হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের বারণ শোনে নি তারা। নিন্দা প্রস্তাবও গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি। গোটা জেরুজালেম এখন ইস্রাইলী সাংবিধানিক আওতায়। স্থিতাবস্থার পরিসর যাচ্ছে কমে। ইস্রাইলী মতলব নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে সারা দুনিয়ায়। যুদ্ধপূর্ব সীমান্তে সে ফিরে যাবে না। সীমান্ত পুনর্বিন্যাস তার লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে সে অধিকৃত আরবভূমি ছাড়বে না। টালবাহনা করে সময় কাটাবে। উনত্রিশে জুন ডেভিড বেন গুরিয়ন বলেছেন, তিরাণ প্রণালী এবং সুয়েজখালে ইস্রাইলী জাহাজ চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। জেরুজালেম এবং হেব্রন থাকবে ইস্রাইলী দখলে। জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়ের জনগণ পাবে স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু এ অঞ্চলের সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করবে ইস্রাইল। জেনারেল দেয়ান চরমপন্থী। তাঁর অভিমত—গাজা এবং জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়ের এলাকা কোনমতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। তিরাণ প্রণালীতে ইস্রাইলী জাহাজ চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত শার্ম এল শেখ ইস্রাইলী দখলে থাকবে। সুয়েজেও থাকা চাই ইস্রাইলী জাহাজ চলাচলের অবাধ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। ইস্রাইল সরাসরি আপোষ আলোচনা চালাবে প্রত্যেকটি আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে পৃথকভাবে। তাদের যৌথ আপোষ প্রচেষ্টা সে স্বীকার করবে না। প্রধানমন্ত্রী এস্কোল এগারই জুন বলেছিলেন—ইস্রাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার উপর ঘনিয়ে এসেছিল ধ্বংসের বিভীষিকা। আরব রাষ্ট্রগুলো বহুদূরে এগিয়ে

গিয়েছিল। এখন সব প্রতিবন্ধক সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলোকে আর মাথা তোলার সুযোগ দেবে না ইস্রাইল।

অধিকৃত আরব এলাকায় বিজিতদের উপর করছে ইস্রাইলীরা হৃদয়হীন ব্যবহার। উত্তেজনার ইন্ধন জড় হতে লাগল প্রতিদিন। যুবমনে দেখা দিল নিদারুণ প্রতিক্রিয়া। তাদের মর্ম্মব্যথা এবং প্রতিকারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত করলেন নাসের। ২৩শে জুলাই কায়রোর বক্তৃতায় তিনি বললেন—মিশরীয় বাহিনীর পুনর্গঠন চলছে। ইস্রাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরাম ঘটবে না। সংঘবদ্ধ আরবশক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়েছে।

আরব জনতা বিশ্বাস করে নাসেরকে। তাঁর হুমকী শূন্যগর্ভ আস্ফালন নয়। নূতন করে অস্ত্রসজ্জা নিচ্ছে মিশরীয় বাহিনী। সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপ তাকে দিচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। মন্ত্রি-সভায় পুণর্গঠন সম্পূর্ণ। জুনের লড়াইএর পরাজয়ের জন্য যারা দায়ী তাদের বিচারের জন্য বসেছে সামরিক আদালত। প্রধান আসামী ফিল্ড মার্শাল আমের। আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে তাঁর। মিশরীয় বিপ্লবের তিনি অন্যতম নেতা। তাঁর অবমাননায় নাসের মর্ম্মাহত। রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য কাউকে খাতির করে না। বিমান বহরের কর্ত্তাদের উপর রাগ সবার। তারাই এনেছে মিশরের সামরিক বিপর্যয়। রণক্ষেত্রে সেনাপতিরাও উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। জনতা চায় বিচার।

আগস্ট মাসে খবর পাওয়া গেল আমের নজরবন্দী। তিনি নাসেরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটছিলেন। ক্ষমতা দখল নাকি তাঁর উদ্দেশ্য। এ সংবাদ কতখানি সত্য, তা নিশ্চয় করা বলা মুস্কিল। নাসেরের জীবিত অবস্থায় তাঁর বিকল্প মিশরে নেই। নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে আমের কখনই ক্ষমতা দখল করতে পারেন না। জনগণ তা মানবে না। নাসের উচ্ছেদের চেষ্টার অর্থ গৃহযুদ্ধ। এযুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের পতন অনিবার্য। এ সত্য

আমেরের অজানা থাকার কথা নয়। তিনি অস্থির চিত্ত। তাঁর চরিত্রে ছিল আত্মসংযমের অভাব। দুর্বল মুহূর্ত্তে তিনি অবাস্তব কল্পনায় সায় দিয়েছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। সামরিক আদালতের সামনে তাঁকে অবশ্যই পরাজয়ের কৈফিয়ৎ দিতে হত। দিন যতই এগিয়ে আসছিল আমের ততই অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। ব্যর্থতা ঢাকার কোন পথ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রে তিনি খেলেন ঘুমপাড়ানী টেবলেট। মাত্রা ছিল খুব বেশী। আমের ঘুমিয়ে পড়লেন। আর জাগলেন না। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করলেন ফিল্ড মার্শাল আমের। ব্যক্তিগত জীবনে নাসেরের উপর একটি প্রচণ্ড আঘাত। সুখদুঃখের সঙ্গী চলে গেলেন। রাষ্ট্রীয় মার্যাদায় তাঁকে সমাহিত করার সুযোগ পেলেন না তিনি। যুদ্ধের পরাজয় সব ওলটপালট করে দিয়েছে। কর্ত্তব্য এবং শৃঙ্খলা বড়। আবেগের স্থান গৌণ। ক'মাস ধরে চলল বিচার। ১৯৫৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বেরুল রায়। বিমান বহরের প্রাক্তন কম্যাণ্ডার জেনারেল মহম্মদ সিদকী মামুদ পেলেন পনের বছরের কারাদণ্ড। আরও জনাকয় সেনাপতির ভাগ্যে জুটল বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাস। লঘু দণ্ডের প্রতিবাদে কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় দেখা দিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। যুব সমাজ উত্তাল। তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন নাসের। হাঙ্গামা থামল। নাসের বুঝলেন, পুরনো যুগ শেষ হতে চলেছে। নূতন যুগের আবির্ভাব ঘটছে। এ যুগের সৈনিক তরুণ সম্প্রদায়। তারা চরম পথের যাত্রী। তাঁর অবর্ত্তমানে এদের ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতা কারও থাকবে না।

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছেন নাসের। যুদ্ধে পরাজয় এবং আমেরের আত্মহত্যা বিকল করে ফেলেছে তাঁকে। দেহ এবং মন একসঙ্গে চলতে চায় না। বিশ্রাম নেই। রাত্রে চারঘণ্টার বেশী ঘুমাবার সময় পান না তিনি।

পুরনো দিনের বিপ্লবী সহকর্মীরা একে একে চলে যাচ্ছেন। যারা আছেন তাঁরা কাছে থেকেও অনেক দূরে। ব্যবধানের বিরাট গণ্ডী কাটিয়ে অতি কাছে আসতে পারেন না কেউ। মাঝে মাঝে দেখা করতে আসেন আল আহরামের সম্পাদক মহম্মদ হেকল। গল্প গুজব জমে ওঠে। একটু হাঁফ ছাড়েন নাসের। হঠাৎ ছেদ পড়ে আলাপে। আবার সেই জরুরী সংবাদ! সুয়েজ খালের পাড়ে হানা দিয়েছে ইস্রাইল। সংঘর্ষ চলছে।

যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা উত্তপ্ত। অধিকৃত আরব এলাকা গুছিয়ে নিতে চায় ইস্রাইল। লুটকরা সম্পত্তির উপর ভোগদখলের অধিকার তাকে দেবে না আরব। হানাদারী এবং পাল্টা হানাদারী লেগেই আছে। নৌ এবং বিমানও তাতে যোগ দিচ্ছে। আরব গেরিলাদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ওরা বেপরোয়া। প্রাণের মায়া নেই। ইস্রাইলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে তারা দৃঢ়সঙ্কল্প। প্যালেস্টাইনে যারা বাড়ীঘর হারিয়েছে তাদের আক্রোশ প্রবল। নির্ম্মম প্রতিশোধ নিচ্ছে ইস্রাইল। আরব গেরিলাদের আশ্রয়দানের সন্দেহে নির্বিচারে অধিকৃত এলাকার আরব জনপদ পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে ইস্রাইলী সৈন্যরা। মাঝে মাঝে জর্ডন এবং মিশরের উপর চলছে ইস্রাইলী আক্রমণ। সমানতালে লড়ছে মিশরীয় বাহিনী। স্বস্তি পরিষদে বইছে উত্তেজনার ঝড়। পর্যবেক্ষক দল গেছেন সংঘর্ষ এলাকায়। ইস্রাইল করছে টালবাহনা। দীর্ঘ টানা হেঁচড়ার পর তারা ঘাঁটি গেড়েছেন যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর। ২২শে নভেম্বর (১৯৫৬) স্বস্তি পরিষদ নিয়েছে প্রস্তাব। ইস্রাইলী বাহিনীকে ফিরে যেতে হবে যুদ্ধপূর্ববর্ত্তী সীমানায়। ডঃ ইয়ারিং নিয়েছেন আপোষ আলোচনার দৌত্যের ভার। সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্টের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কাজ করবেন পশ্চিম এশিয়ায়।

নিয়মিতভাবে সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে মিশরে। কড়া শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীতে। নাসের মন দিয়েছেন

আভ্যন্তরীণ সংস্কারে। প্রশাসনে যুবশক্তি কাজে লাগাবার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি। ঢেলে সাজাচ্ছেন আরব সমাজতন্ত্রী ইউনিয়ন। সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাতিকে। আসোয়ান বাঁধের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে পুরোদমে। আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ছে। সুয়েজের আয় বন্ধ হওয়ায় ভেঙ্গে পড়ে নি মিশর। তার অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত। তৈল রাষ্ট্রগুলো থেকে সে পাচ্ছে বছরে ন'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড। আর্থিক অভাব তার খানিকটা মিটেছে। ডঃ ইয়ারিং ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। আপোষের কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। ইস্রাইলী বাহিনী যুদ্ধপূর্ব সীমানায় ফিরে যাবে। কিন্তু কবে যাবে তার কোন নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করে দেয়নি স্বস্তি পরিষদ। আগে ইস্রাইলের যুদ্ধ-পূর্ববর্ত্তী সীমানায় প্রত্যাগমন এবং পরে আলোচনা—দাবী জানাচ্ছে আরব। আগে ইস্রাইলের নিরাপত্তার সহায়ক সীমানা বিন্যাসের চুক্তি এবং পরে নূতন সীমানায় প্রত্যাগমন—ইস্রাইলের শেষ কথা। অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিম এশিয়ায়। আপোষ আলোচনার মূল কেন্দ্র স্বস্তি পরিষদ ছেড়ে এসেছে আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার আওতায়। মার্কিন কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে। মিশর পাচ্ছে সোভিয়েট অস্ত্র। মনে পড়েছে শক্তি সাম্যের কথা। তারাও পাঠাচ্ছেন মার্কিন অস্ত্র এবং বিমান ইস্রাইলে। প্রাকযুদ্ধ অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে পশ্চিম এশিয়া। ডঃ ইয়ারিং ব্যর্থ। মরীচিকার পিছনে ছুটছেন তিনি।

১৯৫৬ সালের প্রথম ক'টি মাস কেটেছে নিদারুণ দুশ্চিন্তায়। অধিকৃত আরবভূমি উদ্ধারে নাসের প্রতিশ্রুত। তাঁর সৈন্যবাহিনী অপেক্ষাকৃত সংহত। জঙ্গী বিমানগুলো সামনাসামনি লড়াইএ ভয় পায় না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের সব পথ প্রায় বন্ধ। যুদ্ধ হয়ত অনিবার্য। কিন্তু তার জন্য এখনও তৈরী নয় আরব। অধীর হয়ে পড়ছে জনতা। তার সুযোগ নিচ্ছে

গেরিলারা। দলে দলে তরুণেরা যোগ দিচ্ছে গেরিলা বাহিনীতে। তারা পরিণত হচ্ছে তৃতীয় শক্তিতে। উগ্রপন্থীদের বাগে রাখা শক্ত। দলে উপদলে বিভক্ত গেরিলারা। প্রধান দল আল ফাতা সংযত। কিন্তু পপুলার ফ্রন্ট দুর্নিবার।

জুলাই মাসে নাসের গেলেন মস্কো সফরে। ফিরে এলেন ক'দিন পরেই। হঠাৎ খবর রটল নাসের অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য আবার যাচ্ছেন মস্কো। চারিদিকে উদ্বেগের ছায়া। কি অসুখ জানে না সাধারণ মানুষ। সরকারী বিবরণ অস্পষ্ট। বহুমূত্র রোগ। তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পায়ে। অনেকের আশঙ্কা, তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসছে। তিনি হৃদরোগে ভুগছেন। প্রায় দু'সপ্তাহ মস্কোতে কাটিয়ে নাসের ফিরলেন মিশরে। হাঁফ ছাড়ল সবাই। তিনি সুস্থ এবং কর্মক্ষম। দিনে কাজ করছেন প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা।

চৌত্রিশ

আরব জাতীয়তাদের ধারা চলেছে অব্যাহত গতিতে। রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছেন নাসের। নাসেরবাদের জয়যাত্রা থেমে যায় নি। লিবিয়ায় ঘটেছে সামরিক অভ্যুত্থান। বাদশা ইদ্রিস সফর করছিলেন তুরস্কে। তাঁর অনুপস্থিতিতে শাসনভার হাতে নিলেন কর্ণেল কাদ্দাফি। বৃদ্ধ ইদ্রিস হারালেন গদী। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ। কাদ্দাফির শক্তির উৎস নাসের। তিনি সমাজতন্ত্রী এবং মিশরের অকৃত্রিম সমর্থক। বৃটেন এবং আমেরিকা উদ্বিগ্ন। বিরাট সামরিক ঘাঁটি রয়েছে তাদের লিবিয়ায়। ১৯৫৬ সালে ইঙ্গ-ফরাসীর সুয়েজ অভিযানে লিবিয়ার ঘাঁটি ছিল কর্মচঞ্চল। আরবদের ধারণা, ১৯৫৬ সালের আরব-ইস্রাইল লড়াইএ লিবিয়ার বিমান ঘাঁটি আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার

করেছিল আমেরিকা। ক্ষমতা গুছিয়ে নেবার পরই কাদ্দাফি দাবী জানালেন—লিবিয়ার ঘাঁটি ছাড়তে হবে বৃটেন এবং আমেরিকাকে। এ দাবী না মেনে উপায় নেই। অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায়, কিন্তু জাতীয়তাবাদকে নির্মূল করা চলে না। পশ্চিম এশিয়ায় ইঙ্গো-মার্কিন তৈলস্বার্থ বিপন্ন। একে একে নিভছে রাজতন্ত্রীদের দীপাবলী। কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটিগুলো ধ্বসে পড়ছে। সৌদী আরবের বাদশা ফয়জল জাতীয়তাবীদের নজরবন্দী। খুশীমত কোন কাজ করা তাঁর সাধ্যাতীত। নাসেরের পতন বাদশার ঐকান্তিক কাম্য। কিন্তু সঙ্কটকালে তাঁকে অন্তত মৌখিক সমর্থন জানানো আবশ্যক। নইলে বিপন্ন হয়ে পড়বে তাঁর গদী। জর্ডনে চলছে দ্বৈত শাসন। একদিকে বাদশা হুসেন এবং অপর দিকে প্যালেস্টাইন গেরিলারা। কেউ কাউকে মানেন না একে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে—পরিণাম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। পারস্য উপসাগরের তৈল শেখরা ভয়ে তটস্থ। জাতীয়তাবাদীরা হানা দিচ্ছে তাদের শক্তি কেন্দ্রগুলোতে। অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। যারা টিকে আছেন তাঁরা মুক্তি ফৌজদের অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল। ইউরোপীয় স্বার্থের একমাত্র শক্ত ঘাঁটি ইস্রাইল। এই রাষ্ট্রটিই রুখতে পারে আরব জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণ। ওর হাত দুর্বল করা চলবে না।

বৃটেন এবং আমেরিকার কূটনীতি চলেছে দুটি বাধা পথে—ঐশ্লামিক গোড়ামীতে মদত দান এবং ইস্রাইলকে শক্তিশালী করে তোলা। রাজতন্ত্রীরা ইসলাম বিপন্নের জিগিরে বিশ্বাসী। সৌদী আরবের বাদশা ফয়জল, জর্ডনের বাদশা হুসেন এবং ইরানের শাহ মহম্মদ রেজা পহলেভি এ গোড়ামীর প্রেরণার উৎস। তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধা তুরস্ক এবং পাকিস্তান। বাদশা ফয়জল ওহাবিস সম্প্রদায়ের নেতা। বাদশা হুসেন হাশেমাইত সুলতান। ধর্মীয় চিন্তাধারায় এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আদায় কাচকলায়।

পারস্যের শাহ আবার শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। কিন্তু ইসলাম বিপন্নের ধুয়ায় তাঁরা অভিন্ন। জাতীয়তাবাদের ভীতি প্রবল। কায়েমী স্বার্থরক্ষার তাগিদে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলান ছাড়া উপায় নেই। তুরস্ক আলাদা। তুর্কীদের সঙ্গে আরবের মনোমালিন্য পুরনো। আরব জয় করেছিল তুরস্ক। তাদের চোখে তুর্কীরা কুলীন মুসলমান নয়, আনসার। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন আরবভূমি শাসন করেছে তুরস্ক। ওদের কাছে আরবেরা প্রাক্তন প্রজা। তুরস্কের চক্ষুশূল নাসের। তিনি আরব দুনিয়ায় পশ্চিমী শক্তিজোটের বিরোধী। সাইপ্রাসে গ্রীক সিপ্রিয়টদের মধ্যে মারামারিতে তিনি জাতীয়তাবাদী গ্রীক সিপ্রিয়টদের সমর্থক। প্রেসিডেন্ট মাকারিউসের অভিন্ন বন্ধু। সাইপ্রাসে আছে সামরিক ঘাঁটি। এই ঘাঁটি থেকেই ১৯৫৬ সালে মিশরের উপর হামলা চালিয়েছিল বৃটিশ বিমান বহর। নাসের এবং মাকারিউস দুজনেই চান সাইপ্রাস থেকে বৃটিশ ঘাঁটির অপসারণ। তুরস্ক তার ঘোরতর বিরোধী। পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষ প্রবল। আরব দুনিয়ার উপর ভারতীয় প্রভাব উচ্ছেদের জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই আকাঙ্ক্ষার তাগিদেই সে হাত মিলিয়েছে ঐশ্লামিক গোড়াদের সঙ্গে। এই শক্তিকে সংহত করে বৃটেন এবং আমেরিকা চায় পশ্চিম এশিয়ায় তৈলস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে। ঐশ্লামিক জোট পশ্চিমী স্বার্থের মানসিক হাতিয়ার। এবং ইস্রাইল সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক প্রকাশ।

পশ্চিম এশিয়ায় সোভেয়েট ষ্ট্র্যাটিজী আলাদা। আরবভূমিতে তাদের নেই কোন সামরিক ঘাঁটি কিম্বা তৈলস্বার্থ। পশ্চিমী শক্তি জোটের কায়েমী-স্বার্থের অবসান সোভিয়েট রাশিয়ার কাম্য। আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এক্ষেত্রে তার কোন সংঘাত নেই। যদি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি কোন আরব রাষ্ট্রে থাকত তবে হয়ত জটিলতা সৃষ্টি হত। মস্কো প্রথমে আরবীয় জাতীয়তাবাদকে

সুনজরে দেখেন নি। সিরিয়া এবং ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির উপর তারা ভরসা করেছিলেন। ওদের ব্যর্থতার পর মস্কোর নীতি গেছে বদলে। জাতীয়তাবাদ প্রথম পর্যায়। এ পর্যায় শেষ হবার পরই আসবে কমিউনিজম। তাত্বিক বিশ্লেষণের এই পটভূমিতে গড়ে উঠেছে সোভিয়েট রাশিয়ার আরবনীতি। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বেধেছে সে গাঁটছড়া। ইঙ্গ-মার্কিন জোট দাঁড়িয়েছে ইস্রাইলের পিছনে। আর মস্কো শক্তিশালী করছেন মিশরকে। চীন যাচ্ছে অন্যপথে। আরব-ইস্রাইলের অচল অবস্থা তারপক্ষে সুবিধাজনক। এর স্থায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে দানা বাধবে চরম মানসিকতা। গেরিলা লড়াইএর তীব্রতা বাড়বে। তার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করবে সশস্ত্রবিপ্লব। বামপন্থী রাজনীতি নেবে কমিউনিজমের রূপ। গেরিলা সংগ্রামে চীনের উৎসাহ তাই বেশী।

ইস্রাইলের মনে কি আছে তা খোলসা করে বলছেন না প্রধানমন্ত্রী গোলদা মেইর। তিনি চান আরব-ইস্রাইল সীমান্তের পুণর্বিন্যাস। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ওটা নাকি দরকার। কোন্ কোন্ এলাকা হাতে রাখবে তা অস্পষ্ট। মনে হয়, শার্ম এল শেখ, সিরিয়ার গোলান উপত্যকা, জর্ডন নদীর পূবপাড় এবং গাজার উপর তার রয়েছে শ্যেন দৃষ্টি। আকাবা এবং সুয়েজখালে ইস্রাইলী জাহাজ চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা ইস্রাইলের মৌল দাবীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৬ সালের বাইশে নভেম্বরের প্রস্তাবে স্বস্তি পরিষদ তাকে নির্দ্দেশ দিয়েছে ৫ই জুনের পুর্ববর্ত্তী এলাকায় ফিরে যেতে। তেল আবিব মানেন নি এই প্রস্তাব। ইস্রাইলী নায়কেরা দখলকরা আরবভূমি গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। মিশর দেবে না তাকে দস্যুবৃত্তির সুযোগ। যুদ্ধের জন্য তৈরী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ইস্রাইল সতর্ক। প্রতিরক্ষার গোড়াপত্তনের আগেই সে ধ্বংস করতে চায় যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর আরবীয় ঘাঁটিশৃঙ্খল। হানাদারী এবং পাল্টা হানাদার প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

বিরোধ মীমাংসার পথ জটিল। সবার উপর প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তু সমস্যা। ইস্রাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুহীন হয়েছে প্রায় দশলক্ষ আরব নরনারী। ১৯৫৬ সালের জুনের লড়াইএ তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও প্রায় তিনলক্ষ। এদের পুনর্বাসন সম্ভব না হলে শুধুমাত্র সামরিক এবং রাজনৈতিক মীমাংসায় শান্তি আসবে না। কিন্তু এতগুলো মানুষের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেবে কে?

হীনমন্যতার মর্মজ্বালায় ভুগছে আরব। যুদ্ধে হেরেছে। তাদের বিস্তৃত ভূমি ইস্রাইল দখল করে রেখেছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার প্রায় অসম্ভব। মিশর চালাচ্ছে ওয়ার অফ এট্রিশন। শত্রুর সমরশক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলা তার নীতি। এ পথে বাধা অনেক। মার্কিন বিমান, ট্যাঙ্ক এবং যন্ত্রপাতি যাচ্ছে ইস্রাইলে সরবরাহ সঙ্কুচিত হলে ওয়ার অফ এট্রিশনের সুফল দ্রুত। অন্যথায় বিলম্বিত। নৈরাশ্যের মধ্যে জন্ম নিয়েছে চরম মতবাদ। গড়ে উঠেছে গেরিলা বাহিনী। ইস্রাইলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে তারা। ইস্পাতে গড়া গেরিলাদের মন। আরব ছুনিয়ায় এদের আবির্ভাব এবং শক্তি সঞ্চয় আর একটা যুগের সুচনা। দক্ষিণ এবং বামপন্থী জাতীয়তাবাদের সমন্বয়ের ভূমিকায় রয়েছেন নাসের। গেরিলাদের নিজস্ব কোন রাষ্ট্র নেই। জর্ডন এবং লেবানন থেকে তারা হানাদারী চালায়। অর্থ জোগায় বিভিন্ন আরবরাষ্ট্র। দলে উপদলে বিভক্ত তারা। সমন্বয়ের গ্রন্থী তুর্বল। সবার লক্ষ্য মোটামোটি এক—বর্তমান ধর্মীয় ইহুদী রাষ্ট্রের অবসান। নূতন গণতান্ত্রিক প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। মুসলমান, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের সমানাধিকার।

গেরিলা সংস্থাগুলোর মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী আল ফাতা। তাদের নেতা ইয়াসির আরাফত। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তিনি শ্রদ্ধেয় নেতা। প্যালেস্টাইন উদ্ধার এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা

ছাড়া অন্য কোন তাত্ত্বিক আদর্শ নেই আল ফাতার। এদলের সমধর্মী প্যালেস্টাইন মুক্তিসংস্থা। আল ফাতা এবং মুক্তিসংস্থার মধ্যে গড়ে উঠেছে আঁতাত। নেতৃত্ব আরাফতের হাতে। বামপন্থী গেরিলা সংস্থা পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন। নেতা ডঃ জর্জ হাব্বাস। ছোট হলেও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এ সংস্থা। অসম্ভব সক্রিয় এদের সদস্যরা। আরও অনেকগুলো ছোট বড় সংস্থা গড়ে উঠেছে সম্প্রতি। তরুণ তরুণীরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে বিভিন্ন গেরিলা সংস্থায়। হানাদারীতে দেখাচ্ছে অবিশ্বাস্য সাহসিকতা। আরব জনতার ধারণা, ইস্রাইলী গোঁয়াতুর্মীর উপযুক্ত উত্তর আরব গেরিলা। সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে আত্মত্যাগী তরুণ তরুণীরা। আরবের মানমর্যাদা ওদের হাতে। নাসের নিজেও সমীহ করে চলেন গেরিলাদের। জর্ডনের বাদশা হুসেনের চোখে ঘুম নেই। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ গেরিলাদের অপরিবর্ত্তনীয় পণ। জর্ডন এবং লেবাননে ছড়িয়ে আছে তাদের ঘাঁটি। সীমান্ত থেকে আক্রমণ চালায় ইস্রাইলীদের উপর। ইস্রাইল পাল্টা আঘাত করে জর্ডন এবং লেবাননের উপর। হামেশাই সৈন্যদল ঢোকে এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে। সব তছনছ করে আবার চলে যায়। মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার অপর পাড়ের ভূমিও দখল করে রাখে ইস্রাইলী সৈন্যরা। গেরিলা ঘাঁটিগুলো ধ্বংসই নাকি তাদের লক্ষ্য। সুয়েজ এলাকাতে ও ইস্রাইলী হামলার বিরাম নেই। শান্তিদূত ডঃ ইয়ারিং মীমাংসার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। সারা দুনিয়া উদ্বিগ্ন। ছোট সংঘর্ষ বড় সংঘর্ষে পরিণত হবার সম্ভাবনা পদে পদে। এবার কোন অঘটন ঘটলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়া। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন— উভয়েই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়াবার পক্ষপাতী। মার্কিন কর্তৃপক্ষ দিলেন শান্তি প্রস্তাব—নব্বুই দিনের জন্য অস্ত্র-সম্বরণ। এই সময়

ডঃ ইয়ারিংএর মাধ্যমে চলবে শান্তি আলোচনা। ইস্রাইল রাজী নয়। সে চায় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অস্ত্রসম্বরণ। নাসেরের তাতে ঘোরতর আপত্তি। তাঁর ধারণা, ইস্রাইলের মতলব, সময় নষ্ট। যত দিন যাবে আরবভূমির উপর ইস্রাইলী অধিকার তত গা সহা হবে। বেশ কিছুদিন টানাহেঁচড়ার পর মার্কিন প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিল মিশর। বেঁকে বসল ইরাক, সিরিয়া এবং আরব গেরিলারা। বাদশা হুসেন নিলেন নাসের পথ। মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। ইস্রাইল পড়ল মহাফাপরে। তাঁর হাঁ-না'র সঙ্গে মার্কিন মর্যাদা জড়িত। আমেরিকার সাহায্য ছাড়া এক পা এগুবার সাধ্য নেই ইস্রাইলের। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ অভিযানের সময় বুঝেছিলেন তা বেন গুরিয়ন। এখন বুঝছেন প্রধানমন্ত্রী গোলদা মেইর। চরমপন্থী গহল দলের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তিনি মেনে নিলেন অস্ত্রসম্বরণ প্রস্তাব। ৮ই আগস্ট হয়ে গেল পাকাপাকি ব্যবস্থা।

অস্ত্রসম্বরণের মধ্যে নূতনত্ব নেই। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবের অর্থই অস্ত্রসম্বরণ। কিন্তু তা যথাযথ কার্যকর হয় নি। যুদ্ধ থেমেছে। ইতস্তত সংঘর্ষ থামে নি। এর জন্যই অস্ত্রসম্বরণ প্রস্তাব। প্রস্তাবের দ্বিতীয় পর্যায় শান্তি আলোচনা। সুরু হল ইস্রাইলের টালবাহনা। তার অভিযোগ, সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে সুয়েজ খাল বরাবর ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি বানাচ্ছে মিশর। এগুলোর অপসারণ না হলে শান্তি আলোচনায় বসবে না মিশর। ডঃ ইয়ারিং কেবল মিশর-ইস্রাইল করছেন। পাত্তা পাচ্ছেন না কোথাও। আলোচনা হবে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ইয়ারিংএর মাধ্যমে। একের কথা তিনি অন্যকে জানাবেন। নিজের মতামত জাহিরের কোন সুযোগ নেই। সরকারী পদমর্যাদায় ডঃ ইয়ারিং রাষ্ট্রসংঘের মহাসম্মানিত প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রদূতের সম্মানের অধিকারী। কাজে শুধু পত্রবাহক। শান্তি আলোচনার সূচনাতেই আসবে অধিকৃত

আরবভূমি থেকে ইস্রাইলের সৈন্যাপসারণের প্রশ্ন। ১৯৫৬ সালের বাইশে নভেম্বরের প্রস্তাবে ইয়ারিংএর হাত পা বাঁধা। যুদ্ধ পূর্ববর্ত্তী সীমানায় ফিরে যাবার নির্দ্দেশ তাতে দেওয়া হয়েছে ইস্রাইলকে। মিশর অবশ্যই নেবে স্বস্তি পরিষদের এই প্রস্তাবের সুযোগ। ইস্রাইল এড়াতে চায় অস্বস্তিকর কূটনৈতিক মোকাবিলা। এদিকে নাসের নিয়েছেন বিরাট ঝুঁকি। চরম পন্থীরা করছে তাঁর বিরোধীতা। আগুন চেপে রেখেছেন নিজের থাবায়। হাত পুড়ছে কিন্তু শান্তির আশা ছাড়ছেন না। যুদ্ধের পরিণাম তিনি জানেন। মিশর ছাড়া সংগ্রামের হিম্মত কারও নেই। জুনের লড়াইএ দুনিয়া দেখেছে সিরিয়ার সংগ্রাম বিমুখতা এবং ইরাকের অসার আস্ফালন। গেরিলাদের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। ইস্পাতে গড়া তাদের মন। দিনের পর দিন তারা শত্রুকে হয়রানি করতে পারে। কিন্তু বিমান এবং যান্ত্রিক বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযানের মোকাবিলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সৈন্যদলকে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে আনতে হলে সময় দরকার। লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অফ ষ্ট্র্যাটেজিক ষ্টাডিসের হিসাব মতে, মিশরের অস্ত্রসজ্জা জোরকদমে বাড়ছে। ১৯৫৬ সালের মধ্যে তার হাতে এসেছে ৪১৫টি জঙ্গী বিমান। তৈরী করেছে বাইশটি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি। ইস্রাইল জোগাড় করেছে ৩৩০টি জঙ্গী বিমান এবং বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতী। সমর সরঞ্জাম এবং কারিগরী অভিজ্ঞতা—এ দুয়ের সমন্বয় সম্পূর্ণ হয় নি মিশরে। ইস্রাইলে তা সম্পূর্ণ। এখানেই তার সামরিক কুশলতার উৎস।

আরব দুনিয়া উত্তেজিত। ইহুদীরা চালাচ্ছে আরবদের উপর অকথ্য অত্যাচার। তাদের অধিকৃত এলাকায় ভয়ে কেউ কথা বলে না। গেরিলাদের সঙ্গে যোগসাজসের সন্দেহে আরবদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বিনাবিচারে আটকের সংখ্যা বাড়ছে। গোয়েন্দাবৃত্তির অপরাধে ফাঁসীর সংখ্যাও কম নয়। গেরিলারা মরিয়া। নির্যাতনের মুখেও ফাঁস করে না গোপন খবর। বিভিন্ন

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে রোমাঞ্চকর কাহিনী। একটি তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছে ইস্রাইলী পুলিশ। কিছুতেই মুখ খুলবে না সে। মারপিট ব্যর্থ। বলা হল—এখনই একজন ইস্রাইলী সৈন্য দিয়ে ধর্ষণ করা হবে তাকে। ইহুদী বিদ্বেষের পরিণামে সে পাবে ইহুদীর সন্তান। গেরিলা তরুণীর মুখে ঘৃণার হাসি। আরবভূমি তার দেহ। ইহুদী ধর্ষণ সেখানে চলছে দিনের পর দিন। কিন্তু আরব মন অধর্ষিত। প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা সেখানে জীবন্ত। পিছনে রেখে যাবে তারা মুক্তি সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস। তা থেকে প্রাণ পাবে অনাগত দিনের লক্ষ লক্ষ সৈনিক। এ মনের বিনাশ নেই। এ মন অজেয়।

রাষ্ট্রসংঘ দিশাহারা। সেখানে নালিশ এবং পাল্টা নালিশের বিরাম নেই। ইস্রাইলের অভিযোগ, আরব রাষ্ট্রগুলোতে ইহুদী প্রজারা পাচ্ছে না মানবাধিকার। তারা নিপীড়িত, নির্যাতীত এবং দেশত্যাগে ইচ্ছুক। অচল অবস্থায় পৌঁছেছে শান্তি আলোচনা। অস্ত্রসম্বরণ চুক্তির পর মিশর নাকি সুয়েজখালের পাড়ে বানিয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি। এগুলো তুলে না নিলে শান্তিবৈঠকে যোগ দেবে না ইস্রাইল। নাসের স্বীকার করেন না এ অভিযোগ। রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকদল নীরব। আমেরিকা স্পষ্টভাবে বলতে পারছে না কিছু। জেনারেল দেয়ান চাচ্ছেন অস্ত্রসম্বরণ চুক্তির বরবাদ। গেরিলারা সক্রিয়। তারা হানা দিচ্ছে ইস্রাইলী সীমান্তে। ইস্রাইলও পাল্টা হানা চালাচ্ছে জর্ডন এবং লেবাননের অভ্যন্তরে। নাসের পড়েছেন উভয় সঙ্কটে। সোভিয়েট জঙ্গীবিমান আসছে মিশরে। পাইলটদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সামরিক যন্ত্রপাতি জড় হচ্ছে অস্ত্রাগারে। অভিজ্ঞ কারিগর তৈরী হতে অনেক দেরী। তাঁর প্রয়োজন সময়ের—আরও সময়।

বাদশা হুসেনের অবস্থা শোচনীয়। তাঁর রাজ্যে চলেছে দ্বৈত শাসন। তিনি চান গেরিলাদের খতম করতে। অনুগত বেদুইন

বাহিনী আকণ্ঠ অস্ত্রসজ্জিত। প্যালেস্টাইনী সৈন্যদের বিশ্বাস করেন না তিনি। ওদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র গতানুগতিক। সম্প্রতি জর্ডনে গেছে পাকিস্তানী সমর বিশেষজ্ঞদল। তাদের হাতে সামরিক শিক্ষণের ভার। বাদশার ঘনিষ্ঠ দোস্ত পাক-শাসকরা। হুসেনের আশা, আপতকালে তাঁর গদী বাঁচাবে বেদুইন এবং পাকিস্তানী সৈন্যদল। প্রতিদানে তিনি দেবেন ভারত-বিদ্বেষী উদ্গার। জর্ডনী সৈন্যদলের সঙ্গে গেরিলাদের ছোটখাট সংঘর্ষ লেগেই আছে। বন্দুকের উত্তরে উঁচিয়ে ওঠে বন্দুক। কেউ হার মানে না। বাদশার ফরমান গেরিলা এলাকায় অচল। বিপ্লবীদের দৃষ্টিতে হুসেন বিশ্বাসঘাতক। বৃটেন এবং আমেরিকার কৃতদাস। গেরিলা হননে তিনি ইস্রাইলের গোপন মদতদার।

স্বস্তি পরিষদে নিদারুণ চাঞ্চল্য। লেবানন সীমান্ত থেকে ইস্রাইল সীমান্তে হানা দিয়েছিল গেরিলারা। বদলা নিয়েছে ইস্রাইলী সৈন্যদল। সাঁজোয়া বহর ঢুকেছে লেবাননে। স্বস্তি পরিষদে উঠেছে অভিযোগ। ধিকৃত হয়েছে ইস্রাইল। সৈন্যদল ফিরিয়ে নেবার নির্দ্দেশ দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। বিশ্বসভার নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য করে না ইস্রাইল। তার ভাগ্যে নিন্দা জুটেছে প্রচুর। কিন্তু তার আগ্রাসী নীতি অব্যাহত। মারের ভয় দেখিয়ে সে দাবিয়ে রাখতে চায় গোটা আরবকে। গেরিলারা এই শক্তিমত্তার জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ওদের ঠাণ্ডা করতে বাদশা হুসেন কৃতসঙ্কল্প। আরব মর্যাদার চেয়ে গদী তাঁর প্রিয়। তারই পরিণতি ইতস্তত সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ জীইয়ে রাখতে ইস্রাইল উৎসুক। তার জন্যই জর্ডন এবং লেবাননে তার বেপরোয়া হানাদারী। ইস্রাইলের সদম্ভ ঘোষণা, গেরিলা হানাদারী বন্ধ না হলে প্রতিশোধ গ্রহণ চলছে এবং চলবে। বাদশা হুসেন এবং গেরিলাদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান রেষারেষিতে কায়রো উদ্বিগ্ন। বাদশার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে ক'বার। দেরী করলে অবস্থা হয়ত আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

নাসের ডেকেছেন আরব শীর্ষ সম্মেলন। গঠিত হয়েছে তিন জনের এক কমিটি। গেরিলা এবং বাদশার লড়াই বন্ধ করবেন তাঁরা। আসল শত্রু ইস্রাইল। আরবদের মধ্যে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব শক্তির অপচয়। এ অপচয়ের উৎস বন্ধ করা দরকার। আরব প্রধানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। এদিকে বাদশা হুসেন সেনাপতিদের সঙ্গে করছেন ঘন ঘন গোপন বৈঠক। পাকিস্তানী সামরিক পরামর্শদাতারা ঘিরে আছেন তাঁকে। অন্তরালে তৈরী হচ্ছে সমর পরিকল্পনা। উদ্দেশ্য—গেরিলা উচ্ছেদ।

পঁয়ত্রিশ

১৯৫৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে আকাশে উঠেছে দুটি যাত্রীবাহী বিমান। একটি সুইস এবং অপরটি মার্কিন। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে চলেছে তারা। একজন যাত্রী এগিয়ে গেল পাইলটের কাছে। আর একজন দাঁড়াল যাত্রীদের পিছনে। ওদের এক হাতে পিস্তল এবং অপর হাতে বোমা। কেউ কথার অবাধ্য হলে শূন্যে গুড়িয়ে যাবে বিমান। মরবে সবাই। বিমান দুটি চলল পশ্চিম এশিয়ার পথে। নামল জর্ডনের মরুভূমির একটি রানওয়েতে। মার্কিন বিমানের মালিক ট্র্যানস্ ওয়ার্ল্ড এয়ার লাইনস। দ্বিতীয়টি সুইজাইর ডি সি-৮। প্রথমটি বোয়িং—৭০৭। যাত্রী সংখ্যা ৩০৫। বিমান দুটি পড়ে রইল রানওয়েতে। যাত্রীদের নিয়ে আরব গেরিলারা রওনা হল অজ্ঞাত স্থানে।

আর্মসটারডম থেকে ছেড়েছিল আর একটি ইস্রাইলী যাত্রীবাহী বিমান। গন্তব্য স্থান নিউইয়র্ক। বিমান চলছে। যাত্রীরা ঝিমুচ্ছে। প্যাট্রিক জোসেফ দাঁড়াল এসে পাইলটের পাশে। হাতে তার পিস্তল। অপরপ্রান্তে দেখা গেল একটি তরুণীকে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পরনে পাজামা।

তার এক হাতে পিস্তল। অপর হাত কোমরে। কি যেন খুঁজছে। যাত্রীরা চমকে উঠল। তরুণী হুশিয়ারী দিচ্ছে। কোমরের বেল্ট নিয়ে টানাটানি করছে। কিছুতেই পিস্তল বার করা যাচ্ছে না। হঠাৎ বেল্ট গেল ছিঁড়ে। বেসামাল নারী। চিরন্তন লজ্জা তাকে ছেকে ধরেছে। পাজামা সামলাতে সে ব্যস্ত। গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে জোসেফ। তরুণী হয়েছে আহত। তাকে পাকড়াও করে ফেলেছে যাত্রীরা। বিমানটি নামল লণ্ডন বিমান ঘাঁটিতে। বৃটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করল তরুণীকে। সারা বিশ্বে প্রচণ্ড আলোড়ন। কারা এই দুঃসাহসিক বিমান ছিনতাই দল? কে এই তরুণী?

পরের দিন কায়রো বিমান ঘাঁটিতে নামল একটি প্যান আমেরিকান বিমান—বোয়িং ৭৪৭। যাত্রীদের ঝট্‌পট নেমে যেতে বলল জনাকয়' আরব যুবক। ওরাও ছিল এ বিমানের যাত্রী। ওটা তারা জবর দখল করেছিল আকাশে। পেতে রেখেছিল টাইম বোমা। বিস্ফোরণের মাত্র মিনিট তিনেক বাকী। শেষ যাত্রীর নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফারণ। শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল বিমানের টুকরো টুকরো অংশ। পুলিশ নিয়ে গেল ছিনতাইকারী দলকে। আবার আন্তর্জাতিক প্রশ্ন—এরা কারা? কেন আকাশে পথে এই বোম্বেটে গিরি?

৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। বোম্বাই থেকে লণ্ডনে উড়ে যাচ্ছিল বি. ও. এ.সির ভিসি—১০ বিমান। যাত্রীসংখ্যা ১১৩। তাদের মধ্যে ৫২ জন ভারতীয়। বিমানটি নামল জর্ডনের মরুভূমির রানওয়েতে। দাঁড়াল এসে অপর দুটি ছিনতাই বিমানের পাশে। কাছেই অপেক্ষা করছিল গেরিলারা। যাত্রীদের নিয়ে তারা চলে গেল অজ্ঞাত স্থানে। পরে খবর পাওয়া গেল, ভারতীয় যাত্রীরা মুক্ত। আর সবাই বন্দী। সারা দুনিয়া হতবাক। প্যাইকারী হারে বিমান ছিনতাই! আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থায় নিদারুণ চাঞ্চল্য। নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলেই নয়। আইনের

পণ্ডিতেরা উল্টাতে লাগলেন কনভেনশনের পাতা। রাষ্ট্রসংঘ নিরুপায়। গেরিলারা মানে না কারও শাসন। এতগুলো যাত্রীর ভাগ্য ঝুলছে সুরু সুতোয়। যে কোন সময় ছিঁড়ে পড়ার আশঙ্কা। বৃটিশ বিমান কর্তৃপক্ষ দিলেন অভিনব নিরাপত্তার দাওয়াই। তারা বিমান কর্মীদের মধ্যে বিলি করলেন বোম্বেটে ধরার কল। বিমানযাত্রীর জিনিষপত্রের তল্লাসী চলবে। দেহতল্লাসীও বাদ যাবে না। কারও কাছে লুকোন আগ্নেয়অস্ত্র থাকলেই যন্ত্রটি সক্রিয় হয়ে উঠবে। মুস্কিল যাত্রীনীদের নিয়ে। তাদের অনেকের অন্তর্বাসে থাকে ধাতব পদার্থ। এসব মহিলার কাছে এলেই যন্ত্রে দেখা দেয় অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। চারদিকে সুরু হয় হাসি তামাশা। সবার নাজেহাল অবস্থা। দাওয়াই চলল না বেশীদিন। হাল ছেড়ে দিলেন কর্তারা।

আরব গেরিলাদের মধ্যে ছোট দল পপুলার ফ্রন্ট। নেতা জর্জ হাবাশ। সদস্য সংখ্যা কম। রাজনীতিতে উগ্র বামপন্থী। সাংঘাতিক সক্রিয়। ওদের একটি অংশ আকাশপথে বিমান দখলে হাত পাকিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। জার্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিমান ঘাঁটিতে এদলের সদস্যরা চালিয়েছে হামলা। ধরা পড়েছে অনেকে। লণ্ডনের বন্দিনী তরুণী লায়লা খালেদ পপুলার ফ্রণ্টের সদস্যা। আকাশ পথে বিমান দখলে ইতিপূর্বে যোগ দিয়েছে দু'একবার। দুধর্ষ তরুণী। সমীহ করে সবাই। আরবের রক্ষণশীল বোরখা ছেড়ে মুক্তঅঙ্গনে দাঁড়ানো অভূতপূর্ব সামাজিক বিপ্লব। লায়লা নারী জাগরণের অগ্রদূত। আরব দুনিয়ার বিস্ময়। নাসেরের ধারনা, ওরা তাঁর অবাধ্য সন্তান।

পপুলার ফ্রন্টের দাবীঃ (১) সুইটজারল্যাণ্ডের কারাগারে আছে তিনজন আরব গেরিলা। ওদের অপরাধ সুইস বিমান ঘাঁটিতে ইস্রাইলী বিমানের উপর গুলি চালিয়েছিল। আদালত দিয়েছেন বার বছরের কারাদণ্ড। তাদের নিঃসর্ত মুক্তি।

(২) জোসেফের শব প্রত্যার্পণ এবং লায়লা খালেদের মুক্তি। (৩) পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে হেইফায় গোয়েন্দাবৃত্তির অপরাধে ইস্রাইলে আটক রয়েছে একজন সুইস নাগরিক। তার মুক্তি। (৪) আগস্ট মাসে একটি বি. ও. এসি বিমান নেমেছিল ইস্রাইলী বিমান ঘাঁটিতে। তাতে ছিল ছুজন আল্জেরীয় যাত্রী। পুলিশ তাদের আটক রেখেছে। তাদের মুক্তি। (৫) গত জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ লেবানন থেকে তু'জন লেবানীজ সৈন্যকে অপহরণ করেছে ইস্রাইলীরা। তাদের ফেরত দিতে হবে। (৬) ইস্রাইলে বন্দী আরব গেরিলাদের বিনিময়ে মুক্তি পাবে বন্দী ইহুদী যাত্রীরা। (৭) কেনেডীর হত্যাকারী শিরহানের মুক্তি। (৮) পশ্চিম জার্মানীতে আটক আরব গেরিলাদের মুক্তি।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসব দাবী না মানলে বিমানগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হবে। পপুলার ফ্রন্টের চূড়ান্ত হুশিয়ারী। যাত্রী উদ্ধারের চেষ্টার পরিণাম পাইকারী হত্যা। যাত্রীদের মধ্যে আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। বেছে বেছে বৃটিশ, জার্মান, সুইস, মার্কিন, এবং ইস্রাইলীদের রেখে অন্যদের ছেড়ে দিয়েছে গেরিলারা। সুইস এবং জার্মান সরকার সর্ত মানতে রাজী। গেরিলাদের মুক্তি দিতে তাদের আপত্তি নেই। বাগড়া দিচ্ছে বৃটেন। সে চায় সম্মিলিত ব্যবস্থা। ইস্রাইল আসবে না কোন বোঝাপড়ায়। প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না সে। অধিকৃত আরব অঞ্চল থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল সাড়ে চারশ' পুরুষ এবং আশীজন নারী। ইহুদী যাত্রীরা মুক্তি না পেলে আজীবন কয়েদ খাটবে তারা। ইস্রাইলী বর্বরতায় স্তম্ভিত হল তুনিয়া। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ কাজে নামল। তারা খবর নিয়ে জানল, বন্দী যাত্রীরা পাচ্ছে সহৃদয় ব্যবহার। শিশুদের তুধের অভাব নেই। গেরিলারা অমানুষ নয়। আদর্শবাদী এবং আত্মত্যাগী তরুণ সম্প্রদায়। তাদের সংঘাত রাজনৈতিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। মেয়াদ পার হয়ে গেছে। প্রচণ্ড

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মরুভূমি। মুহূর্তের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বিমানগুলোর দেহ।

গেরিলাদের সমন্বয় কমিটি পছন্দ করে নি এধরণের বিমান ছিনতাই। তাদের ধারণা, আকাশ পথে বোম্বেটেগিরি আরব স্বার্থের পরিপন্থী। বিশ্বজনমত যাবে বিগড়ে। তারা একঘরে করল পপুলার ফ্রন্টকে। আড়াল থেকে নাসের হয়ে উঠলেন সক্রিয়। মিশরীয় দূতাবাসগুলোকে নির্দ্দেশ দিলেন সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। জার্মান এবং সুইস সরকারের চাপ পড়ল বৃটেনের উপর। ইস্রাইলের হঠকারিতায় তারা বিরক্ত। অধিকৃত এলাকার আরবেরা ইহুদীদের বলির পাঠা। মৌল অধিকার বঞ্চিত তারা। আকাশপথে ছিনতাই হয়েছে বিমান। গ্রেপ্তার হল পাঁচ শতাধিক নিরপরাধ নরনারী। নাৎসী জার্মানী এবং বর্তমান ইস্রাইলের মধ্যে তফাত কম। প্রমাণ করেছেন, ইস্রাইলী সরকার। বৃটেনের বলার কিছু নেই।

আমেরিকা বেশী কথা বলে নি এতদিন। প্রথমে সে সায় দিয়েছিল বৃটিশ যৌথ চেষ্টায়। ইস্রাইলের বেপরোয়া মনোভাবে তাকেও পিছু হটতে হল। যাত্রীদের উদ্ধার অবশ্যকাম্য। বেশী পাঁয়তারা কষতে গেলে তাদের জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা। গায়ের জোরে যাত্রীদের ছিনিয়ে আনার পরিকল্পনা অবাস্তব। হয়ত সবাই প্রাণ হারাবে। প্রতিশোধের প্রশ্ন আসবে পরে। বৃটিশ এবং মার্কিন বিমান হয়ত বোমা ফেলবে। তাতে জ্বলে উঠবে পশ্চিম এশিয়া। বিমান যাত্রীদের নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক বিধি ইস্রাইল মানে নি। গত আগস্ট মাসে বি. ও. এসির দুজন আলজেরীয় যাত্রীকে তেল আবিব বিমান ঘাঁটি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ইস্রাইলী পুলিশ। বৃটেন কিম্বা আমেরিকা তার কোন জোরাল প্রতিবাদ করে নি। ঘটনাটা চেপে যাবার চেষ্টা হয়েছিল প্রাণপণ। তার আগে বিমানে বোম্বেটেগিরির পথ দেখিয়ে গেছেন ফরাসী সরকার।

আলজেরিয়ার বেন বেলাকে নিয়ে টিউনিসিয়ায় যাচ্ছিল একটি ফরাসী বিমান। ফরাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুকুমে পাইলট বিমান ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফরাসী পুলিশ বেন বেলাকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়েছিলেন প্যারিসে। দ্য গলের ক্ষমতায় আসার অনেক আগে ঘটেছিল এ ঘটনা। ল্যাটিন আমেরিকায় বিমান ছিনতাই লেগেই আছে। এক দলের সঙ্গে মার্কিন যোগসাজস এবং অপর দলের পিছনে কিউবা। যারা এসব কাজে লিপ্ত তারা বেপরোয়া। আন্তর্জাতিক বিধি তাদের কাছে অর্থহীন। সবার মুখরক্ষা করলেন নাসের। বিদেশের মিশরীয় দূতাবাসগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর চলল আপোষ আলোচনা। গেরিলারা অবাধ্য। কিন্তু নাসেরের অনুরোধ উপেক্ষা করার সাহস তাদের নেই। সুইটজারল্যাণ্ড গোড়া থেকেই বন্দী বিনিময়ে রাজী। জার্মানীর কোন আপত্তি ছিল না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হীথ নিয়েছিলেন শকুনীতি। তিনি চান ইস্রাইলী বন্দীদেরও মুক্তি। কিন্তু ইস্রাইলের হাতে বন্দী আরবদের মুক্তি ছাড়া তাদের ছাড়বে না পপুলার ফ্রণ্ট। বিশ্বজনমত আকাশে বোম্বেটেগিরির বিরোধী। মুক্তিপণ হিসাবে আরব প্রজাদের আটক রাখার ইস্রাইলী পদ্ধতির প্রতিবাদেও গোটা দুনিয়া সোচ্চার। ভেঙ্গে গেল হীথের যুক্তফ্রণ্ট। সম্পাদিত হল ভদ্রলোকের চুক্তি। বন্দী আরব গেরিলাদের ভার নেবে মিশরীয় দূতাবাসগুলো। তাদের কায়রো পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি পাবে বিমান-বন্দীরা। ইস্রাইলী বন্দীদের সম্পর্কে বিবেচনা হবে পরে। নাসের ভয়ানক খুশী। লায়লা খালেদকে দেখেন নি তিনি। এই মেয়েটির জন্য তাঁর মনে জমা হয়ে উঠেছিল গভীর স্নেহ। স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা লায়লা। আগুনের ফুলকি। রাজনৈতিক বিপথ-গামিনী, কিন্তু দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তরুণীটিও পাবে মুক্তি। নাসের আনন্দে ভরপুর। একজন বিদেশী সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে : ইস্রাইল সম্পর্কে নমনীয় পথ কেন নিচ্ছে

পারছে না মিশর? আরব-ইস্রাইল সংঘর্ষের শেষ কোথায়? পরিণতিই বা কি? হেসে উত্তর দিলেন নাসের: ফিরে আসছে লায়লা। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাওয়া যাবে।

ওৎ পেতে বসেছিলেন বাদশা হুসেন। বিমান ছিনতাই নিয়ে চলেছে আন্তর্জাতিক আলোড়ন। গেরিলাদের মধ্যে অনৈক্য দানা বেঁধে উঠছে। এখনই আঘাত হানার সুযোগ। বেদুইন নেতাদের ডেকে পাঠালেন তিনি। ওদের সঙ্গে প্যালেস্টাইনীদের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। তারা গেরিলাদের খতম করতে তৈরী। সেনাপতিদের দিলেন গোপন নির্দ্দেশ। ব্যাপক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিল জর্ডনে। মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর ঘোরাফেরা করতে লাগল উপকূল দরিয়ায়। জর্ডনের দক্ষিণাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠল সৈন্যদল। পাঁচঘণ্টা ধরে চলল কামান এবং মেসিনগানের লড়াই। মারা পড়ল সত্তর জন। বেদুইনদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন বাদশা হুসেন। সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। রক্তপাত আসন্ন।

বাদশাকে বিশ্বাস করে না জাতীয়তাবাদী আরবের জনতা। চারিদিকে রটেছে গুজব। মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ইস্রাইলী উপ-প্রধানমন্ত্রী ইগল এলন দেখা করেছেন বাদশা হুসেনের সঙ্গে। জর্ডন-ইস্রাইল সীমান্তে তিন চারবার ঘটেছে তাঁদের গোপন সাক্ষাৎকার। প্রধানমন্ত্রী গোলদা মেইরের সঙ্গে বাদশার গোপন বৈঠক হয়েছে একবার। হুসেন পশ্চিমের তাবেদার। তিনি এককভাবে ইস্রাইলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় উৎসুক। গেরিলারা জর্ডন এবং ইস্রাইলের শত্রু। ওরা চায় হুসেনকে গদীচ্যুত করতে এবং ইস্রাইলের উপর হামলা চালাতে। যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের উচ্ছেদ দরকার। বাদশা হুসেন নাকি একথা বলেছেন এলনকে। ইস্রাইল তাতে রাজী। ভয়ে ভয়ে থাকেন বাদশা। প্রাসাদের আনাচে কানাচে দেখেন শুধু হত্যার ষড়যন্ত্র। তাঁর নাকের ওষুধের মধ্যে নাকি মিশান হয়েছিল

বিষ। প্রাসাদে সতর্ক প্রহরা। কারও উপর বিশ্বাস নেই। আস্থাভাজন শুধু বেদুইন এবং পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা। গুজবের সত্যাসত্য যাচাই অসম্ভব। আরব জনতার কাছে সবই সত্য। বাদশার চালচলন রহস্যজনক। ইউরোপীয় দূতাবাসগুলোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। আরব রাষ্ট্রপ্রধানরা গঠন করেছেন তিনজনের এক কমিটি। বাদশা-গেরিলা বিরোধ মিটমাট করবেন তাঁরা। কিন্তু হুসেন এড়িয়ে চলছেন তাঁদের। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে। সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন নাসের। জাতীয়তাবাদী আরব নেতারা দিন কাটাচ্ছেন গভীর উদ্বেগে।

বেদুইনরা দলে দলে জড় হচ্ছে আম্মনে। তাদের হাতে রাইফেল। সর্দারদের আদর আপ্যায়নের ধুম পড়ে গেছে। সৈন্যদল বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড় শব্দ। আকাশে উড়ছে জঙ্গী বিমান। প্যালেস্টাইনীদের উপর বেদুইনদের জাতক্রোধ। গেরিলাদের হাতে বন্দুক না থাকলে বেদুইন তাণ্ডব থেকে রেহাই পেত না কেউ। শিক্ষায় অনগ্রসর এই খণ্ডজাতির লোকগুলো। রক্ত পিপাসা সাংঘাতিক। এতদিন সেলাম ঠুকেছে গ্লাব পাশাকে। এখন ঠুকছে বাদশা হুসেনকে। সাঁজোয়া বহরের অধিকাংশ সৈন্য বেদুইন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মারণাস্ত্র বলতে ওরা বুঝত তরোয়াল, বর্শা এবং বন্দুক। মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত। মরুদ্যান দেখলেই তাবু খাটাত। এক দল অপর দলের কাছাকাছি এলেই লাগত মারামারি। সুযোগ পেলেই চালাত লুটপাট। মধ্যযুগীয় রণ-উন্মাদনার প্রবাহ বইত তাদের শিরায় শিরায়। ধর্ম্মীয় আচারে অসম্ভব গোড়া। গেরিলারা ওদের কাছে কাফের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইরাকে বিদ্রোহ করেছিলেন রসিদ আলী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল বৃটেন। অন্যান্যদের সঙ্গে ছিল বেদুইন বাহিনী। মরুভূমির মধ্য দিয়ে মার্চ করছে সৈন্যদল। দূরে

আকাশে দেখা গেল জার্মান জঙ্গী বিমান। বৃটিশ সেনাপতি হুকুম দিলেন—শুয়ে পড়। সবাই হুকুম তামিল করল। সোজা দাঁড়িয়ে রইল জনাকয় সর্দার। বিনাযুদ্ধে ওরা শত্রুর সামনে নাকে খত দেবে না। বিমানের ইঞ্জিনের গর্জন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ওরা কাছে এসে পড়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বৃটিশ সেনাপতি। চীৎকার করে হুকুম দিচ্ছে—শুয়ে পড়। কার কথা কে শোনে। এক দৌড়ে সর্দাররা গেল একটি বালুর ঢিবির কাছে। লাফিয়ে উঠল তার মাথায়। বাতাসে উড়ছে পা পর্যন্ত ঝুলান মাথার কাপড়। হাতে খোলা তরোয়াল। আকাশে জার্মান জঙ্গী বিমানগুলো চক্কর দিচ্ছে। ঢিবির উপর চলছে সর্দারদের তরোয়াল আস্ফালন। দৃষ্টি শূন্যে এবং মুখে অশ্রাব্য গালাগালি। মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বোমা ফেলেছে জার্মান বিমান। বালির ঢিবির বদলে তৈরী হয়েছে গর্ত। সর্দাররা মিশে গেছে বালির সঙ্গে। নিশানা শুধু রক্তচিহ্ন। এই বেদুইনরাই এখন জর্ডনের শিক্ষিত সৈন্য। হাতে আধুনিক মারণাস্ত্র। বাদশা হোসেনের কাছে প্যালেস্টাইনী সৈন্যরা ভঙ্গ। বেদুইন বাহিনী জাতকুলীন। ওরা আনাগোনা করছে জনপথে। সঙ্গে সশস্ত্র অসামরিক বেদুইন দল। সন্ত্রাসের কালোছায়া পড়েছে জর্ডনে।

সৈন্যবাহিনীর তৎপরতার খবর জানেন না মন্ত্রিসভা। কেউ পরামর্শ নেন নি তাঁদের। বাদশা হুসেন নিজের হাতে নিয়েছেন ক্ষমতা। মন্ত্রিসভার কাজ নেই। সৈন্যবাহিনী হুকুম নিচ্ছে বাদশার কাছ থেকে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেকার। প্রধানমন্ত্রী জানেন না, তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাদশার দেখা পাওয়া মুস্কিল। অসামরিক শাসনের কার্যত ঘটেছে অবসান। মরিয়া হয়ে উঠেছেন বাদশা হুসেন। গেরিলাদের সঙ্গে শেষ লড়াইএ তিনি ময়দানে নেমেছেন। বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা। হুশিয়ারী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। লেবানন, সিরিয়া, ইরাক এবং মিশরের

গেরিলারাও শান দিচ্ছে অস্ত্রে। যে কোন সময় ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম আসবে। যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ওপারে ইস্রাইলী বাহিনী চঞ্চল। অসম্ভব তৎপরতা দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে। ভূমধ্য-সাগরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর পজিসন নিচ্ছে। সোভিয়েট নৌবহরের শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে তাদের উপর। অগ্নিগর্ভ জর্ডন। বারুদ তৈরী। শুধুমাত্র অগ্নিস্পর্শের অপেক্ষা।

১৬ই সেপ্টেম্বর। বাদশা হুসেনের হুকুম: সৈন্যবাহিনীর কাছে অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে গেরিলাদের। জর্ডনের মাটিতে সশস্ত্র গেরিলার অবস্থান সহ্য করবেন না সরকার। অসম্ভব প্রস্তাব। প্রায় পঞ্চাশ হাজার গেরিলা ইস্রাইল-বিরোধী অভিযানে তৈরী। রক্তে গড়া তাদের সংগঠন। দেশদ্রোহী হুসেনের হুকুমে তারা ছাড়বে অস্ত্র? রুখে দাঁড়াল গেরিলারা। ঘাঁটিগুলোর চারদিকে করল ব্যূহ রচনা। দল উপদলের কোন্দল গেল ভুলে। কেন্দ্রীয় কমিটি পপুলার ফ্রণ্টের উপর নিষেধাজ্ঞা নিল তোলে। জীবন-মরণ সমস্যা তাদের সামনে। গড়ে উঠল একটি মাত্র কম্যাণ্ড। ইয়াসের আরাফত সম্মিলিত গেরিলা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। সৈন্যবাহিনীর হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিলেন বাদপ হুসেন। সারা দেশে জারী হল সামরিক আইন। ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ দাউদ গঠন করলেন সামরিক সরকার। তিনি নিজে প্যালেস্টাইনী আরব। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ লোক দেখান ভাঁওতা। প্যালেস্টাইনীদের খুশী রাখার উৎকট কৌশল। প্রধানমন্ত্রী সাক্ষী গোপাল। আসল ক্ষমতা নূতন প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হাবেস মাজালীর হাতে। আল ফাতা বেতারকেন্দ্র থেকে গেরিলা প্রধাম সেনাপতি আরাফত ঘোষণা করলেন—জেরকা সহরে সংঘর্ষ সুরু হয়েছে।

ছত্রিশ

সতেরই সেপ্টেম্বর। সকালে জ্বলে উঠল রাজধানী আম্মন। রাজকীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে সহরের উপকণ্ঠে গেরিলা ঘাঁটি-গুলো উপর। অবিশ্রান্ত ধারায় চলছে গোলা। ট্যাঙ্কগুলো এগুচ্ছে। মরিয়া হয়ে লড়ছে গেরিলারা। ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানের গোলার আঘাতে ট্যাঙ্কগুলো থমকে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে দু একটি জ্বলছে। আকাশ থেকে বোমা ফেলছে জঙ্গী বিমান। গেরিলাদের বিমান বিধ্বংসী কামান গর্জে উঠছে। মেসিনগানের খটাখট আওয়াজ আসছে দূর থেকে। মৃতের পাহাড় জমছে। আম্মনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বাইরের দুনিয়া থেকে জানবার উপায় নেই—ভিতরে কি ঘটছে। বাদশার প্রচারযন্ত্র আম্মন বেতারকেন্দ্র। আর গেরিলাদের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে দামাস্কাস বেতার। রাজকীয় বাহিনীর একঝাঁক ট্যাঙ্ক হানা দিল আম্মনের কেন্দ্রস্থলে। গেরিলারা ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল ওখানে। প্রচণ্ড লড়াই জমে উঠেছে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। তার আড়ালে মেসিনগান হাতে গেরিলারা। বাড়ীগুলোর জানালা দিয়ে বর্ষার স্রোতের মত ছুটছে বুলেট। সৈন্যদল এগুতে পারছে না। তাদের কামানের গোলায় দেয়ালে ফাটল ধরছে। সশস্ত্র বেদুইনরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে। গোটা সহরে বৈদ্যুতিক সরবরাহ বন্ধ। জলের পাইপগুলো গেছে ফেটে। কর্মীরা পালিয়েছে। একফোঁটা জল পাওয়া যায় না কোথাও। দামাস্কাস বেতার আহ্বান করছে রাজকীয় বাহিনীকে—বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তোল। হুসেনের বাদশাগিরি খতম কর। বেদুইন সাঁজোয়া ব্রিগেড ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেরিলাদের উপর। প্রতিহত হয়ে পিছু হটছে। আবার এগুচ্ছে। সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট আতাশী আবেদন জানাচ্ছেন মিশর, সিরিয়া, আলজেরিয়া

এবং সুদানের কাছে। আর দেরী নয় হস্তক্ষেপের সময় এসেছে। জর্ডনে রয়েছে ইরাকী বাহিনী। গেরিলারা চাচ্ছে তাদের সাহায্য। ইরাকীরা ইতস্তত করছে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। ভয়াবহ দৃশ্য সর্বত্র। শত্রু-মিত্র চেনা দায়। রাস্তায়-রাস্তায়, বাড়ীতে-বাড়ীতে এবং কামরায়-কামরায় হাতাহাতি লড়াই। জীবনের পরোয়া নেই গেরিলাদের। অদ্ভুত তাদের মনোবল। কিছুতেই ভেঙ্গে পড়ছে না।

সবার আগে মুখ খুলল বৃটেন। তার কড়া হুশিয়ারী। জর্ডনের গৃহযুদ্ধে বাইরের কোন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে বৃটেন তা বরদাস্ত করবে না। মনে পড়ল ১৯৫৮ সালের কথা। ইরাকে কাশেমের সার্থক বিপ্লবের সময় কেঁপে উঠেছিল হুসেনের সিংহাসন। তাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে এসেছিল বৃটিশ সৈন্য। জর্ডনের সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধে সেদিন নাক গলিয়েছিল বৃটেন। আজ তার মুখে হুশিয়ারী—জর্ডনের গৃহযুদ্ধে বাইরের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না বৃটেন। জর্ডনে যা ঘটছে প্রকৃতপক্ষে তা আরবের গৃহযুদ্ধ। গ্রেটবৃটেন বহুদূরে। বৃটিশ হুশিয়ারীর অর্থ বোঝে না আরব জনতা। হুসেনের উপর জমে ওঠে ঘৃণার স্তূপ। পশ্চিমের তাবেদার তিনি। তা না হলে জর্ডন নিয়ে বৃটেনের এত মাথাব্যথা কেন? দূরে দাঁড়িয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে মিশর।

আঠারই সেপ্টেম্বর। সাময়িক যুদ্ধবিরতির হুকুম দিলেন ফিল্ড মার্শাল মাজালী। তাঁর কড়া নির্দেশ, একদিনের মধ্যে অস্ত্রত্যাগ করতে হবে গেরিলাদের। অন্যথায় তাদের সমূল উচ্ছেদ। উত্তর দিলেন গেরিলাদের প্রধান সেনাপতি আরাফত: ইঙ্গ-মার্কিন কায়েমী স্বার্থের গোলামদের খতম কর। আল ফাতার বেতার ঘোষণায় আরাফাতের নির্দ্দেশ শুনলেন মাজালী। শূন্যে আস্ফালন করলেন তিনি তরোয়াল। বেদুইনরা আকাশে ছুঁড়ল রাইফেলের গুলি। সৈন্যদল মার্চ করল আম্মনের উত্তরে ইরবিদের পথে।

সিরিয়া সীমান্তের কাছে ইরবিদ। গেরিলাদের শক্ত ঘাঁটি। তাদের দখলে এ সহর। সাধারণতন্ত্রী পাল্টা সরকার গঠনের উদ্যোগ আয়োজন করছে তারা এখানে। উত্তরের সহর রামাথা এবং জারকা। এ দুটি সহরের উপকণ্ঠে চলছে তুমুল লড়াই। ট্যাঙ্কের গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছে গেরিলারা। ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানগুলোর মুখ দিয়ে ধুঁয়া উঠছে। গোলাবর্ষণের বিরাম নেই। মেসিনগান থামছে না। আম্মনের দক্ষিণে মাদাবা। সেখানেও ঘনিয়ে এসেছে মৃত্যু। গেরিলারা মরছে। রাজকীয় সৈন্যরা ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। আরবরক্তে ভিজছে জর্ডনের মাটি। ইস্রাইলী মহলে বইছে উল্লাসের বন্যা। স্বস্তি পরিষদে নালিশ জানাবার হুকুম দিয়েছেন বাদশা হুসেন। তাঁর অভিযোগ: জর্ডনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করছে সিরিয়া। রাষ্ট্রসংঘের জর্ডনী প্রতিনিধি আটালী। তিনি পদত্যাগ করলেন। তাঁর প্রতিবাদ জোরাল। সামরিক সরকার গণপ্রতিনিধি নন। তাঁদের হুকুম তামিলের চেয়ে মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। সিরিয়ার সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ জর্ডনী সহর রামাথা। ইরাকী সৈন্যশিবির এখানে। যুদ্ধের সূচনাতেই তারা সহর ছাড়ল। হতাশ হল গেরিলারা। ইরাকীদের উপর তাদের ভরসা ছিল অনেক। সময় বুঝে ওরাও নিরপেক্ষ সাজল।

উনিশে সেপ্টেম্বর। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য অস্ত্রসম্বরণের আবেদন জানালেন নাসের। বিরোধ মীমাংসার ভার নেবেন তিনি। বাদশা হুসেন রাজী। ফিল্ড মার্শাল মাজালী দিলেন চরমপত্র: বিকেল চারটার মধ্যে গেরিলাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। অবাক হয়ে ভাবল সবাই—জর্ডনের প্রকৃত শাসনকর্তা কে? বাদশা হুসেন, না মাজালী? মার্কিন নৌবহরের গতিবিধি মারাত্মক। ওদের তৎপরতা বাড়ছে। বৃটেনের কলরব উচ্চগ্রামী। ইঙ্গ-মার্কিন হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা গাঢ় হয়ে উঠছে। গেরিলাদের মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনা। যথাসময়ে এল মার্কিন হুশিয়ারী। চারশ’ মার্কিন

নাগরিক রয়েছে জর্ডনে। তাদের গায়ে আঁচড় লাগলে সৈন্যদল নামাবে আমেরিকা। জ্বলে উঠল গেরিলারা। তারা বলল—জর্ডনে মার্কিন হস্তক্ষেপ ঘটলে একজন মার্কিন নাগরিকও আস্ত থাকবে না। তৈলের পাইপ লাইন চুরমার হয়ে যাবে। কবরের মাটিতে ঢাকা পড়বে পশ্চিমের কায়েমী স্বার্থ। ক্ষেপে উঠলেন নাসের। কড়া শাসানী দিলেন তিনি। জর্ডনে মার্কিন হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না মিশর। তাঁর সৈন্যবাহিনীও যুদ্ধে নামবে।

বিশে সেপ্টেম্বর। জর্ডনের উত্তর সীমান্তে ঢুকল সিরিয়ার সাঁজোয়া ব্রিগেড। রাজকীয় বাহিনী এগিয়ে গেল তাদের প্রতিরোধে। মার খেয়ে পিছু হটল। ইরবিদ এবং রামাথা সিরিয়ার দখলে। হুসেন দিশাহারা। গোপনে খবর পাঠালেন মার্কিন এবং বৃটিশ দূতাবাসে। সৈন্য পাঠাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তাদের। ইস্রাইলী আক্রমণ চললেও আপত্তি নেই। মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর বেপরোয়া হয়ে উঠছে। উপকূল দরিয়ায় উড়ছে মার্কিন বিমান। ওয়াশিংটন চঞ্চল। প্রতিরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী মেলভিন বললেন: যতক্ষণ বাদশা হুসেন ক্ষমতায় থাকবেন ততক্ষণ আমেরিকা হস্তক্ষেপ করবে না। সোভিয়েট রাশিয়া একদিন চুপচাপ ছিল। নীরবতা ভাঙ্গল সে। এল পাল্টা হুমকী। বৃটেন এবং আমেরিকা জর্ডনে নাক গলালে সোভিয়েট রাশিয়াও নীরবে বসে থাকবে না। ওদিকে ইস্রাইল করছে সৈন্য সমাবেশ। লক্ষ্য—দামাস্কাস। রাষ্ট্রসংঘে চলছে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ। জর্ডন সীমান্ত অতিক্রমের কথা অস্বীকার করছে সিরিয়া। বাদশা হুসেন আবেদন জানাচ্ছেন আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে। নাসের অনুরোধ করেছেন হুসেনকে—লড়াই থামাও। আরব শীর্ষ সম্মেলন বসবে কায়রোতে। তারাই নেবেন বিরোধ মীমাংসার ভার। বৃটেনের সুর নরম। জর্ডনে সৈন্য নামাবার কোন ইচ্ছাই তার নেই। আমেরিকা গরম। ট্যাঙ্ক, জঙ্গীবিমান, পরিবহন

বিমান প্রভৃতি পাঠাচ্ছে জর্ডনে। রাজকীয় বাহিনীর ঘাটতি অস্ত্রের পরিপূরণ করবে সে। গেরিলাদের উচ্ছেদ চাই। অস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ওয়াশিংটন।

একুশে সেপ্টেম্বর। বাদশা হুসেন দিয়েছেন অস্ত্রসম্বরণের হুকুম। তাঁর নির্দ্দেশ মানছেন না মাজালী। যুদ্ধ চলছে। হত্যার উন্মাদনায় ক্ষেপে উঠেছে বেদুইন বাহিনী। তাদের হাতে সাঁজোয়া বাহিনী। আম্মন জ্বলছে। চোখে ঘুম নেই কারও। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য বেদুইন। নারী পুরুষ এবং শিশুর ভেদাভেদ নেই। দেখা মাত্রই গুলি করছে তারা। ঘরে ঢুকে টেনে বার করছে মহিলাদের। প্রকাশ্যে তাদের উপর চলছে ধর্ষণ। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে গেরিলারা। মেয়েদের আর্তনাদ শুনলেই ছুটে যাচ্ছে তারা। পিস্তলের গুলিতে লুটিয়ে পড়ছে বর্বরের দল। বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে জড় হয়েছে ভয়ার্ত্ত মহিলারা। তাদের পাহারা দিচ্ছে তরুণী গেরিলারা। চারদিকে বসান মেসিনগান। প্রতিরক্ষাকারণীদের হাতে পিস্তল এবং রাইফেল। পুরুষরা বেরিয়েছে রাজকীয় সৈন্য-দলের মোকাবিলায়। খাদ্য নেই, জল নেই, দুধ নেই—নারকীয় পরিবেশ। শিশুর কান্না চাপা পড়ছে বোমার আওয়াজে। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল—ইস্রাইলী বিমান হানা দিয়েছে গেরিলা ঘাঁটি মায়াদিতে। ওখান থেকে নাকি গেরিলারা চড়াও হয়েছিল ইস্রাইলী সীমান্তে। অবিশাস্য ঘটনা। হুসেন-ইস্রাইলী গোপন আঁতাতের গুজব আবার ছড়িয়ে পড়ল আরব জনতার মধ্যে। আওয়াজ উঠল: বাদশাকে খতম কর। আম্মনে নেই কোন প্রশাসন। সরকারী দপ্তরগুলো খালি। কলকারখানা এবং দোকানপাট সব বন্ধ। শ্রমিক দিয়েছে হরতালের ডাক। মাজালীর হুকুম: সরকারী কর্মীদের অফিসে হাজিরা দিতে হবে। তাদের গরহাজিরের পরিণাম মৃত্যুদণ্ড। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অচল অবস্থা সচল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। মৃত্যুদণ্ডের পরোয়া করে না কেউ।

বাইশে সেপ্টেম্বর। যুদ্ধের বিরাম নেই। কায়রোতে বসেছে আরব শীর্ষ সম্মেলন। গঠিত হয়েছে শান্তি কমিটি। একটি প্রতিনিধিদল যাবে জর্ডনে। সুদানের প্রেসিডেণ্ট জাফর এল নিমেইরী এ দলের নেতা। তাঁরা দেখা করবেন বাদশা হুসেন এবং গেরিলা নেতাদের সঙ্গে। অস্ত্রসম্বরণের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব তাদের উপর। প্রতিনিধিদল রওনা হলেন আম্মনে। নাসের জানালেন তাঁদের বিদায় অভিনন্দন। মন তাঁর ভারাক্রান্ত। আরবের হাতের অস্ত্র হনন করছে আরবকে। দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে ইস্রাইল। মুক্তি যোদ্ধাদের শবে ভরে উঠছে জর্ডনের জনপথ। আমেরিকার হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা পদে পদে। সতর্কতার বড় দরকার। সিরিয়ার সাঁজোয়া ব্রিগেড ছেড়েছে ইরবিদ এবং রামাথা। নীরবে তারা এসেছিল এবং নীরবেই তারা চলে গেছে। বাইরের তুনিয়ার কাছে রহস্যময় ঘটনা। হয়ত নাসের দিয়েছিলেন সিরিয়াকে হুশিয়ারী। অথবা আরব শীর্ষ সম্মেলনের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চান নি দামাস্কাস। কিম্বা তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন। সিরিয়ার উপর ইস্রাইলী আক্রমণ। হয়ত জর্ডনে মার্কিন হস্তক্ষেপের অছিলার পথ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট আতাশী। সুদানের নিমেইরী ভয়ানক ব্যস্ত আম্মনে। বাদশা হুসেনের সঙ্গে চলছে তার বৈঠক। রাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে কায়রোতে। ঘুমন্ত সহর। জেগে আছেন শুধু নাসের। নিমেইরীর শান্তি দৌত্যের ফলাফলের সংবাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তিনি।

তেইশে সেপ্টেম্বর। আরব নেতারা বসে আছেন কায়রোতে। তাঁদের মধ্যে চলছে ঘন ঘন সলাপরামর্শ। নিমেইরী ছুটাছুটি করে করে বেড়াচ্ছেন আম্মনে। কায়রোর সঙ্গে রাখছেন যোগাযোগ। ইরবিদ এবং রামাথার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজকীয় সাঁজোয়া বাহিনী। জর্ডনী বিমান বহর যোগ দিয়েছে সংগ্রামে। আকাশ থেকে সহরের উপর পড়ছে বোমা। আম্মন বেতার ঘোষণা

করছে ঃ সিরিয়া সৈন্যদলকে মেরে তক্তা বানিয়ে সীমান্তের ওপারে হটিয়ে দিয়েছে রাজকীয় বাহিনী। ঘায়েল করেছে অসংখ্য ট্যাঙ্ক। তাদের বিবরণ সত্য হলে সিরিয়ার হাতে আর ডজন খানেকের বেশী ট্যাঙ্ক থাকার কথা নয়। বেকায়দায় পড়েছে গেরিলারা। মাথার উপরে বিমানছত্র নেই। দলে দলে মরছে তারা। হা হা করে উঠছে নাসেরের অন্তরআত্মা। বাদশা হুসেন জ্বেলে দিয়েছেন গৃহযুদ্ধের আগুন। অকারণে এতগুলো তাজা প্রাণের আহুতি পড়ছে সেখানে।

চব্বিশে সেপ্টেম্বর। শোনা গেল আম্মন বেতারের ঘোষণা। নিমেইরী এবং বাদশা হুসেনের মধ্যে হয়েছে চুক্তি। অস্ত্রসম্বরণের হুকুম দিয়েছেন বাদশা। কিন্তু বেদুইনরা কারও কথা শুনছে না। ইরবিদ এবং রামাথার উপর আক্রমণের তীব্রতা কমে নি। গেরিলারা বিশ্বাস করে না হুসেনকে। তিনি দুমুখো। এক মুখে তাঁর শান্তির বাণী এবং অপর মুখে লড়াই চালাবার গোপন নির্দ্দেশ। নিমেইরী কায়রো ফিরে যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার মিল থাকছে না। আম্মন বেতারের 'অস্ত্রসম্বরণের ঘোষণা অর্থহীন। ওটা কি লোক দেখান ভাঁওতা? গেরিলাদের কেন্দ্রীয় কমিটি প্রত্যাখ্যান করেছে অস্ত্রসম্বরণ প্রস্তাব। তাদের কথা স্পষ্ট। সাময়িক যুদ্ধবিরতির সুযোগ নেবেন বাদশা হুসেন। তিনি শান্তি চান না। গেরিলা উচ্ছেদ তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বিদেশী কায়েমী স্বার্থের জিম্মাদাররা বাদশার পরামর্শদাতা। বিশ্বাস-ঘাতকের কথার দাম নেই। চার জনের এক প্রতিনিধিদল আবার উঠলেন বিমানে। আম্মনের পথে চলল বিমান। অপেক্ষা করতে লাগলেন নাসের।

পঁচিশে সেপ্টেম্বর। ইরবিদ এবং রামাথা দখলের চূড়ান্ত সংগ্রাম সুরু করেছে রাজকীয় বাহিনী। ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ এবং জঙ্গী বিমান যোগ দিয়েছে তাতে। গেরিলারা কোণঠাসা হয়ে

পড়েছে। নাসেরের মুখে চোখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তাঁর মনের উপর পড়ছে প্রচণ্ড চাপ। বিশ্রামের অবসর নেই। নিমেইরী যোগাযোগ করলেন বাদশা হুসেনের সঙ্গে। প্রতিশ্রুতি ভেঙেছেন তিনি। কৈফিয়ত চাইলেন নিমেইরী। ওদিকে ইরবিদ এবং রামাথায় বইছে রক্তের নদী। লেবাননের বিপ্লবীরা ঢুকতে চাইছে জর্ডনে। মিশরের গেরিলারা বসে থাকতে রাজী নয়। বিপ্লব বাঁচাতে হবে। নাসের বার্তা পাঠালেন আরাফতকে। নিমেইরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল তাঁর। অস্ত্রসম্বরণে তিনি রাজী। অস্ত্রসম্বরণের হুকুম দিলেন তিনি। আম্মন এবং কায়রো বেতার ঘোষণা করল এ সংবাদ। ইতিমধ্যে ঘটে গেছে এক অভাবনী ঘটনা। আরব শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য কায়রো এসেছিলেন জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী দাউদ। হঠাৎ তিনি উধাও হলেন। কোন খবর নেই তাঁর। পরে জানা গেল, চব্বিশে সেপ্টেম্বর তিনি বাদশার কাছে পাঠিয়েছিলেন পদত্যাগ পত্র। নিজে প্যালেস্টাইনী। সহ্য করতে পারেন নি পাইকারী হারে প্যালেস্টাইনী হত্যা। ফিল্ড মার্শাল মাজারী স্বাধীন। বাদশার পেয়ারের লোক। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোন পরামর্শই তিনি করতেন না। কোন্‌টা বাদশার নির্দেশ এবং কোন্‌টা তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত বোঝার উপায় ছিল না কারও। দাউদের পদত্যাগ তারই প্রতিবাদ। হুসেনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিবেকের বিদ্রোহ। ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর। আম্মন বেতার ঘোষণায় জানা গেল, বাদশা তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন।

সাতাশে সেপ্টেম্বর। গেরিলারা অস্ত্রসম্বরণ করেছে। কিন্তু রাজকীয় বাহিনী থামেনি। সকালে খবর পাওয়া গেল, আম্মনের ষোল মাইল উত্তর-পূর্বে জারকা-আম্মানের পথে একটি সেতুর দখল নিয়ে সুরু হয়েছে সংঘর্ষ। গেরিলাদের হাত থেকে পুলটি কেড়ে নিতে চায় বাদশাহী ফৌজ। আম্মনের পাঁচ মাইল দূরে

রাসেইফা সেতুর দখল নিয়েও চলছে অনুরূপ সংঘর্ষ। নাসের আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। তিনি কড়া হুশিয়ারী পাঠালেন হুসেনকে। বাদশা অপরাধী। অস্ত্রসম্বরণ চুক্তির অমর্যাদা ঘটিয়েছেন তিনি। এ ধরণের লুকোচুরি খেলা সহ্য করবে না মিশর। নিমেইরী আবার কৈফিয়ত চাইলেন হুসেনের কাছে। টালবাহনা করতে লাগলেন বাদশা। তিনি বললেন, তৌকামের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে নূতন মন্ত্রিসভা। তাঁদের প্রধান কাজ, জর্ডনের গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাতীয় সংহতি। হতাহতের সংখ্যা নিয়ে এতদিন চলছিল জল্পনা কল্পনা। আরাফত ঘোষণা করলেন, ন'দিনের গৃহযুদ্ধে পঁচিশ হাজার প্যালেস্টাইনী আরব হতাহত হয়েছে। রাজকীয় বাহিনীর ক্ষতিও কম নয়। তাদের নিহতের সংখ্যা অনূন্য পাঁচশ। খোয়া গেছে তিরানব্বুইটি ট্যাঙ্ক।

গৃহযুদ্ধের ডামাডোলে চাপা পড়েছিল বন্দী বিমান যাত্রীদের কথা। ওদের কোন খবর নেই। বেপরোয়া গোলাগুলির মধ্যে তারা বেঁচে আছে কিনা জানত না কেউ। গেরিলারা রেখেছিল তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে: নাসেরের হস্তক্ষেপে তাদের সবাই পেল মুক্তি। কায়রো বেতার দুনিয়াকে জানিয়ে দিল এ সংবাদ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যাত্রীদের উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজন।

আঠাশে সেপ্টেম্বর। অস্ত্রসম্বরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিবদমান পক্ষগুলো। বিরোধ মেটেনি। এখানে সেখানে চলছে ইতস্তত সংঘর্ষ। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নিক্সন দিয়েছেন বাদশা হুসেনকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার খয়রাতি। নাসের কায়রোতে ডেকে পাঠিয়েছেন আরাফত এবং হুসেনকে। অন্যান্য গেরিলা নেতাও হাজির হয়েছেন। নাসের করছেন মধ্যস্থতা। বাদশা হুসেন এবং আরাফত স্বাক্ষর দিলেন শান্তি চুক্তিতে।

চুক্তির সর্তঃ (১) গেরিলারা উত্তর জর্ডনের তিনটি শহরের কেন্দ্রীয় এলাকা ছেড়ে যাবে। (২) আম্মনে কোন গেরিলা ঘাঁটি

থাকবে না। (৩) রাজকীয় সৈন্যরাও রাজধানীতে কোন ঘাঁটি বানাতে পারবে না। (৪) আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের পর্যবেক্ষকদল চুক্তির সর্তাবলী রূপায়ণের তদারকী করবেন।

গেরিলাদের ক্ষতির পরিমাণ সাংঘাতিক। কিন্তু তারা দেখিয়েছে অভাবনীয় সাহসিকতা। মৃত্যুভীতি তাদের কাবু করতে পারেনি। লড়াই করতে করতে তারা মরেছে। পালায়নি একজনও। জনতার দৃষ্টিতে গেরিলারা অসমসাহসিক যোদ্ধা। আন্তরিকতায় তুলনাহীন। এরা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। ইস্রাইলকে লড়তে হবে ইস্পাতে গড়া আরব তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে। সম্ভাব্য যুদ্ধের হারজিতের প্রশ্ন দীর্ঘদিন থাকবে অমীমাংসিত।

বাদশা হুসেন ব্যর্থ। গেরিলা উচ্ছেদ করতে তিনি পারেন নি। ভবিষ্যতে পারবেনও না। গোটা আরব দুনিয়ার ধিক্কার জমা হয়েছে তাঁর মাথার উপর। তার সিংহাসনের তলায় সব সময় চলবে ভূমিকম্প। সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে মেতেছিলেন তিনি। তার রাজ্যে বাইরের তদারকী দল বসেছে। বাধা দেবার সাহস নেই বাদশার। গেরিলারা তার গদীচ্যুতির দাবী আপাততঃ করবে না সত্য, কিন্তু স্থিতাবস্থা বজায় রাখা মুস্কিল। সাধারণতন্ত্র আরব জাতীয় জীবনের বেগবান প্রবাহ। তার গতিরোধ অসম্ভব।

সাঁইত্রিশ

জর্ডনের গৃহযুদ্ধ থেমেছে। সাম্প্রতিক আরব-ইস্রাইল লড়াইএর পর নাসেরের বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। আর একবার প্রমাণ হয়েছে তিনি গোটা আরবের একচ্ছত্র নায়ক। তাঁর নৈতিক অধিকার কোন ভৌগোলিক সীমান্ত মানে না। চরমপন্থীরা নাসেরের কঠোর সমালোচক। কিন্তু অন্তর দিয়ে ভালোবাসে তাঁকে। সঙ্কটকালে তাদের পাশে দাঁড়াবার হিম্মত রাখেন একমাত্র তিনি। নাসের আজ বড় ক্লান্ত। আরব শীর্ষসম্মেলনে মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়েছেন তিনি। বিশ্রামের জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন সবাই। হেসে জবাব দিয়েছেন ঃ তরুণের তাজা খুনে ভরে যাচ্ছে জর্ডন। ওর সমাপ্তি ছাড়া বিশ্রাম অসম্ভব। নারী, পুরুষ এবং শিশুর শবে আকীর্ণ জনপথ। মৃত্যু নিয়ে চলছে তাণ্ডব। ভয় করলে চলবে কেন ? কিন্তু বুকে একটা ব্যথা। সাংঘাতিক কিছু নয়।

আরব প্রধানরা চলে যাবার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত। কোয়েটের আমীর রওনা হবেন বিকেল সাড়ে তিনটায়। বিমান-ঘাঁটিতে যাবেন নাসের তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। তৈরী হচ্ছেন তিনি। পাশে দাঁড়িয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। দেয়ালে ঝোলান মিশরের বড় একটা মানচিত্র। অস্ফুট কণ্ঠে বলছেন নাসের—ইউরোপ বুঝতে পারে না মিশরকে। যে জাতি তৈরী করেছে পিরামিড সে জাতির সৃজনীশক্তি স্বপ্নের মত উবে যেতে পারে না। হাজার হাজার বছরের কবরের নীচে ঘুমিয়েছিল তার অশান্ত চেতনা। সে আজ জেগেছে। আরব দুনিয়ার ঐক্য এবং সমৃদ্ধির দায়িত্ব তার উপর। সে কি পারবে এই বোঝা বইতে? ঘুমের বড় দরকার। ঘুম, ঘুম—একটানা লম্বা ঘুম। হাতের ঘড়িটা দেখলেন নাসের। সাদাত বেরিয়ে

গেলেন। কোরান নিয়ে বসলেন তিনি। আধঘণ্টা পড়লেন কোরান। সময় হয়ে গেছে। কোয়েটের আমীরকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে হবে। মিশরীয় আতিথ্যের অবমাননা চলবে না। দেহমন অবসন্ন। তবু যাবেন নিজে।

বিকেল সাড়ে তিনটে। কোয়েটের আমীরকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে গেছেন নাসের। বুকের ব্যথা বাড়ছে। শরীরটা ঝিমিয়ে আসছে। সারা দেহে ঘামের প্রবাহ ছুটছে। কায়রোর উপকণ্ঠে মানসিরেত বাকরীতে তাঁর বাড়ী। সহকর্ম্মীরা নিয়ে এলেন তাঁকে, বাড়ীতে। ভয়ানক অসুস্থ। ছটফট করছেন। পাশে বসে আছেন তাহিয়া খাজেম। হৃদরোগে আক্রান্ত নাসের। ডাক্তাররা অসাধ্য সাধনের প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। সব ব্যর্থ। বিকেল ছ'টা পনের মিনিটে (ভারতীয় সময় আটটা পঁয়তাল্লিশ) শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন নাসের। সাদাত ঘোষণা করলেন তাঁর মৃত্যুসংবাদ। আরব দুনিয়া স্তম্ভিত। জনতা হতবাক। সারা বিশ্ব বিহ্বল। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতার আকস্মিক তিরোধান অবিশ্বাস্য ঘটনা। বেতারে বাজছে করুণ সঙ্গীত। মাঝে মাঝে শোকার্ত ঘোষণা—নাসের ইহজগতে নেই।

রিপাব্লিক প্রাসাদে অন্তিম শয়নে রয়েছেন নাসের। মিশর কাঁদছে। কান্নার বিরাম নেই। কাতারে কাতারে নরনারী ছুটছে কায়রোর পথে। শেষ দেখা দেখবে একবার প্রিয় নেতাকে। আত্মহত্যা করেছে ক'জন। খাজেমের চোখের জল থামতে চায় না। পাশে বসে মহম্মদ হেকল। তাঁকে তিনি বললেন: স্বামীর ছিল বাইরের জগত। তাঁর কাজে বাধা দেইনি কোনদিন। পারিবারিক ছোট আঙ্গিনা নিয়েই আমি ছিলাম সুখী। প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে। স্বামীর কবরের পাশেই আমি যেন চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে থাকতে পারি। হেকলের জিহ্বা বিকল। সান্ত্বনার ভাষা নেই তাঁর মুখে। তিনি নীরব।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পদ নিয়েছেন আনোয়ার সাদাত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে হাজার হাজার শোকবার্তা। বৃহস্পতিবার ১লা অক্টোবর অন্তিম যাত্রা। মানসিরেত এল বাকরী মসজিদে তৈরী হচ্ছে কবর। নাসের নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরী করেছিলেন এ মসজিদ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নায়কেরা একে একে নামছেন কায়রোর বিমানঘাঁটিতে। মস্কো থেকে এসে পৌঁছলেন কোসিগিন। সাদাত কেঁদে ফেললেন। রুমালে নিজের চোখ মুছলেন কোসিগিন। কাঁদছেন সাদাত, কাঁদছেন জাকারিয়া মহীউদ্দিন, কাঁদছেন সাব্রী, কাঁদছেন হেকল—সবার কান্না মিশেছে জনতার কান্নার সঙ্গে।

জনস্রোতের বিরাম নেই। হাজার হাজার মানুষ ট্রেনে, বাসে, মোটরে, গাধার পিঠে চড়ে এবং পায়ে হেঁটে জড় হচ্ছে রাজধানীতে। অনেকের হাতে নাসেরের প্রতিকৃতি। কেউ কেউ চীৎকার করে বলছে: আমাদের জন্যই আত্মবিসর্জন করেছেন নাসের। গাজায় শোকার্ত জনতার উপর গুলি চালিয়েছে ইস্রাইলী পুলিশ। চারদিক থেকে উঠছে ধিক্কার। জেরুজালেম শোকে মুহ্যমান। নরনারী বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। প্রাণের ভয় নেই কারও। মুখে তাদের নাসেরের জয়ধ্বনি। ইস্রাইলী পুলিশের ভ্রূকুটি গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না তারা। বাদশা হুসেনকে দিচ্ছে অজস্র অভিশাপ।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সুরু হয়েছে শোকযাত্রা। লক্ষ লক্ষ নরনারী চলছে পিছনে। বেতারে শোনা যাচ্ছে ধারাবাহিক বিবরণী। শোকে ভেঙ্গে পড়ছে বিঘোষক। কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তার স্থান নেয় দ্বিতীয় বিঘোষক। সেও বেশীক্ষণ সংযম রাখতে পারে না। তৃতীয় বিঘোষক আসে তার জায়গায়। ক' মিনিটের মধ্যে তার জিহ্বাও হয়ে পড়ে বিকল। চতুর্থ বিঘোষক কোনমতে সামলিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে কফিন নামে কবরে। কাঁদতে থাকে বিঘোষক। জনতা শোনে তার কান্না। সব শেষ। মিশরের নব

সূর্য অস্তমিত। কিন্তু তাঁর মধ্যাহ্ন রশ্মি ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। নাসের চলে গেছেন। পিছনে পড়ে রয়েছে জাগ্রত মিশর—জাগ্রত আরব। হাজার হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল পিরামিড। মানসিরেত এর্ল বাকরী মসজিদ ঘিরে গড়ে উঠবে নূতন পিরামিড। অনন্তকালের বুকে ওটা আরব জাগরণের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। নাসের তার দুর্জয় প্রকাশ। এ পিরামিডের ধ্বংস নেই। ইতিহাস তার জীবন্ত সাক্ষী। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যদল। কবরে পড়ছে মাটি। আকাশে উঠছে জনতার বুকফাটা আর্তনাদ—নাসের, নাসের। যুগ যুগ জীও নাসের।

সমাপ্ত

কতকগুলো ছাপার ভুলের সংশোধন নীচে দেওয়া হল। বাঁ-দিকে যা আছে, তার বদলে ডান-দিকের কথাগুলো পড়তে হবে।

তালিম	(২ পৃষ্ঠা)	তামিল
মৌকাবাদ	(৭ ,,)	মানকাবাদ
মাস্রি	(১৪ ,,)	মাশ্রি
ইতঃস্তত	(১৮ ,,)	ইতস্তত
বেপরোয়ারা	(১৯ ,,)	বেপরোয়া
জমিদাদের	(২৩ ,,)	জমিদারদের
আশ্বস্থ	(২৬ ,,)	আশ্বস্ত
মোটারস	(৩৩ ,,)	মর্টারস
শিবিবে	(৪৬ ,,)	বন্দীশিবিরে
নাসের জিজ্ঞাসা করলেন	(৫৩ ,,)	নাসের বললেন
দপ্তরে ছিলেন	(৬৭ ,,)	দপ্তরে ছিলেন না
সিনেটের	(৭২ ,,)	সিনেটর
বিজেসীব	(৭৭ ,,)	বিজেন্সীর
ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনে নাসেবের	(৮০ ,,)	ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে নাগিবের
সুদান সফরে নাসেবকে	(৮০ ,,)	সুদান সফরে নাগিবকে
সেক্রেরীকে	(৮১ ,,)	সেক্রেটারীকে
সুকুম	(৮৭ ,,)	হুকুম
১০৫৪	(৯১ ,,)	১৯৫৪
মারাত্মক হয়	(৯৬ ,,)	মারাত্মক নয়
ইউনকে	(১১১ ,,)	ইডেনকে